পোর্ট ক্যানিং: একটি অঞ্চলের গড়ে ওঠার ইতিহাস (১৮৫৩-১৯৪৭)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা শাখার ইতিহাস বিভাগের
পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

মুরারী মোহন মিস্ত্রী

নিবন্ধন সংখ্যা- **A00HI1100117**

বর্ষ-২০১৭

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

Certificate

Certificate that the thesis entitled **পোর্ট ক্যানিং: একটি অঞ্চলের গড়ে ওঠার ইতিহাস (১৮৫৩-১৯৪৭)** Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Prof. Mahua Sarkar, Department of History, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor

Date:

Signature of theCandidate

Date:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণা সন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করতে যিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তিনি হলেন আমার মাতৃরূপিনি তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. মহুয়া সরকার মহাশয়া। তিনি শুধুমাত্র আমার তত্ত্বাবধায়ক নন, আমার পথপ্রদর্শক। অধ্যাপিকা জীবনের শেষ পর্বে এসে নানারকম শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেও আমার গবেষণাপত্রের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম দান করেছেন তার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ। তিনি তাঁর গবেষণা কর্ম ও তাঁর হাতে তৈরী অসংখ্য নক্ষত্রসম গবেষকদের মধ্যে আমাকে স্থান দিয়ে যে মহানুভবতা ও অকৃত্রিম ভালবাসা প্রদান করেছেন তার জন্য আমি তাঁর কাছে আজীবন ঋনী রইলাম।

আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই ডি. আর. সি. (ডক্টরাল রিসার্চ কমিটি) বোর্ডের অন্যতম সদস্য ও সদস্যা অধ্যাপিকা ড. নূপুর দাসগুপ্ত, ড. মেরুনা মূর্মু ও অধ্যাপক ড. রূপ কুমার বর্মন মহাশয়কে। যাদের আন্তরিক সাহায্য ও পরামর্শে আমার গবেষণা নিবন্ধটির এইরূপ নামকরণ সম্ভব হয়েছে। ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষা সহযোগী কর্মীদের যাদের ঐকান্তিক ভালোবাসার মধ্যে থেকে ২০০৯ থেকে ২০২৩ দীর্ঘ ১৪ বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছি। গবেষণা সন্দর্ভটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমি সর্বদা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য মহাফেজখানা, গণশক্তি লাইব্রেরী, সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী (রাইটার্স বিল্ডিং), রাজ্য বিধানসভা লাইব্রেরী, ক্যানিং মহকুমা লাইব্রেরী, বসন্ত সেন লাইব্রেরী (ক্যানিং) থেকে সর্বোচ্চভাবে সাহায্য

পেয়েছি। উক্ত সকল লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। বন্ধু ভাস্কর সেন ও গোসাবা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসের অন্যান্য সহকারী বিশেষ করে মধুদা ও বিনয় মিস্ত্রির কাছে আমি ঋণী। যাদের সহযোগিতা ছাড়া হ্যামিল্টন বাংলো থেকে হ্যামিল্টন এস্টেট সম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার দাদা জয়দেব মিস্ত্রি ও তার বন্ধু অম্লান মন্ডল দাদাকে যাদের অনুপ্রেরণায় আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম। গবেষণা বিষয়ে নানা ভাবে সাহায্য ও বিশেষ করে সঠিক সময়ে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার কথা ক্রমাগত মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর হোস্টেল জীবনের সকল বন্ধু বিশেষ করে হেমন্ত তামাং, অঞ্জন দাস, অর্ণব কোনার, বিশ্বরূপ পরামানিক, পাভেল স্ট্যালিন বর্মন ও অগ্রজ সঞ্জীবদা এবং ভ্রাতিপ্রতিম ধীরজ চৌধুরী, সন্তু সামন্ত, বিশ্বজিৎ বর্মন, আজিজ, প্রীতম ও আরও অনেককে। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই আমার সহপাঠী শুভদীপ দাস ও ইমরান শেখকে। এদের দুজনের সঙ্গলাভ আমার তথ্য সংগ্রহের কাজটিকে সুখকর করে তুলেছিল। এছাড়া শুভঙ্কর দা, অনির্বাণ দা, অলক দা, আশিষ দা, মৃন্ময়, পার্থ, আমির, রাকেশ এদের প্রত্যেকের থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। আলাদাভাবে বলতে চাই ফোনের ওপারে সেই মানুষটি কথা যে ক্রমাগত গবেষণা কর্মটিকে সম্পন্ন করতে না পারার ভয়কে মুক্ত করতে সাহস যুগিয়েছে। আমাকে উৎসাহিত করেছে, রাত জাগার সঙ্গী হয়েছে।

সর্বোপরি শ্রদ্ধা জানাই আমার স্বর্গলোকপ্রাপ্ত ঠাকুরমা ও ঠাকুরদাকে যাদের স্নেহ ভালোবাসা ও লালন-পালনে লেখাপড়ার যাত্রা শুরু করে আজ এখানে পৌঁছাতে পেরেছি। এই গবেষণাকর্ম তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। আমি সমপরিমাণ ঋণী আমার পরিবারবর্গ বাবা-মা ও কাকা-কাকির কাছে, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম আর দারিদ্রতার বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাকে এতদূর অবধি পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি বিশেষভাবে ঋণী আমার কাকার কাছে যিনি

পরিবারের সবরকম প্রতিকূলতার মাঝে সামান্য দিনমজুরি কখনোবা সুতোর মিস্ত্রীর কাজ করে আমার মাস্টার ডিগ্রী চলাকালীন সর্বপ্রকার দায়িত্ব স্বযত্নে পালন করেছেন। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত মানুষগুলিকে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সাফল্যমন্ডিত করতে সাহায্য করেছেন।

মুরারী মোহন মিস্ত্রী
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সারণিসূচি

ভূমিকা ১-১৩

প্রথম অধ্যায়: ক্যানিং মহকুমার জনবসতির ইতিবৃত্ত ও জনবিন্যাস ১৪-৬১

দ্বিতীয় অধ্যায়: পোর্ট ক্যানিং: বিতর্কের মাধ্যমে শহরের উত্থান (১৮৫৩- ১৮৭১) ৬২-১১১

তৃতীয় অধ্যায়: হ্যামিল্টনের আবাদ: স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনা (১৯০৩-১৯৪৬) ১১২-১৫৪

চতুর্থ অধ্যায়: ক্যানিং মহকুমার আঞ্চলিক সংগ্রাম: তেভাগা। ১৫৫-২২৯

উপসংহার ২৩০-২৩৮

পরিশিষ্ট ২৩৯-২৪২

নির্বাচিত গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জি ২৪৩-২৫৮

সারণি সূচি

সারণি: ১.১- ১৮৯১-১৯২১ সাল অবধি আদমশুমারি (সেন্সাস) থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী অভিবাসীদের পরিসংখ্যান। ৪৩

সারণি: ১.২- ১৮৭২, ১৮৮১, ১৯০১, ১৯১১ ও ১৯৫১ সালের আদমশুমারি তথ্যানুযায়ী চব্বিশ পরগনা জেলা এবং ১৮৮১ ও ১৯৫১ সালের আদমশুমারি তথ্য থেকে মহকুমা ও থানা ভিত্তিক তথাকথিত নিম্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু হিন্দু জনজাতির জনবিন্যাসগত পরিসংখ্যান। ৪৭

সারণি: ১.৩- ১৯৭২ ও ১৯১১ সালের আদমশুমারির তথ্য থেকে মহকুমা ও থানা ভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যার পরিসংখ্যান ৪৯

সারণি: ১.৪- ১৮৭২, ১৮৮১, ১৯০১, ১৯১১ ও ১৯৫১ সালের আদমশুমারি তথ্যানুযায়ী চব্বিশ পরগনা জেলার এবং ১৯০১ ও ১৯১১ সালের আদমশুমারি তথ্য থেকে থানা ভিত্তিক আদিবাসী জনজাতির জনবিন্যাসগত পরিসংখ্যান। ৫১

সারণি: ২.১- ১৮৬১-১৮৭১ সাল অবধি ক্যানিং বন্দরে আগত জাহাজের পরিসংখ্যান। ৯৩

সারণি: ৪.১- ১৯৪০ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশনারের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯২৮-১৯৪০ সাল অবধি হস্তান্তরিত এলাকা এবং ভাগচাষির সংখ্যা। ১৬৩

সারণি: ৪.২- ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে ঋণগ্রস্ত পরিবারের শতকরা অনুপাত। ১৬৪

সারণি: ৪.৩- সুন্দরবনের কাকদ্বীপ অঞ্চলের অবৈধ্য নজরানা ও তার পরিমাণ। ১৬৬

সারণি: ৪.৪- এল খাতের আলির তথ্যের ভিত্তিতে গোসাবা গ্রাম সমবায় সমিতির সূচনাকাল থেকে ১৯৫৫ সাল অবধি সভাপতির তালিকা। ১৮৫

ভূমিকা

ভূমিকা

পোর্ট ক্যানিং পশ্চিমবঙ্গের সর্বদক্ষিণে নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত জলা-জঙ্গল ঘেরা সুন্দরবনের একটি ভগ্নাংশ মাত্র। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরন্যাঞ্চল সুন্দরবন, যেখানে দিনে রাতে বিচরণ করে পৃথিবী বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এহেন সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার হিসাবে পরিচিত ক্যানিং, পূর্বে পোর্ট ক্যানিং নামে সমধিক পরিচিত ছিল। তবে এরও আগে এই অঞ্চল মাতলা নামে ইতিহাসের সাক্ষী বহন করত। বর্তমানের ক্যানিং অঞ্চলটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার একটি অনুন্নত মহকুমা। এর অধীনে আছে চারটি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক ক্যানিং ১, ক্যানিং ২, বাসন্তী এবং গোসাবা। স্বাধীনতার পূর্বে পোর্ট ক্যানিং তৈরীর সূত্র ধরে বহুমুখী বিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল এই অঞ্চলে। এই-সময় বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের আগমনে জনপূর্ণ হয়ে উঠেছিল অঞ্চলটি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে আগত এইসব মানুষগুলি শুধুমাত্র ক্যানিং নয় এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতেও বসতি স্থাপন করেছিল। এই-সময়কালের মধ্যে ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন নামক একজন স্কটিশ সমাজ-সংস্কারক জল-জঙ্গল ঘেরা দ্বীপ গোসাবাতে গড়ে তুলেছিল তাঁর স্বপ্নের আবাদ। সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ স্যার হ্যামিল্টন বিভিন্ন সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে গোসাবার বুকে এনেছিল সমৃদ্ধির আলো। গোসাবার মানুষকে দিয়েছিল স্বায়ত্তশাসনের স্বাদ। এই স্বায়ত্তশাসনপিপাসু মানুষগুলিই পরবর্তীতে দিয়েছিল তেভাগার ডাক, যেটি ধীরে ধীরে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় গঠনের পথকে সুগম করেছিল।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে গবেষণা নিবন্ধ হিসাবে "পোর্ট ক্যানিং: একটি অঞ্চলের গড়ে ওঠার ইতিহাস (১৮৫৩-১৯৪৭)" বিষয়টিকে নির্বাচন করার পিছনে যুক্তি কি বা উদ্দেশ্য কি? কেনই বা আমি এই অঞ্চল এবং এই-সময় কালকে বেছে নিয়েছি? ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে

দীর্ঘদিন ইতিহাস বিষয়টি নিয়ে পঠন-পাঠনের সাথে যুক্ত থাকায় এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, প্রতিটি অঞ্চলের একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আছে, আছে তাদের ইতিহাস। এদের সব কয়টিকে চিনতে বা জানতে না পারলে সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বা তার বৈচিত্রকে বোঝা সম্ভব নয়। তাই ভারতীয় ইতিহাস গবেষণায় অতি সম্প্রতি আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা একটি স্বতন্ত্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। আর এই আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার মহাযজ্ঞে নিজেকে সামিল করে জন্মসূত্রে যে অঞ্চলে বসবাস করে আসছি সেই জন্মাঞ্চলকে আমার গবেষণা ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়ে একজন দায়িত্ববান নাগরিকের কর্তব্য পালনে ব্রতী হয়েছি। এছাড়া কেমন করে ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে থেকে একটি অঞ্চল নতুনভাবে বসতি স্থাপন থেকে শুরু করে স্বায়ত্তশাসনের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল, যেটি পরবর্তীতে তেভাগা নামক কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে ভাগচাষি কৃষককে স্বাধিকার অর্জনের লড়াইয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে তুলেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের তাগিদ আমাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছে।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধানে গবেষণার সময়কালের মধ্যে যেসব ইংরেজি ও বাংলা সহায়ক গ্রন্থ পঠন-পাঠনের সুযোগ পেয়েছি বা সাহায্য নিয়েছি সেগুলির বিষয়ে একবার আলোকপাত করে নেওয়া প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার্থে এখানে প্রথমে ইংরেজি এবং পরে বাংলা গ্রন্থগুলিকে বিশ্লেষণ করেছি। ইংরেজি গ্রন্থের মধ্যে ১৯৭৯ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত A. R. Desai সম্পাদিত 'Peasant Struggles in India' গ্রন্থে প্রকাশিত Ashim Mukhopadhyay-এর 'Peasant of the Parganas' এবং Krishna Kanta Sarkar-এর 'Kakdwip Tebhaga Movement' প্রবন্ধ দুটি কাকদ্বীপ ও চব্বিশ পরগনায় সংঘটিত তেভাগার সামগ্রিক চিত্রটিকে তুলে ধরেছেন। এছাড়া এইসব প্রবন্ধগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের তরফে তেভাগা আন্দোলনের সক্রিয় মাঝারি স্তরের মধ্যবিত্ত কর্মী

ও তৃণমূল স্তরের কৃষক কর্মীদের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ১৯৮৮ সালে কে. পি. বাগচি থেকে প্রকাশিত Adrienne Cooper-এর 'Sharecropping and Sharecropper's Struggles in Bengal 1930-1950' গ্রন্থটি ঔপনিবেশিক বাংলায় ভাগচাষি ব্যবস্থার উৎপত্তির পাশাপাশি তেভাগা আন্দোলনের ক্রমিক ঘটনাবলীর বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তেভাগা আন্দোলনে কৃষক সভার ভূমিকাটিও খুব ভালো ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৯৮৯ সালে বুক ল্যান্ড থেকে প্রকাশিত A. K. Mandal এবং R. K. Ghosh-এর লেখা 'Sundarban: A Socio Bio-ecological Study' গ্রন্থ, ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তাকালয় থেকে প্রকাশিত Rathindra Nath De-এর লেখা 'The Sundarbans' গ্রন্থ এবং ১৯৯৮ সালে কনসেপ্ট পাবলিশিং কোম্পানি থেকে প্রকাশিত Anuradha Banerjee-এর লেখা 'Environment, Population and Human Settlement of Sundarban Delta' গ্রন্থগুলি সুন্দরবনের ভৌগোলিক পরিবেশ, জনবসতির উৎপত্তি, শহর ও গ্রামের জনবিন্যাস ও তাদের সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছে। রত্না প্রকাশন থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'The Tebhaga Movement in Kakdwip'। Rabindra Nath Mondal কর্তৃক লিখিত এই গ্রন্থে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। ২০০৩ সালে Alapan Bandyopadhyay এবং Anup Matilal সম্পাদিত 'The Philosopher's Stone Speeches and Writing of Sir Daniel Hamilton' গ্রন্থটি থেকে স্যার হ্যামিল্টন সাহেবের সমবায় সম্পর্কিত বিভিন্ন চিঠি পত্র আদান-প্রদান ও বক্তৃতা-এর বিষয়ে জানা যায়। ২০০৪ সালে রিডার সার্ভিস থেকে প্রকাশিত Aparna Mandal-এর 'The Sundarbans An Ecological History, 1770-1870' গ্রন্থটি সমগ্র সুন্দরবনের ভৌগোলিক বিবরণ, সেখানে বসবাসকারী মানুষজন, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং তাদের বসতি স্থাপনের সূচনাকাল এমনকি তাদের

সমাজ-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ২০১৭ সালে Routledge Taylor এবং Francis Group থেকে প্রকাশিত Sutapa Chatterjee Sarkar কর্তৃক লিখিত 'The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals'। এখানে তিনি তাঁর লেখার সূচনা করেছেন সুন্দরবনের পুনরুদ্ধারের ইতিহাস ও জরিপ রেকর্ড দিয়ে এবং পুঁথি সাহিত্যে সুন্দরবনকে দেখার চেষ্টা করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি সুন্দরবনের ইতিহাসের দুটি বৈচিত্র্যময় দিককে সংযুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সুতপা চ্যাটার্জী সরকারের এই কাজটিও সামগ্রিকভাবে সমগ্র সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানের রাজনৈতিক এবং আংশিকভাবে দেবদেবীর ইতিহাসকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এছাড়া অতিসম্প্রতি Kaustubh Mani Sengupta and Tista Das সম্পাদিত 'Rethinking the Local in Indian History Perspectives from Southern Bengal' গ্রন্থে, Aviroop Sengupta-র লেখা Tidal Histories-Envisioning the Sundarbans, 1860s-1920 প্রবন্ধটি সুন্দরবনে অতীতে মানুষের বসতি ছিল নাকি ইংরেজ কর্তৃক প্রথম বসতির সূচনা হয়েছিল এই বিতর্কটিকে নতুন ভাবে বর্ণনা করেছেন। এরপর সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলি সম্পর্কে যেসব বাংলা গ্রন্থ আমার গবেষণা ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে সেগুলির বিষয়ে একবার আলোকপাত করে নেওয়া যেতে পারে। ১৯৬৯ সালে নবজাতক প্রকাশন থেকে প্রকাশিত মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুলের 'কৃষক সভার ইতিহাস' গ্রন্থটি সমগ্র বাংলার কৃষক সভার গঠন এবং তেভাগার আন্দোলনে তাদের অবদানকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৬৯ সালে র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব থেকে প্রকাশিত 'কাকদ্বীপ, সোনারপুর, ভাঙ্গড়ের কৃষক সংগ্রাম, ১৯৪৬-৪৮' গ্রন্থে সুপ্রকাশ রায় দক্ষিণ বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থ কাকদ্বীপ, সোনারপুর, ভাঙড় ও সন্দেশখালির কৃষক বিদ্রোহের এক পূর্ণ দলিল। ১৯৮৭ সালে প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত কুণাল চট্টোপধ্যায়ের 'তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস' থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে

তেভাগা আন্দোলনের সূচনা এবং এর বিস্তার সম্পর্কে বিশদে জানা যায়। জয়ন্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক ১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত 'বাংলার 'তেভাগা' সংগ্রাম' গ্রন্থটিও সমগ্র বঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করেছে। ১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হেমন্ত ঘোষাল কর্তৃক লেখা 'সময় অসময়ের স্মৃতি' তেভাগা আন্দোলনে হেমন্ত ঘোষালের স্মৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে তাঁর নেতৃত্বে ক্যানিং-এর আশে পাশে তেভাগা আন্দোলন দানা বেঁধেছিল। ১৯৯৯ সালে দে'জ পাবলিশিং হাউজ থেকে প্রকাশিত কমল চৌধুরীর লেখা 'চব্বিশ পরগনা-উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন' থেকে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার ভূপ্রকৃতি ও নদনদীর পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবনের আলাদা আলাদা পরিচয় পাওয়া যায়। নয়া উদ্যোগ থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত এ. এফ .এম. আব্দুল জলিলের 'সুন্দরবনের ইতিহাস' বাংলাদেশ সুন্দরবনের পাশাপাশি ভারতীয় সুন্দরবনের ভূপ্রকৃতি, প্রাচীনত্ব ও প্রাচীন জনপদ, গাজী-কালু-চম্পাবতী, মুকুল রায়, বনবিবি ও দক্ষিণ রায় প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবী সম্পর্কে জানা যায়। তবে এর বেশির ভাগটাই বাংলাদেশ সুন্দরবনের অংশ নিয়ে লিখিত হয়েছে। ২০০৪ সালে প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত গোকুল চন্দ্র দাসের সম্পাদনায় রচিত 'চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থটি সমগ্র চব্বিশ পরগনার সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের সাহায্যে চব্বিশ পরগনার ইতিহাসকে তুলে ধরার প্রয়াস। 'ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং' ২০১৭ সালে লোকসখা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত পূর্ণেন্দু ঘোষের এই গ্রন্থটি ক্যানিং শহরের ভৌগোলিক পরিচিতি এবং নদনদীর পাশাপাশি সম্পূর্ণ ক্যানিং অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জনপদ, পোর্ট ক্যানিং, সেখানকার মানুষজন, তাদের সাধন-ভজন, আচার-আচরণ, জীবন ও জীবন প্রবাহ নিয়ে লেখা। এছাড়া শিবশংকর মিত্রের 'সুন্দরবন সমগ্র', দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত 'শ্রীখন্ড সুন্দরবন', সুস্নাত দাশের 'অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম-তেভাগা

আন্দোলন ১৯৪৬-৪৭', সৌমেন দত্তের 'স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবা আখ্যান', শচীন দাশের 'জল-জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন' প্রভৃতি। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটি খুবই মূল্যবান যা আমার গবেষণা ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যদিও এর বেশিরভাগটাই শুধুমাত্র সুন্দরবন বিষয়ক-সুন্দরবনের পরিবেশ, উদ্ভিদ, প্রাণী অথবা ম্যানগ্রোভ এবং কোনো কোনোটি শুধুমাত্র সুন্দরবনের বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অথবা মৎস্য চাষ বিষয়ে আলোকপাত করেছে। আবার কিছু কিছু গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ বা ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুধুমাত্র বাংলাদেশ সুন্দরবন নিয়ে পর্যালোচিত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ ভারতীয় সুন্দরবন, অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার ঔপনিবেশিক সময়কাল ও বিভক্ত চব্বিশ পরগনার ইতিহাসকে কালানুক্রমানুসারে সাজিয়ে বর্ণনা করেছে। তবে পোর্ট ক্যানিং এবং এর পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের বহুমুখী বিবর্তন বা তাঁর গড়ে ওঠার ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রমাণ্য গ্রন্থ এখনো পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠেনি, যার দ্বারা বর্তমান ক্যানিং মহকুমাধীন অঞ্চলগুলির অতীত ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তাই ক্যানিং মহকুমার অতীত সম্পর্কে জানতে, তার গড়ে ওঠার ইতিহাসকে জানতে এই গবেষণা নিবন্ধটির মাধ্যমে যেসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছি সেগুলি হল- ১৮৫৩ সালের পূর্বে এবং পরে ক্যানিং মহকুমার অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতে কোনো মানুষের বসবাস ছিল কিনা? যদি না থাকে কেমন করে এখানে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল এবং কেমন ছিল তাদের জনবিন্যাস? ১৮৫৩ সালে কেন ব্রিটিশ সরকার কলকাতার পরিপূরক বন্দর হিসাবে মাতলা নদীর তীরে বন্দর গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল? বন্দর তৈরীর পিছনের ব্রিটিশ প্রশাসনের অন্য কোনো অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি ছিল কি? বন্দর তৈরীর সূত্রে কেমন করে নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল? পরিকল্পনামাফিক হলেও এই উদীয়মান বন্দর কেনই বা ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়েছিল আর বন্দর ধ্বংসের সাথে সাথে কি নগরায়ণের কাজ স্থগিত হয়েছিল? এছাড়া ক্যানিং বন্দর গঠনের

কত পরে বা কবে থেকে ক্যানিংয়ের সুদূর দক্ষিণে গোসাবাতে আবাদ শুরু হয়েছিল? কার হাত ধরে এই আবাদের সূচনা হয়েছিল, এর পিছনে তার কি উদ্দেশ্য ছিল? সর্বশেষ যে প্রশ্নটির মাধ্যমে ১৯৪৭ অবধি ক্যানিং মহকুমার রাজনীতির ইতিহাসকে দেখার চেষ্টা করেছি তা'হল ১৯৪৬ সালে সমগ্র বাংলায় কৃষকের দাবিকে কেন্দ্র করে যে তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তার কি প্রভাব পড়েছিল এই অঞ্চলের উপর? পরবর্তীকালে মহকুমা হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য আলোচ্যপর্বে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক আত্মপরিচয় গড়ে উঠেছিল।

উপরেল্লিখিত প্রশ্নের সমাধান সন্ধানে যে সমস্ত প্রাথমিক উপাদান যেমন Archival Records, Survey Records, Revenue History, District Handbook সহ সমসাময়িককালের ঔপনিবেশিক অফিসারদের দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ আমাকে সাহায্য করেছে। এখানে প্রাথমিক উপাদানগুলির মধ্যে সমসাময়িক কালে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির বিষয়ে উল্লেখের পরে সরকারি দলিল দস্তাবেজ ও পত্রপত্রিকার বিষয়ে আলোকপাত করেছি। যেমন ১৮৭৫ সালে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য এবং ভারত সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ স্ট্যাটিস্টিকস W. W. Hunter-এর 'A Statistical Account of Bengal -Vol-l, District of the 24 Parganas and Sundarbans' গ্রন্থটি থেকে চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থান, নদ-নদী, জল, জনগণ, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রশাসনিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৯৬৩ সালে সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' থেকে প্রতাপাদিত্যের সময় থেকে মাতলার অর্থাৎ বর্তমানের ক্যানিং-এর অবস্থান ও তার ইতিহাস জানতে পারি। ১৮৫৮ সালে Mutlah Association-এর হাত ধরে প্রকাশিত 'The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta : Its Progress and Prospect' এবং 'The Port of Calcutta and the Port Of Mutlah' Considered in Connection by A Railway or A Ship Canal' থেকে মাতলা নদীর তীরে যেভাবে পোর্ট

তৈরীর হাত ধরে শহর তৈরীর পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল এবং কয়েক দিনের মধ্যে যেভাবে সমাপ্তির পথে ধাবিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানা যায়। এছাড়া Frederick Eden Pargiter-এর 'Revenue History of Sundarban 1765-1870' এবং F. D. Ascoli–এর 'A Revenue History of Sundarban Voll-ll 1870-1920' থেকে সরকারের ভূমি পুনরুদ্ধার নীতি সম্পর্কে বিশদ জানা যায়। L. S. S. O'Malley কর্তৃক ১৯১৪ সালে প্রকাশিত 'Bengal District Gazetteer, 24 Parganas' এবং Anil Chandra Lahiri-এর 'Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of 24 Parganas, 1924-1933' এই গ্রন্থ দুটি থেকে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার ভৌগোলিক পরিচয়, ইতিহাস, জনগণ, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। West Bengal Co-operative press Ltd. থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'Gosaba Co-Operative Commonwealth: A Lecture, Sir Daniel Hamilton's Sundarban Estate'। ১৯৩২ সালের ২২শে আগস্ট হ্যামিল্টন অবাদ পত্তনের সমসাময়িক স্যার হ্যামিল্টনের বিশ্বস্ত ম্যানেজার বা তত্ত্বাবধায়ক S. B. Mazumdar (সুধাংশু ভূষণ মজুমদার) কর্তৃক হ্যামিল্টন আবাদ সম্পর্কিত এই বক্তৃতা হ্যামিল্টন আবাদ সম্পর্কে জানার জন্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। S. B. Mazumdar-এর একটি প্রবন্ধ 'Estate Farming in India, Gosaba' ১৯৪২ সালে Indian Farming vol.3, No. II জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটিও হ্যামিল্টন আবাদ বিষয়ক প্রাথমিক উপাদান হিসাবে মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ের Census Report গুলি দেখার চেষ্টা করেছি।

এরপর প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আর্কাইভ থেকে ১৮২৯-১৮৫৬ সালের Presidency Commissioner Sundarban Records যেটি মূলত চিঠি আদান প্রদানের দলিল ও Revenue Department, Land Revenue Branch এবং Home

Political Department থেকে প্রাপ্ত দলিল থেকেও উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেছি। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন থেকে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদান এবং গোসাবা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাখা হ্যামিল্টন বাংলোর লকার থেকে প্রাপ্ত কিছু দলিল যেগুলি হ্যামিল্টন এস্টেটের সমবায় ও পুঞ্জীভূত বিদ্রোহের প্রমাণ বহন করে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ের জনগণনার রিপোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা লাইব্রেরী থেকে প্রাপ্ত বক্তৃতামালার, নাশ্যনাল লাইব্রেরীর মাইক্রোফিল্ম বিভাগ থেকে পুরাতন পত্রিকা, মুজাফফর আহমেদ লাইব্রেরী গণশক্তি ভবন থেকে স্বাধীনতা পত্রিকা, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী থেকে সমসাময়িক কিছু গ্রন্থ প্রভৃতির ভিত্তিতে বর্তমানের ক্যানিং মহকুমার অতীত রূপ এবং তার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে এক সম্যক ধারণা সবার কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এইসব তথ্যের ভিত্তিতে আমার গবেষণা নিবন্ধটি মূলত ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও আরও চারটি অধ্যায় নিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। অধ্যায় চারটি হল: প্রথম অধ্যায়-ক্যানিং মহকুমার জনবসতির ইতিবৃত্ত ও জনবিন্যাস; দ্বিতীয় অধ্যায়-পোর্ট ক্যানিং: বিতর্কের মাধ্যমে শহরের উত্থান (১৮৫৩- ১৮৭১); তৃতীয় অধ্যায়-হ্যামিল্টনের আবাদ: স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনা (১৯০৩-১৯৪৬) এবং চতুর্থ অধ্যায়-ক্যানিং মহকুমার আঞ্চলিক সংগ্রাম: তেভাগা।

গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায় ‘ক্যানিং মহকুমার জনবসতির ইতিবৃত্ত ও জনবিন্যাস’-এর মাধ্যমে ক্যানিং মহকুমার জনবসতির ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা যেসব অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে সেই সকল অঞ্চলগুলির মধ্যে কেবলমাত্র মেদনমল্ল পরগনাই ব্রিটিশদের চব্বিশ পরগনা জমিদারি এলাকার মধ্যে পড়ত। বাকি অঞ্চলগুলি সেসময় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল নাকি মানুষের বসবাস ছিল এই নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে বিশ্লেষণ করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে

এখানে মানুষের বাস ছিল। বিশেষ করে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে প্রতাপাদিত্যের সময় থেকে কিভাবে এই অঞ্চল ইতিহাসের আলোকে এসেছিল সেই বিষয়ে বর্ণনা করেছি। এরপর মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যু কিভাবে অঞ্চলটিকে জনশূন্য করে তুলেছিল এবং ইংরেজদের আগমনের পর ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির তাগিদে বিভিন্ন ভূমি পুনরুদ্ধার নীতি কিভাবে জনশূন্য অঞ্চলকে পুনরায় জনপূর্ণ করে তুলেছিল সে বিষয়টির বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়। জনবসতি স্থাপনার এই বিশেষ পর্বে সুন্দরবনের সবচেয়ে বড়ো জমিদার পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি ছাড়াও ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন, রাধামাধব মুখার্জি, মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, নফর পাল চৌধুরী, বিপ্রদাস পাল চৌধুরীর মত লটদার এবং তাদের চকদার, গাঁতিদাররা কেমন করে এসব অঞ্চলের জমি পুনরুদ্ধার করে বসতি গড়ে তুলেছিল (যাদের নামের পরিচয় পাওয়া যায় অঞ্চলগুলির নামের মধ্যে) এইসব বিষয়গুলির বিশদ বর্ণনা এই অধ্যায়টিকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া জমি পুনরুদ্ধার কাজে ছোটনাগপুর মালভূমির পাদদেশ থেকে আনীত আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষগুলি এবং তাদের সাফল্যের পথ ধরে পার্শ্ববর্তী জেলা মেদিনীপুর, হুগলি ও বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা, বরিশাল থেকে আগত মানুষগুলি এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাতে পরিণত হয়েছিল, যাদের আদমশুমারিগত পরিসংখ্যান তুলে ধরার মাধ্যমে এই অঞ্চলের জনবিন্যাসকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি।

পরবর্তী অধ্যায় ‘পোর্ট ক্যানিং: বিতর্কের মাধ্যমে শহরের উত্থান (১৮৫৩-১৮৭১)’ এ উল্লেখ করেছি হুগলি নদীর তীরে গড়ে ওঠা কলকাতা আন্তর্জাতিক বন্দরের মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে ব্রিটিশদের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল হুগলি নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণে সেই বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতিনিধি স্বরূপ লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৩ সালে কলিকাতার পরিপূরক বন্দর হিসাবে মাতলার তীরে একটি সহায়ক বন্দর গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, যেটি রেলপথ

ও ক্যানেলের মাধ্যমে কলকাতার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। এভাবে কলকাতার সুদূর দক্ষিণে কলকাতার পরিপূরক বন্দর হিসাবে মাতলা নদীর তীরে বন্দর তৈরীর সূচনা হয়েছিল। আর এই বন্দর তৈরীর সূত্রে তৈরী হয়েছিল শহর। অধ্যায়টিতে বন্দর তৈরীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে হুগলি নদীর নাব্যতা হ্রাস ছাড়াও আরও যেসব কারণ তৎকালীন সময়ে চেম্বার অফ কমার্সের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করেছিল সেগুলিকে বিশদে বর্ণনা করেছি। এরপর বন্দর তৈরীর স্থান নির্ণয়ে কি কারণে মাতলার নিকটবর্তী ৫৪ নম্বর ও ৫০ নম্বর লটটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল সেই বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করার পর কিভাবে বন্দর এবং তাকে ঘিরে শহর নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল সেটি বিশ্লেষণ করেছি। শহর তৈরীর কার্য পরিচলনায় সুন্দরবন কমিশনার কর্তৃক ১৮৬২ সালের জুন মাসে গঠিত ক্যানিং পৌরসভা এবং পৌরসভাকে আর্থিকভাবে সাহায্য দানের জন্য পৌরসভার সদস্য ফার্দিনান্দ শিলার কর্তৃক 'পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, রিক্লামেশন এন্ড ডগ কোম্পানি লিমিটেডট' নামক যে কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার অবদান বর্ণনা করেছি। এরপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কোম্পানি ও পৌরসভার মধ্যকার বিরোধ কেমন করে মাতলার তীরে শহর তৈরীর স্বপ্নকে অল্প কালের মধ্যেই ধ্বংস করে দিয়েছিল সেই বিষয়টি আলোচনা করে অধ্যায়টি সমাপ্ত করেছি।

গবেষণা নিবন্ধের তৃতীয় অধ্যায় 'হ্যামিল্টনের আবাদ: স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনা (১৯০৩-১৯৪৬)'। এই অধ্যায়ে এমন একজন মানুষের কথা আলোচনা করেছি যিনি তাঁর পরিকল্পনার মাধ্যমে বর্তমানের ক্যানিং মহকুমার গোসাবা ব্লকের বেশিরভাগ মানুষের কাছে আজও প্রজাদরদী একজন মহান ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। তিনি ছিলেন ম্যাকিনন ম্যাকেনজি কোম্পানির কর্ণধার স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন। অধ্যায়টির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সুন্দরবনের ভূমি বন্দোবস্ত বিধি ১৮৭৯ সালের লার্জ ক্যাপিটালিস্ট রুলস অনুযায়ী হ্যামিল্টন সাহেব কেমন ভাবে গোসাবা, রাঙ্গাবেলিয়া ও

সাতজেলিয়া দ্বীপের ইজারা স্বত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জমিদারি স্বত্ব গ্রহণ করে তিনি যেসব সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমগ্র গোসাববাসীকে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর করে তুলেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানগুলির বিশদ বর্ণনা করেছি। এছাড়া হ্যামিল্টন সাহেবের এইসব উন্নয়নমূলক কার্য কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মত ব্যক্তিত্বকে মুগ্ধ করেছিল সেটিও এই অধ্যায়ের মূল বিচার্য বিষয়। এভাবে হ্যামিল্টন সাহেবের সমবায় পরিকল্পনায় ভর করে গোসাবাবাসী একদিন স্বায়ত্তশাসনের স্বাদ পেয়েছিল।

গবেষণা সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায় 'ক্যানিং মহকুমার আঞ্চলিক সংগ্রাম: তেভাগা' নামক শিরোনাম নিয়ে তেভাগার বিষয়ে আলোচনা করেছি, কারণ মহকুমার ইতিহাস লিখতে গেলে সেই অঞ্চলের আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তবে আমার আলোচিত সময়পর্বে সমগ্র ভারতবর্ষে সংঘটিত অন্যান্য আন্দোলনের প্রভাব ব্যতিরেকে কেবলমাত্র তেভাগার প্রভাবটিকে বেশি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছি। অধ্যায়ের শুরুতে দেখিয়েছি কেমন করে ব্রিটিশ কর্তৃক ১৮৫৩ এবং ১৮৭৯ সালের সুন্দরবন ভূমি বন্দোবস্ত আইন দুটি মধ্যস্বত্বভোগী চকদার, গাঁতিদার ও হাওলাদারদের সৃষ্টি করেছিল, যারা জমির প্রকৃত মালিক লটদারদের থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার নিয়ে খাজনা চাপিয়ে দিয়েছিল চাষিদের উপর, যেটি সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থায় ভাগচাষি ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। এখানে দেখিয়েছি ভাগচাষি কারা কেমন করে এদের উদ্ভব হয়েছিল, কারণ এই ভাগচাষির ন্যায় সঙ্গত দাবি ১৯৪৬ সালের নভেম্বরে তেভাগা আন্দোলনের আকার নিয়েছিল। তবে ভাগচাষির এই আন্দোলন শুরুর আগে কেমন করে ভাগচাষির সমস্যা এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এই অধ্যায়টিতে সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ভাগচাষির যন্ত্রণা আন্দোলনের আকার নিত না যদি না বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা এতে অংশগ্রহণ করত তাই গবেষণা নিবন্ধটির এই অধ্যায়ে দেখিয়েছি কেমন করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার উদ্ভব হয়েছিল এবং তারা কেমনভাবে

ভাগচাষিদের একত্রিত করে সমগ্র বাংলার ন্যায় সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে তেভাগার ডাক দিয়েছিল। সর্বশেষে অধ্যায়টির মাধ্যমে আমার গবেষণা অঞ্চল ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে মঠেরদীঘিকে কেন্দ্র করে ক্যানিং ও তার পার্শ্ববর্তী কোন কোন অঞ্চল কেমন ভাবে তেভাগার আঁচে দগ্ধ হয়েছিল, এছাড়া হ্যামিল্টন সাহেবের সমবায় পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের স্বাদ পাওয়া গোসাবাবাসী কেমন করে এস্টটের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলেছিল সেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছি।

সর্বশেষে সমগ্র নিবন্ধটি বিশ্লেষণ করে এটা বলা যেতে পারে যে, জল-জঙ্গল পূর্ণ ক্যানিং অঞ্চল একটি বন্দর তৈরীর সূত্র ধরে বাদাবনের পরিচয় সরিয়ে শহরের রূপ নিতে শুরু করেছিল। আর শহর তৈরীর সূত্রে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষের কোলাহলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল একদিন। এরপর হ্যামিল্টন সাহেবের সমবায়ের আদর্শ তাদের স্বনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হতে শিখিয়েছিল। তাদের একটা আত্মপরিচয় গড়ে উঠেছিল, যেটি ১৯৪৬ সালে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষণ বিরোধী তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার পথকে সুগম করেছিল। এভাবে একটি অঞ্চল বাদাবন থেকে ধীরে ধীরে তার রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে তুলেছিল, যেটি পরবর্তীতে মহকুমা গঠনের আন্দোলনের মাধ্যমে মহকুমা তৈরীর ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণ করেছিল।

প্রথম অধ্যায়

ক্যানিং মহকুমার জনবসতির ইতিবৃত্ত ও জনবিন্যাস

প্রথম অধ্যায়

ক্যানিং মহকুমার জনবসতির ইতিবৃত্ত ও জনবিন্যাস

মাতলা নদীর নামে নামাঙ্কিত মাতলা জনপদ বর্তমানে ক্যানিং নামে পরিচিত। ক্যানিং এবং তার পার্শ্ববর্তী কতকগুলি অঞ্চলের সমষ্টি বর্তমানের ক্যানিং মহকুমা আজ সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার হিসাবে স্বীকৃত। আজ যেসব অঞ্চল ক্যানিং মহকুমার অংশ কোম্পানির শাসনের পূর্বে অথবা কোম্পানির শাসনের সময় সেগুলির বেশিরভাগটাই সুন্দরবন এবং কিছুটা অংশ চব্বিশ পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোম্পানির শাসনের শুরুতে সুন্দরবন বলতে বাংলা প্রদেশের দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের কুল ঘেঁষে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীর দ্বারা সৃষ্ট অসংখ্য ছোটো-বড়ো দ্বীপের মধ্যে বিস্তৃত সুবিশাল বনভূমিকে বোঝাত। ব্রিটিশ শাসনের সময় সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং চব্বিশ পরগনা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ নামক এই তিনটি জেলা সমগ্র সুন্দরবনকে ঘিরে রেখেছিল। এর পূর্ব সীমানায় মেঘনা নদী আর পশ্চিম দিকে ছিল হুগলী নদী। সমগ্র সুন্দরবন এবং চব্বিশ পরগনার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি তখন বন্য পশুর বিচরণক্ষেত্র সঙ্গে ডাকাত ও দস্যু পরিপূর্ণ। ফার্মিঙ্গারের ফিফথ রিপোর্ট থেকে চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবনে এইরূপ ডাকাতি এবং দস্যুতার বিবরণ পাওয়া যায়।[১] এহেন সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে কলিকাতার নিকটবর্তী এক সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চল ছিল ক্যানিং, যেটি পূর্বে মাতলা নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিল। তবে পুরাতন দিনের লোকের মুখে মাতলা নামের কথা আজও শোনা যায়। ১৮৭০ সাল নাগাদ এই মাতলাই ছিল বর্তমানের ক্যানিং সংলগ্ন সুন্দরবনের একমাত্র শহর। তবে শহর রূপে আত্মপ্রকাশের পূর্বে মাতলা জনপদ এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি, যেগুলি আজ মহকুমার অংশ বিশেষ সেখানে কেমন করে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল বা আগে কোনো বসতি ছিল কিনা এবং কেমন ছিল তাদের জনবিন্যাস? এই প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধানই হবে এই অধ্যায়টির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাকে পরাজিত করে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেন মীর জাফর আলি। আর যুদ্ধ জয়ে সাহায্যের প্রতিদান স্বরূপ ১৭৫৭ সালের ২০ই ডিসেম্বর লর্ড রবার্ট ক্লাইভ পেয়েছিলেন কলকাতা সহ চব্বিশ পরগনার জমিদারি স্বত্ব।[২] মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থায় বাংলার ক্ষুদ্রতম রাজস্ব একক ছিল 'মহাল' যার অর্থ এক একটি জমিদারি যেটি কখনো কখনো একটি গ্রামেও সীমাবদ্ধ হতে পারত। জমিদারি সনদের মধ্যে এইসব স্থানগুলিকে পরগনা হিসাবে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত অর্থে এগুলির বেশিরভাগই ছিল পরগনার অংশ বিশেষ মহাল। এইরূপ চব্বিশটি মহাল বা জমিদারির সম্মিলিত রূপ হিসাবে জমিদারি স্বত্ব হস্তান্তরের দলিলে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে শুরু করে দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত বিস্তৃত সেদিনের ২৪টি পরগনার নাম ছিল কলিকাতা, আকবরপুর, আমিরপুর, আজিমাবাদ, বালিয়া, বারিদহাটি, বসনদারী, দখিন সাগর, গড়, হাতিয়াগড়, ইখতিয়ারপুর, খাড়িজুড়ি, খাসপুর, মেদনমল, মাগুরা, মানপুর, ময়দা, মুড়গাছা, পাইকান, পেচাকুলি, সতল, শাহনগর, শাহপুর ও উত্তর পরগনা। এই পরগনাগুলিকে একত্রিত করে কোম্পানি যে স্বতন্ত্র চব্বিশ পরগনার জমিদারি স্বত্ব পেয়েছিল তার আয়তন ছিল ৮৮২ বর্গ মাইল এবং এর বার্ষিক রাজস্ব ধার্য হয়েছিল ২২২৯৫৮ টাকা। জমিদার হিসাবে কোম্পানি তাদের এই প্রদেয় রাজস্বের পুরো অর্থটাই মুঘল রাজকোষে জমা দিত।[৩] তবে প্রথম দিকে এই জমিদারির মালিকানা স্বত্ব ছিল কেবলমাত্র ক্লাইভের কাছে। অর্থাৎ লর্ড ক্লাইভ ছিলেন চব্বিশ পরগনার জমিদার। ১৭৭৪ সালে ক্লাইভের মৃত্যুর পরে চব্বিশ পরগনা জমিদারির নিরুঙ্কুশ অধিকার লাভ করেছিলেন কোম্পানি। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের সুবিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জয়যাত্রা। এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে তা'হল, উক্ত চব্বিশটি পরগনার মধ্যে মেদনমল পরগনা ব্যতীত অন্য কোনো স্থান বর্তমান ক্যানিং মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের সাক্ষ্য

অনুসারে বেশিরভাগ মহাল বা পরগনার অবস্থান ছিল হুগলী নদীর পূর্ব পাড়ে। মাত্র কয়েকটি ছিল হুগলীর পশ্চিম পাড়ে বর্তমান হাওড়া ও হুগলী জেলার মধ্যে।[৪] আধুনিক মানচিত্রে উল্লেখিত স্থান নামের সাথে মিলিয়ে দেখলে মহাল বা পরগনাগুলি সুনিশ্চিতভাবে হুগলীর পূর্ব পাড়ে উত্তরে কলকাতা ও সংলগ্ন লবন হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত। হান্টার উল্লেখিত চব্বিশ পরগনার মধ্যে কেবলমাত্র মেদনমল পরগনার কিছু অংশ বর্তমানের ক্যানিং থানার এলাকাভুক্ত ছিল। হান্টারের বর্ননানুসারে, মেদনমল ছিল বারুইপুর মহকুমার অধীন বিদ্যাধরী নদীর তীরে অবস্থিত একটি কাঠের ব্যাবসার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং পোর্ট ক্যানিং পর্যন্ত বিস্তৃত কলকাতা ও দক্ষিণ-পূর্ব রাজ্য রেলওয়ের একটি স্টেশন। “it appears that a great port of this fiscal division was formerly a dense jungle, overrun with wild beasts and the ancestor of the present zamindar Sadananda Choudhuri obtained a great of it from the Emperor of Delhi”[৫] অর্থাৎ মেদনমল পরগনার কিছু অংশ বাদে মহকুমার বেশিরভাগ অংশটাই ছিল সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত। তৎকালীন সময়ের ইংরেজ সিভিল সার্ভেন্ট ও সুন্দরবন কমিশনারদের বিবরণ থেকে এটা জানা যায় যে, অসংখ্য নদী-খাড়ি, খাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন, নির্দিষ্ট সীমানাহীন জলা-জঙ্গলাকীর্ন এই ভূমিতে মানুষের বসবাস বা আবাদ ছিল না। চব্বিশ পরগনার জমিদারি স্বত্ব গ্রহণের পরেই কোম্পানি এইসব অঞ্চলের জঙ্গল পরিস্কার করে মানুষের বসবাসের যোগ্য করে তুলেছিল। কিন্তু এই কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ সুন্দরবন কমিশনার ফ্রেডারিক ইডেন পারজিটার তাঁর বিবরণীতে বারবার উল্লেখ করেছেন যে, কালেক্টর স্কটের তত্ত্বাবধানে লেফটেন্যান্ট মরিসন সুন্দরবনের ম্যাপ তৈরীর সময় চব্বিশ পরগনা সুন্দরবনের তিনজন জমিদার ছিলেন। এঁরা হলেন বারুইপুরের রাজবল্লভ রায়, খাড়ি, হাতিয়াগড় ও শাহাপুরের রামরতন মিত্র ও রানি শঙ্করী দাসী। এদের মধ্যে রাজবল্লভ রায়ের জমিদারি ছিল চব্বিশ পরগনা, নদীয়া এবং যশোহর সীমান্তের অভ্যন্তর পর্যন্ত।[৬] এছাড়া ১৮৬৮

সালে হেনরি জেমস রেইনি (Henry James Rainey) এশিয়াটিক সোসাইটির একটি আলোচনায় তাঁর "What was the Sundarbans originally, and when, and wherefore did it assume its existing state of utter desolation?" শীর্ষক গবেষণাপত্রের মাধ্যমে প্রথম কোনো বিদেশি হিসাবে দেখিয়েছিলেন যে, মন্দির, মসজিদ এবং অন্যান্য প্রাসাদের বিক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে যে, সুন্দরবন শুধুমাত্র জনবসতিপূর্ণ ছিল না বরং সভ্যতার দিক থেকে যে-কোনো দেশের চেয়ে উন্নত ছিল তবে সেটা অবশ্যই সুন্দরবনের উত্তরাংশের দিকে ইঙ্গিত দেয়।[৭] অর্থাৎ সাম্প্রতিক গবেষণা এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে, সুদূর অতীতে এখানে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। তাই জঙ্গল হাসিলের সময় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও সংলগ্ন সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে গুপ্ত যুগের মুদ্রা, পাল ও সেন যুগের গ্রামদান সম্পর্কিত তাম্রপট্টোলি, প্রাচীন অট্টালিকার অবশেষ, মন্দির, প্রস্তর নির্মিত দেবদেবীর মূর্তি, ধাতু নির্মিত অলংকার, রক্তাভ ও ধূসর মৃৎপাত্র, টেরাকোটা অলংকার ও সিলমোহর এবং অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী অক্ষত বা ভগ্ন অবস্থায় উন্মোচিত হতে থাকে। এইসব প্রত্নবস্তুগুলির বেশিরভাগটাই জঙ্গল হাসিলের সময় গ্রামবাসী কর্তৃক পুকুর খনন অথবা সরকারি কোনো পরিকাঠামো নির্মাণের সময় আকস্মিকভাবে উদ্ধার হয়েছিল। এভাবে সমগ্র চব্বিশ পরগনার তথা সুন্দরবনের কত শত প্রত্নবস্তু এবং তাদের সম্ভারের সাক্ষ্য পাওয়া গেছে বা আজও অনাবিষ্কৃত হয়ে আছে। এর সবগুলি যেহেতু আমার গবেষণা লব্ধ অঞ্চলের আয়ত্তাধীন নয় তাই এখানে শুধুমাত্র মাতলা নদীর উপকূলবর্তী এবং এর পার্শ্বস্থ অঞ্চলগুলি থেকে যেসব প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে সে বিষয়ে বর্ণনা করা হল। সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর খুলনার ইতিহাস থেকে জানা যায় জটার দেউলের পূর্বোত্তর কোণে পরাণ বসুর খাল যেটি মাতলা নদী থেকে বিদ্যা নদীতে মিশেছে, এই খালের দক্ষিণে ১২৭ নং লাটে একটি ইষ্টক স্তুপ আবিষ্কৃত হয়েছিল। স্থানীয় লোক এই স্তুপটিকে 'বিরিঞ্চর মন্দির' বলে থাকে। এই খালের

উত্তর পাড়ে ১২৮ নং লাটে অবস্থিত ভরতগড়। খাল থেকে সাত-আট শত হাত দূরে চারিপাশে পরিখাবেষ্টিত সেই গড় বা দুর্গের প্রকান্ড ইটের স্তুপ এবং প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। সতীশচন্দ্র মিত্র এটিকে ভরত রাজার মন্দির বলে চিহ্নিত করেছেন।[৮] এছাড়া মাতলা নদীর পূর্বাংশ ১২৯ নং লাট হাড়ভাঙ্গা আবাদে ২০ থেকে ২২ বিঘা আয়তনের একটি প্রকাণ্ড দীঘি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই দীঘির পূর্ব পাড়ে ১৩০ নং লাটে জঙ্গল আবাদকরনের সময় অনুরূপভাবে একটি ছোটো পোস্তবাঁধা পুকুরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, যেটিকে সবাই গলায় দাড়িয়ার পুকুর বলে জানত।[৯]

অতি সম্প্রতি মাতলা নদীর নিকটে আরও একটি নতুন প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্যানিং টাউন থেকে দক্ষিণে সাতমুখী বাজার, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বা অটো রিক্সাতে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে ডাবু গ্রাম। বঙ্গীয় পুরাতত্ত্ব পরিষদের মুখপত্র ‘পুরাতাত্ত্বিক’ পত্রিকায় দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায় ‘সুন্দরবনে আবিষ্কৃত নতুন প্রত্নস্থল’ শিরোনামে ডাবু প্রত্নস্থল সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রায় এক কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রত্নস্থলটিতে নানা রঙের বিশেষকরে লাল-কালো, উজ্জ্বল মসৃণ কালো ও ধূসর রং-এর মাটির ভাঁড় ও খোলার কুচি, পুঁতিদানা, হাতি, ঘোড়া ও অপরিচিত জন্তুর মোটিফ যুক্ত পোড়ামাটির খেলনা গাড়ি এবং তামার ঢালাই মুদ্রা ও পাথরের ভাঙ্গা মূর্তি পাওয়া গেছে। এইসব ভাঙ্গা মূর্তির মধ্যে থেকে অন্তত একটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি পাওয়া গেছে বলে তিনি অনুমান করেছেন।[১০] এইসব তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, ক্যানিং মহকুমার এইসব অঞ্চলে গুপ্ত, পাল ও সেন রাজত্বকালে সমৃদ্ধ জনপথ ছিল, যদিও সেগুলি সুন্দরবনের উত্তরাংশের মত সমৃদ্ধ ছিল বলে মনে হয় না।

ক্যানিং মহকুমা যে ঐতিহাসিক চরিত্রের সাক্ষ্য বহন করেছিল তিনি হলেন মহাপ্রতাপান্বিত রাজা প্রতাপাদিত্য। সেন আমলের শেষের দিকে বঙ্গদেশ তিন ভাগে বিভক্ত

ছিল-লক্ষ্মৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁ। মাতলা সাতগাঁওয়ের অধীনে যশোহর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর মধ্যযুগে বাংলার সর্বনিম্ন এই অংশ প্রথম দিকে ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী এবং সবশেষে মুঘল শাসনের সাক্ষী হয়েছিল। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকালে গৌড়ের রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল বর্তমান দুই চব্বিশ পরগনার ভূখণ্ড সহ দক্ষিণ-পশ্চিমে সুন্দরবন পর্যন্ত।[১১] ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বাংলার শেষ সুদক্ষ শাসক হুসেন শাহের মৃত্যুর পর থেকে আকবরের বাংলা বিজয়ের মধ্যবর্তী এই সময়ে বাংলার সর্বোচ্চ শাসন কেন্দ্রে বলিষ্ঠ রাজকীয় কর্তৃত্বের অনুপুস্থিতিতে বাংলার দক্ষিণাংশ এক চরম অরাজক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুরা জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এই-সময় বাংলার নিম্ন দক্ষিণবঙ্গের পূর্বপ্রান্তে পাঠান-সুলতানি শাসনের শেষের দিকে অনুগ্রহপুষ্ট কয়েকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমলা ও ভূ-মধ্যাধিকারী নিজেদেরকে স্বাধীন রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। এরকম বারোজন ভূস্বামী বাংলার ইতিহাসে ‘বারো ভূঁইয়া’ এবং এদের রাজত্ব ‘দ্বাদশ ভৌমিকের’ রাজত্ব নামে পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্য। ১৫৮৭ সালে পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপাদিত্য যশোহরের সিংহাসনে বসেন।[১২] সিংহাসনে বসেই প্রতাপাদিত্য সর্বপ্রথম মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার দমন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। নৌযুদ্ধে পারদর্শী প্রতাপ নৌবহরকে শক্তিশালী করতে নৌসেনা ও প্রশাসক পদে বহু মগ ও পর্তুগীজদের নিযুক্ত করেছিলেন এবং রাজ্যের নানা স্থানে অনেকগুলি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এদের মধ্যে একটি ছিল মাতলা অঞ্চলে মাতলা দুর্গ বা হায়দারগড় দুর্গ। যদিও এইসব দুর্গগুলির সামান্যতম ধ্বংসাবশেষ আজ আর দেখতে পাওয়া যায় না, মুঘল আমলে বহু রক্তাক্ত যুদ্ধের সাক্ষী ছিল এইসব দুর্গ।[১৩] মাতলা দুর্গের অবস্থান নির্ণয়ে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন “রায়মঙ্গল বাহিয়া আরও উত্তর দিকে আসিয়া বড়ো কলাগাছিয়া ও আঠারো বাঁকি নদী দিয়া অবশেষে

মাতলার কাছে বিদ্যাধরিতে মিশিতে হইতো, মাতলার নিকট সেই মোহনায় একটি দুর্গ ছিল। ইহাকে মাতলা দুর্গ বলে"।[১৪] এই দুর্গের সেনাপতি হায়দর মানসিকের নাম অনুসারে এর অপর নাম হায়দার গড়ও হতে পারে। এছাড়াও তিনি তার গ্রন্থের পাদটিকায় আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন "এ দুর্গের স্থান বর্তমান মাতলা বা ক্যানিং শহরের উত্তরাংশে অবস্থিত এখানে এখনো বুরুজখানা প্রভৃতি উঁচু ঢিবি দেখিতে পাওয়া যায়। যার নিকটে প্রতাপনগর নামক গ্রাম, কুঠিবাড়ি, রাজার খাল, হায়দার আবাদ এখনো অনেক প্রাচীন কথা মনে করাইয়া দেয়"।[১৫] কিন্তু এখন তার কোনো প্রকার অস্তিত্ব নেই।

১৬১০ সালে মুঘলদের হাতে পরাজিত ও বন্দী হয়ে ঢাকা যাওয়ার পথে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হলে সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল বা নিম্ন বঙ্গের জনপদগুলির অধিকার চলে যায় পর্তুগীজ ও আরাকান অঞ্চল থেকে আগত মগদের হাতে। পর্তুগীজ ও আরাকান মগদের অত্যাচারে চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ অংশের জনপদগুলি পরিত্যক্ত হয়ে লোকালয় শূন্য অরণ্যে পরিণত হয়েছিল।[১৬] সতীশচন্দ্র মিত্রের কথায় "মগেরা আসিয়া যে মুল্লুকের উপর পড়িত, তাহারা শাসন-নীতি মানিত না, একেবারে ধ্বংস করিয়া ছাড়িত। শাসনহীন প্রদেশকে এখনও লোকে 'মগের মুল্লুক' বলে। সমস্ত দক্ষিণবঙ্গ এইরূপে মগের মুল্লুক হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরে আসিল ফিরিঙ্গি। তাহারাও অনেক দেশকে নিজের দেশ করিয়াছিল, অনেক জলপথকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। সুন্দরবনের সমৃদ্ধ নগরীসমূহ তাহারাই বিনষ্ট করিয়াছিল।"[১৭] এই কারণে ১৭৮০ সালের জেমস রেনেল যখন গাঙ্গেয় উপদ্বীপের মানচিত্র তৈরী করেছিলেন তখন তিনি সুন্দরবনের একটি অংশকে "Country Depopulated by Muggs" বলে চিহ্নিত করেছিলেন।[১৮] যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেল লিখেছিলেন, মুঘল আমলে সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষির চমৎকার বিস্তার ঘটেছিল। কিন্তু মগেদের অত্যাচারে সেই আবাদি এলাকাগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ফলে সুন্দরবনের সীমা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৯] তাই ইংরেজ রাজত্বের

সূচনালগ্নে কলিকাতার সন্নিকটে অরণ্য দেখা যেত।[২০] তবে রেনেল তাঁর ম্যাপে সুন্দরবনের যে অংশটিকে মগ কর্তৃক জনহীন হয়েছিল বলে অনুমান করেছেন সেটি সুন্দরবনের পূর্বাংশ বেশখালি (Beeskhaalee) নদীর পূর্ব পাড়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে অন্য অংশের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।[২১] বেশখালি সম্ভবত বাখরগঞ্জ জেলার অঞ্চলাধীন ছিল। পশ্চিম সুন্দরবন এবং তারও উত্তরের লোকালয়ে মগ বা আরাকানিদের দস্যুবৃত্তির কোনো তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং সুন্দরবন কমিশনার ইডেন পারজিটার পূর্ব সুন্দরবনের পূর্বাংশে একটি মগ গ্রামের সন্ধান দিয়েছেন, যারা কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বসবাসে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।[২২] তবে পশ্চিম সুন্দরবন ও তার উত্তরের লোকালয়গুলি যে পর্তুগীজ জলদস্যদের আক্রমণের শিকার হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই পর্তুগীজরা মূলত ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত ছিল। লাতিন শব্দ ফ্রাঙ্ক (Frank) থেকে ফেরাঙ্গ (Ferang) এবং এর থেকে ফিরিঙ্গি শব্দের উদ্ভব। কিন্তু আরবরা সব ইউরোপীয়দের ফেরাঙ্গ নামে পরিচয় দিত। মূলত পর্তুগীজরা দীর্ঘকাল এদেশে বসবাস কালে ভারতীয় স্ত্রীলোকের সংসর্গে বা সংস্পর্শে এসে যে বর্ণ সংকর জাতির জন্ম দিয়েছিল তারাই ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত।[২৩] তবে ফিরিঙ্গিদের মধ্যে সবাই দস্যুতা করে জীবিকা অর্জন করত না। যারা পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করত তারা ফিরিঙ্গি দস্যুদের সংসর্গ এড়িয়ে চলত। মূলত ভাগীরথীর মোহনা এবং উত্তরে হুগলির শাখা নদীর তীরবর্তী জনপদগুলিতে ফিরিঙ্গিরা আক্রমণ, হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার মত নৃশংস অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত ছিল। ডায়মন্ড হারবার, কুলপি, লক্ষীকান্তপুর ও সংলগ্ন অঞ্চল তখন ফিরিঙ্গি দেশ নামে অভিহিত ছিল। এদের প্রধান ঘাঁটি ছিল সাগরদ্বীপ এবং উত্তরের বিদ্যাধরী নদী-সংলগ্ন তাড়দহে।[২৪] এই তাড়দহ বর্তমানের চাম্পাহাটির নিকটবর্তী তাড়দহ কিনা এই বিষয়ে সঠিক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে ফিরিঙ্গি সন্ত্রাস যে সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দক্ষিণাংশ জুড়ে ছিল এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তৎকালীন সময়ে পর্তুগীজ ও

মগ জলদস্যু ভীতি এতটাই ছিল যে মুঘল নৌ-সেনারাও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করত।[২৫] শাহজাহানের রাজত্বকালে ভারত ভ্রমণে আগত ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের (Francois Bernier) বিবরণ থেকেও পর্তুগীজ জলদস্যুতার বিবরণ পাওয়া যায়। বার্নিয়ের-এর বিবরণ অনুযায়ী পূর্বে গঙ্গা-ভাগীরথীর মোহনা অঞ্চলের দ্বীপগুলি লোকালয় পূর্ণ ছিল কিন্তু তাঁর ভ্রমণ কালে অঞ্চলগুলি জনশূন্য ধূ-ধূ গ্রামে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ একসময় যেখানে মানুষের বসবাস ছিল এখন সেখানে হিংস্র জন্তুদের বিচরণক্ষেত্র।[২৬] অর্থাৎ আরাকানবাসী মগ ও পর্তুগীজ ঔরসজাত ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ অংশের বসতি এলাকাকে পুনরায় অরণ্যে পরিণত করেছিল এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে জেমস ফার্গুসন (James Ferguson), চার্লস লয়েল (Charles Lyell), জন রুড রেইনি (John Rudd Rainey)-এর মত ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা অনুযায়ী কেবলমাত্র জলদস্যুতা নয় ভূমি অবনমন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অস্বাভাবিক জলস্তর বৃদ্ধিও এই অঞ্চলের জনপদ ধ্বংসের জন্য দায়ী ছিল।[২৭] ১৭৩৭ সালের ভূমিকম্পে সমুদ্রের জল ভূপৃষ্ঠের ৪০ ফুট পর্যন্ত উপরে উঠে আসে। ফলে অঞ্চলগুলি দীর্ঘকাল নিমজ্জিত থাকায় মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল।[২৮] আমার আলোচ্য মাতলার তীর বরাবর জলদস্যুতার প্রভাব কতটা ছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও এটা অনুমান করা যায় যে চব্বিশ পরগনার দক্ষিণাংশের অন্যান্য অঞ্চলগুলি যেভাবে ফিরিঙ্গি অত্যাচারের শিকার হয়েছিল তার থেকে রক্ষা পায়নি মাতলা এবং আশপাশের জনপদগুলি। তবে মাতলার তীরে বন্দর তৈরীর সূত্রে একটি দিঘি খননের সময় ভূমি অবনমনের স্পষ্ট উদাহরণ বা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। খনন কার্য চলাকালীন ৮ থেকে ১০ ফুট মাটির নিচে একটি সংকীর্ণ স্থানে একসঙ্গে ৪০টি সুন্দরী গাছের সারি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, যেটি নিমজ্জন ব্যতীত আর অন্য কোনো বিষয়ের নমুনা হতে পারে না।[২৯] সুতরাং এটা অনুমান করা অস্বাভাবিক নয় যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন

চব্বিশ পরগনা জমিদারি স্বত্ব গ্রহণ করেছিল তখন তারা চব্বিশ পরগনার নিম্ন অংশ তথা সুন্দরবনের অধিকাংশ স্থানই অরাণ্যাবৃত, শ্বাপদ-সংকুল ও দস্যু নিয়ন্ত্রিত একটি জঙ্গল হিসাবে দেখেছিল।[৩০] এমনকি কলিকাতার উপকণ্ঠ পর্যন্ত সুন্দরবন বিস্তৃত ছিল। শোনা যায় ক্লাইভ গড়ের মাঠে বাঘ শিকার করেছিলেন। এইসব অঞ্চলকে ইংরেজরা চরম অস্বাস্থ্যকর এবং বন্যপশু ও চোরাকারবারি জলদস্যুদের আশ্রয়স্থল হিসাবে গণ্য করতেন।[৩১] তাই বহুদিন অবধি তারা এদিকে ফিরেও তাকাননি। এভাবে ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে কয়েক জন বিশেষ করে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট জেমস ওয়েস্টল্যান্ড (James Westland) ও বাখরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট হেনরি বেভারিজ (Henry Beveridge) এবং ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার (W.W. Hunter), এফ. ই. পারজিটার (F. E. Pargiter)-এর মত সিভিল সার্ভেন্টরা সুন্দরবনকে একটি ভীতিকর, পূর্বে জনবসতিহীন কুৎসিত জঙ্গল হিসাবে প্রতিপন্ন করে কোম্পানির শাসনের মঙ্গলকর দিকটিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো করে দেখিয়েছিল। তাদের মতে কোম্পানির শাসনের সূত্র ধরে সুন্দরবনের ভূমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সুন্দরবন প্রথম আধুনিকতার স্বাদ অনুভব করতে পেরেছিল।[৩২] সুন্দরবনের জমি সম্পর্কে প্রথম আগ্রহের সূত্রপাত কলকাতা ও চব্বিশ পরগনা জমিদারির প্রথম কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেলের নিযুক্তির সময় থেকেই। মূলত কলকাতার নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ১৭৭০ - ১৭৭৩ পর্যন্ত এই-সময়পর্বে তিনি কলকাতা জমিদারির দক্ষিণ-পশ্চিমের কিছু জঙ্গলে জমি আবাদীকরণের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া শুরু করেছিলেন।[৩৩] ক্লড রাসেল কর্তৃক বন্দোবস্ত কৃত এই জমি ‘পতিতাবাদি তালুক’ নামে পরিচিত ছিল। পারজিটার তাঁর বিবরণীতে সল্টলেক থেকে কুলপির নিম্নভাগ পর্যন্ত অঞ্চলকে এই পতিতাবাদি তালুকের সীমানা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।[৩৪] এর এক দশক পর ১৭৮৩ সালে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেল তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুমোদন নিয়ে সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলকে কতগুলি তালুকে বিভক্ত করে জঙ্গল হাসিলের

উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শুরু করেছিলেন নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার।[৩৫] হান্টারের মতানুসারে সুন্দরবনের মত এই বৃহৎ বনভূমিকে ধানের জমিতে রূপান্তরিত করে হেঙ্কেল সাহেব পুনরুদ্ধার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। হেঙ্কেলের আবাদ করা জমি আজও হেঙ্কেলগঞ্জ বা হিঙ্গলগঞ্জ নামে পরিচিত।[৩৬] তবে জঙ্গল হাসিল করে চাষের জমি পুনরুদ্ধার এবং রাজস্ব বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টায় জোয়ার এসেছিল উনিশ শতকের সূচনালগ্নে। এই-সময় বহিঃবিশ্বে বাংলার চালের বিপুল চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যোগান বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির তাগিদে অনাবাদি জলাভূমিকে চাষের আওতায় এনে কৃষি জমি উদ্ধার ও মনুষ্য বসতির সূচনা হয়েছিল। শুরু হয়েছিল সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন।[৩৭]

এভাবে পরবর্তী চল্লিশ বছরে জমিদার, ইজারাদার ও আংশিকভাবে অনুমোদিত ব্যক্তিদের দ্বারা দক্ষিণে সাগরদ্বীপ থেকে শুরু করে পূর্বে পোর্ট ক্যানিং পর্যন্ত প্রায় সমস্ত এলাকা চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছিল।[৩৮] এর মধ্যে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেছিলেন। তবে পার্শ্ববর্তী জমিদারদের সঙ্গে সীমানা সম্পর্কিত জটিলতা ও উৎপাদন ব্যবস্থার অনিশ্চয়তার কারণে সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা যায়নি। এরপর ১৮২৮ সালে রাজস্ব বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তৃতীয় রেগুলেশন অনুসারে পার্শ্ববর্তী জমিদারদের সাথে জমে থাকা অমীমাংসিত মামলাগুলি নিষ্পত্তি করে তৎকালীন সুন্দরবন কমিশনার উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ের এবং সার্ভেয়ার লেফটেন্যান্ট আলেকজান্ডার হজেস সুন্দরবনের বসতি এলাকা ও জঙ্গল এলাকার সীমানা নির্ণয় করে একটি কাল্পনিক রেখা নির্ধারণ করেছিলেন যেটি আজও সুন্দরবনের উত্তর সীমা ড্যাম্পিয়ের হজেস লাইন নামে পরিচিত।[৩৯] এভাবে ড্যাম্পিয়ের হজেস লাইনকে সীমানা নির্দিষ্ট করে ১৮৩০ সাল থেকে সুপরিকল্পিতভাবে সুন্দরবনের ভূমি

বন্দোবস্তের সূচনা হয়েছিল। ১৮৩০ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত মোট ১১০টি, প্রথম পর্যায়ে ৯৮ এবং পরবর্তীতে আরও ১২টি লটের বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছিল। অর্থাৎ এই বন্দোবস্ত অনুসারে ড্যাম্পিয়ের হজেস লাইনের দক্ষিণে প্রায় ৩০৮৯ বর্গমাইল মোট জঙ্গল এলাকার মধ্য থেকে ১৪৬০ বর্গমাইল এলাকা বসতি স্থাপন ও চাষাবাদের জন্য পরিষ্কার করা সম্পন্ন হয়েছিল।[৪০] এই সময়ের মধ্যে যেসব লটদাতা ভূমিস্বত্ব গ্রহণ করেছিল তাদের বেশির ভাগই ছিল ইউরোপীয় ইংরেজ কোম্পানির প্রতিনিধি। এদের মধ্যে প্রধান প্রধান বন্দোবস্ত গ্রহীতারা ছিলেন মি: কের, স্টারমার, ম্যাকডরমট, ম্যাকেঞ্জি, ডি. কোস্টা, বেটস, ক্লার্ক, হ্যামারটন, হিটলি, স্টর্ম, রজার্স, ক্যাম্পবেল প্রমুখ এবং তিনজন বাঙালি লাটদার ছিলেন রাধাকৃষ্ণ দত্ত, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী এবং হাফিজ উদ্দিন।[৪১] এইসব লটদাররা কোন কোন এলাকা বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন তার সঠিক অবস্থান জানা না গেলেও মোটামুটি ভাবে জানা যায় যে, এর পরবর্তী ৩০ বছরের মধ্যে সমগ্র সুন্দরবনের প্রায় একের-দুই অংশ জমি হাসিল করা সম্ভব হয়েছিল। এই-সময় বাখরগঞ্জ ও চব্বিশ পরগনার সীমান্তবর্তী দ্বীপগুলিতে আবাদ শুরু হয়েছিল। এরপর ১৮৫৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর জমি বন্দোবস্তের জন্য বিখ্যাত ৯৯ বছরের চুক্তি, ১৮৬৩ সালের অক্টোবরে ওয়েস্ট ল্যান্ড রুল এবং ১৮৭৯ সালে মিস্টার গোমস কর্তৃক প্রণীত "লার্জ ক্যাপিটালিস্ট রুলস" অনুযায়ী একের পর এক সুন্দরবনের বৃহত্তর এলাকা পুনরুদ্ধারকৃত হয়েছিল এবং চাষের এলাকা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। এই সময়ের মধ্যে সুন্দরবনের ১৭৮টি লট গ্রান্ট হিসাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ৩০ জন ইউরোপীয়, একজন আর্মেনিয়ান, ২ জন দেশীয় খ্রিস্টান, ৩০ জন মুসলমান ও ১০৫ জন হিন্দু লটদার ছিল।[৪২]

এভাবে ১৭৮০ থেকে ১৮৭৩ সালের মধ্যে হাসনাবাদ, হাড়োয়া, ভাঙ্গর এবং কুলপি থানার লটগুলির পুনরুদ্ধারের কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। হিঙ্গলগঞ্জ, মিনাখাঁ, ক্যানিং, জয়নগর, মথুরাপুর এবং সাগর থানার লটগুলিতে জঙ্গল হাসিলের কাজ চলছিল দ্রুতগতিতে। ১৯৩৯

সালের মধ্যে এইসব অঞ্চলগুলির সাথে সাথে সন্দেশখালি, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, বাসন্তী, কুলতলী, গোসাবা ও মথুরাপুর লটগুলির পুনরুদ্ধার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।[৪৩] সুন্দরবনের এইসব অঞ্চলের জমিস্বত্ব ইজারা নেওয়ার পর লটদাররা তাদের লটগুলির মালিকানা স্বত্ব চকদারদের সঙ্গে, চকদারেরা আবার রায়াত প্রজাদের সঙ্গে এবং রায়তরা তাদের অধীনস্থ রায়তদের (under raiyat) সঙ্গে বন্দোবস্ত করতেন।[৪৪] এভাবে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে চক, ঘেরি, গাঁতি নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এবং এদের মালিকানাধারী চকদার, ঘেরিদার ও গাঁতিদারদের উদ্ভব হয়েছিল। বর্তমান ক্যানিং মহকুমার অন্তর্গত এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মালিকগুলির বিষয়ে বিশদে বর্ণনার পূর্বে জঙ্গল হাসিল করে বসতি স্থাপন এবং চাষের জমি পুনরুদ্ধারের এই-পর্বে ক্যানিং ও গোসাবাতে মনুষ্য বসতির প্রচেষ্টা এক বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

ক্যানিং:

সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে বসতি স্থাপন এবং কৃষির বিস্তার ঘটিয়ে দ্রুত রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক সরকার যেসব নীতি নির্ধারণ করেছিল ক্যানিং এবং সাগরদিঘির ক্ষেত্রে সেগুলি সফল বা কার্যকর হয়নি। এই দুটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে কৃষির প্রসার অপেক্ষা বাণিজ্যিক স্বার্থই সরকারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ক্যানিং-এর আবাদকরণ ও বন্দর নির্মাণের প্রেক্ষাপট বিচার করলে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ১৮৫৩ সালের ৫ই জুলাই ডালহৌসি সরকার কলিকাতার পরিপূরক বন্দর হিসাবে মাতলা নদীর নিকটবর্তী ৫৪ নাম্বার লটটি ক্রয় করেছিলেন। অর্থাৎ ৫৪ নম্বর লটটি সরকার কর্তৃক ক্রয়ের পূর্বেই ইজারা দেওয়া ছিল এবং নিশ্চয়ই এর মালিক ছিলেন অন্য কেউ। এ. সি. লাহিড়ীর মতে "বন্দোবস্ত বিধি ১৮৩০" এর বিধান অনুসারে কলকাতার পার্শ্ববর্তী ৫৪ নম্বর লট (বর্তমানের ক্যানিং) এবং ৫২ নাম্বার লট

ক্যানিং-এর নিকটবর্তী তালদির দক্ষিণে দোনেতলা আবাদ উরকাট (Urquart) নামক এক ইউরোপীয় বণিককে ইজারা দেওয়া হয়েছিল।[৪৫] কিন্তু রাজস্ব বিভাগের একটি দলিলে দেখা যায় ওই একই সময়ে ক্রাফর্ড (Crawford) নামে এক ব্রিটিশ ভদ্রলোক ওই লটের ২১০০০বিঘা জমি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন।[৪৬] উরকাট ও ক্রাফর্ড জঙ্গলাকীর্ণ মাতলার অনেকখানি স্থান পরিষ্কার করেছিলেন তবে সাফল্য বিশেষ আসেনি। কারণ শ্রমিক শ্রেণির অপ্রতুলতা এই সময়ের বেশিরভাগ বন্দোবস্তকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছিল। ক্যানিংও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তাই বহুবার মালিক পরিবর্তন হয়েছে এই লটটির। একাধিক হাত বদলের পর ১৮৪৭ সালে ৫৪ নম্বর লটের মালিক হয়েছিলেন রাধামাধব মুখার্জি। তিনি আবার এর কিছু অংশ স্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন শিবনারায়ণ বসুকে।[৪৭] তাইতো ১৮৫৩ সালে যখন সরকার ৫৪ নম্বর লটে বন্দর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তখন এর বন্দোবস্ত গ্রহীতা ছিলেন রাধামাধব মুখোপাধ্যায়। একটি জাহাজ চলাচলের ক্যানাল এবং রেলপথের মাধ্যমে মাতলা ও কলকাতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য সরকার ১১০০০ টাকার বিনিময়ে উক্ত লটের ২৫০০০ বিঘা জমি রাধামাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ক্রয় করেছিল।[৪৮] এছাড়াও সরকার ১৮৫৬ সালে ৫৪ নাম্বার লটের পার্শ্ববর্তী ৫০ নাম্বর লটটির ২০০০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করেছিল।[৪৯] এরপর ৫৪নং লট এবং তার পার্শ্ববর্তী লটগুলিকে কেন্দ্র করে প্রস্তাবিত বন্দর এবং তাকে ঘিরে শহর তৈরীর মহান কর্মযজ্ঞের সূচনা হয়েছিল, যেটি পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে। সরকার ১৮৬২ সালের জুন মাসে Act No. XXVI of 1850 অনুসারে শহর ও বন্দরের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কার্য পরিচালনার জন্য একটি পৌরসভা গঠন করেছিল।[৫০] এই পৌরসভার ওপরেই ন্যস্ত হয়েছিল মাতলা নদী-সংলগ্ন পূর্বোক্ত ২৭০০০ বিঘা জমির স্বত্ব এবং স্বার্থ এমনকি রাজস্ব গ্রহণের অধিকারও।[৫১] কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ পৌরসভা ২৫০২০০ টাকা ঋণের বিনিময়ে একটি কোম্পানির হাতে বন্দর পরিচালনার এবং ৫০ বছরের জন্য শুল্ক

আদায়ের অধিকার প্রদান করেছিল।[৫২] উক্ত কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফার্দিনান্দ শিলার। শিলার এবং তাঁর পাঁচজন ইউরোপীয় ও ভারতীয় সহযোগী ১৮৬৫ সালের শুরুতে বন্দর পরিচালনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে "পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এন্ড রিক্লামেশন এন্ড ডগ কোম্পানি লিমিটেড" নামে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কোম্পানিই ছিল সর্বাধিক পরিচিত 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি'।[৫৩] সুন্দরবনের সর্বাপেক্ষা বড়ো লটদার ছিল এই 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি'। শুধুমাত্র বন্দর নির্মাণ ও পরিচালনার কাজে সীমাবদ্ধ না থেকে কোম্পানি ১৮৬৫-৬৬ সালে ২১টি অনাবাদি লট ইজারা নিয়েছিল।[৫৪] এই লটগুলির মধ্যে ১৮৬৩ সালে 'ওয়েস্ট ল্যান্ড রুলস' বা 'ফি-সিম্পল রুলস' অনুসারে সরকারের কাছ থেকে নিয়েছিল ১০টি লট এবং অবশিষ্ট ১১টি লটের ইজারাদারি স্বত্ব ক্রয় করেছিল পূর্বতন ইজারাদারদের থেকে। কোম্পানির জমিদারি সীমানা ছিল বাসন্তী-গোসাবার এপার থেকে উত্তরে উচিলদহ-মিনাখাঁ পর্যন্ত। আজও এইসব এলাকার সাধারণ মানুষকে বলতে শোনা যায় তাদের জমিদার ছিলেন 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি'। এছাড়া সুন্দরবনের কাঠ, মধু, ঝিনুক প্রভৃতির একচেটিয়া অধিকার গ্রহণের লক্ষ্যে ১৮৬৫-৬৬ সালে নানা প্রকার প্রভাব খাটিয়ে কোম্পানি সরকারের কাছ থেকে সুন্দরবনের জলকর ও বনকর বন্দোবস্ত নিয়েছিল।[৫৫] ফলে নদীতে মাছধরা থেকে শুরু করে জঙ্গলের কাঠ কাটা সর্বক্ষেত্রেই কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে খুব বেশিদিন এই অবস্থা স্থায়ী হয়নি। কলকাতার ব্যবসায়ী শ্রেণি এবং কাঠুরিয়া ও কাঠ ব্যবসায়ীদের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আদায়ের প্রতিবাদে প্রবল বিক্ষোভের মুখে সরকার ১৮৬৮ সালে কোম্পানির বনকর বন্দোবস্ত বাতিল করে দিয়েছিল।[৫৬] এরই সাথে ১৮৬৭ সালে সামুদ্রিক ঝড় বন্দর ও শহর মাতলার ভাগ্য বিপর্যয়ের সংকেত বয়ে এনেছিল। এই বিষয়ে বিশদে বর্ণিত হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে। ঝড়ের ভয়ে বন্দরে আগত জাহাজের সংখ্যা কমতে থাকায় কোম্পানির বিপুল

বিনিয়োগ সত্ত্বেও বন্দরের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছিল। শেষ প্রচেষ্টা স্বরূপ রাইস মিলও কোম্পানিকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে না পারায় ১৮৭০ সালের মধ্যে কোম্পানি তার সমস্ত উদ্যোগ গুটিয়ে নিতে শুরু করেছিল। বন্দর ও মিউনিসিপ্যালিটিও ক্রমশ জনমানব শূন্য হতে শুরু করেছিল। এরকম পরিস্থিতিতে ১৮৭০ সালের আগস্ট মাসে কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার মাধ্যমে বাজার থেকে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের সমস্ত সম্পত্তি ও স্বার্থ 'পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড' নামক কোম্পানিকে হস্তান্তর করেছিল।[৫৭] এই 'পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড কোম্পানির' বড়ো শেয়ারহোল্ডার হয়েছিল বোম্বাইয়ের 'ডেভিড সেশুন এন্ড সন্স' (David Sassoon and Sons) কোম্পানি তাই এর সদর দপ্তরও স্থানান্তরিত হয়েছিল বোম্বাইতে। নবগঠিত 'পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড কোম্পানি' বন্দর, শহর ও মিউনিসিপ্যালিটির সবরকম অধিকার ত্যাগ করে শুধুমাত্র সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল আর জমিদারি পত্তনের কাজে পুরো মাত্রায় নিয়োজিত হয়েছিল। এভাবে নবগঠিত কোম্পানি শুধুমাত্র জমিদারি উন্নয়নে মনোনিবেশ করে তাদের বার্ষিক ব্যয় ৪০০০ টাকায় কমিয়ে এনেছিল।[৫৮] এভাবে ১৯৫৩ সালের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন বলবৎ হওয়ার আগে অবধি এই কোম্পানিই ছিল সুন্দরবনের সবচেয়ে বড়ো জমিদার।

গোসাবা: হ্যামিল্টনের আবাদ:

ভারতীয় সুন্দরবনের ১০২টি দ্বীপের মধ্যে যে ৫৪টি দ্বীপে মনুষ্য বসতি গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে জল-জঙ্গল ঘেরা গোসাবা ব্লকের গোসাবা, রাঙাবেলিয়া এবং সাতজেলিয়া দ্বীপ তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঘ কুমিরের বসত এলাকা সুন্দরবনের মধ্যে অবস্থিত এই তিনটি দ্বীপে জঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষের বাস এবং কৃষির সূচনা খুব বেশি পুরাতন নয়। গত শতাব্দীর প্রথম দশকে শ্বাপদ-সংকুল এই দ্বীপগুলিতে যেভাবে মনুষ্য বসতির সূচনা হয়েছিল

সেটি সুন্দরবনের অন্যান্য দ্বীপগুলির জনবসতির পত্তন ও কৃষির প্রসারের ইতিহাস থেকে আলাদা। কারণ এই দ্বীপগুলির জমিদার ছিলেন স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন। স্কটিশ উদারপন্থী হ্যামিল্টন ১৮৮১ সাল থেকে ম্যাকিনন ম্যাকেনজি কোম্পানির কলকাতা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকাকালীন পরাধীন ভারতবর্ষের গ্রাম বাংলার করুণ কাহিনীকে আত্মস্থ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট মোচনের জন্য এবং শোষণমুক্ত এক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সুন্দরবনের কিছু অনাবাদি জমি লিজ নিয়ে মানব কল্যাণের পরীক্ষাগার গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সময়টাও ছিল তাঁর পক্ষে। অতিরিক্ত রাজস্ব লাভের আশায় অনাবাদি সুন্দরবনের বুক উজাড় করে মানুষের বসতি স্থাপন ও চাষের জমি তৈরী করে কৃষির প্রসার ঘটাতে সরকার বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিল। আর এই উদ্দেশ্যকে পাথেয় করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত থেকে শুরু করে সরাসরি মালিকানা স্বত্ব বিক্রির সবরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মনঃপুত সাফল্য না পেয়ে সরকার তৎকালীন সুন্দরবন কমিশনার মিস্টার গোমস-এর তত্ত্বাবধানে পূর্বাপেক্ষা অধিক উদার কিন্তু পুঁজি নির্ভর বিধানের প্রবর্তন করেছিল। ১৮৭৯ সালে প্রস্তুত এই ভূমি বন্দোবস্ত বিধান ছিল দুই প্রকার, বৃহৎ পুঁজির জন্য 'বৃহৎ পুঁজিবাদী বিধান (Large Capitalist Rule)' স্বল্প পুঁজির জন্য 'ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী বিধান (Small Capitalist Rule)'। সুন্দরবনের ভূমি বন্দোবস্ত আইন বা বিধানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি সাফল্য পেয়েছিল বৃহৎ পুঁজিবাদী বিধান। অর্থশালীদের আগ্রহের অভাবে যেখানে পূর্বের বন্দোবস্ত আইনগুলি ব্যর্থ হয়েছিল সেখানে বৃহৎ পুঁজিবাদী বিধানের সাফল্য চোখে পড়ার মত। এই বিধান মতে চব্বিশ পরগনা সুন্দরবনের সবচেয়ে বেশি এলাকা বন্দোবস্ত দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ১৮৭৯ সাল থেকে ১৯০৩ সাল বৃহৎ পুঁজিবাদী বিধানের প্রথম পর্বে চব্বিশ পরগনার ১৮২টি লটের অধীনে প্রায় ৫০৯ বর্গমাইল জঙ্গল এলাকা আবাদীকরণের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। যেটি পার্শ্ববর্তী

খুলনা ও বাখরগঞ্জ সুন্দরবনের তুলনায় অনেক বেশি।[৫৯] এছাড়া লট গ্রহণে ইচ্ছুক আবেদনকারীদের সংখ্যা দেখেও আগ্রহের অনুমান পাওয়া যায়। এফ. ডি. অ্যাসকলির বিবরণ থেকে জানা যায় যে ১৮৯৪ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ৮০৪ জন আবেদনকারীর মধ্যে কেবলমাত্র ১৭১ জনকে বন্দোবস্ত দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।[৬০] তবে এই সাফল্যের পিছনে বৃহৎ পুঁজিবাদী-বিধানের উদারনীতির পাশাপাশি সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক অস্থিরতাও দায়ী ছিল বলে মনে হয়। পূর্বের ভূমি বন্দোবস্ত বিধানগুলির অসাফল্যের পিছনে সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিল শ্রমিক শ্রেণির অপ্রতুলতা। সেখানে তৎকালীন সময়ে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের আগমন পর্যাপ্ত শ্রমিকের চাহিদা মিটিয়েছিল। এই-সময় নাগাদ বেশ কয়েকটি আদিবাসী বিদ্রোহ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রভাবিত করেছিল। ব্রিটিশ সরকার সেই সব বিদ্রোহ দমনে অমানুষিক অত্যাচারের পথ অবলম্বন করেছিল। কোথাও কোথাও সেনাবাহিনী নামিয়ে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল। স্বভূমিতে সেনাবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার ওইসব অঞ্চলের আদিবাসীদের মানসিক ভাবে বিপন্ন করে তুলেছিল। এইরূপ বিপন্ন পরিস্থিতিতে যখন তারা বসতবাড়ি ছাড়তে প্রস্তুত হয়েছিল ঠিক তখনই সুন্দরবনের লাটদার-গাঁতিদারদের দ্বারা প্রেরিত আড়কাঠিয়া বা ঠিকাদারদের আগমন হয়েছিল। সুন্দরবনে নতুন বাসভূমি গঠনের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তাদের উপস্থাপনা আদিবাসীদের মনে নতুন প্রত্যয় সঞ্চার করেছিল। সুন্দরবনের নতুন বাসভূমিতে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের সম্ভাবনায় রেলপথ ও নৌকায় বহু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের আগমনে ভরে উঠেছিল সুন্দরবন। এইরূপ উভয়মুখী সুবিধার সম্মিলিত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কলকাতাবাসী বেনিয়া ও অর্থশালী উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির ন্যায় স্কটল্যান্ডবাসী হ্যামিল্টন লন্ডন মিশনারি সোসাইটির উইন্টার রিচার্ড লেকেন মারফৎ ১৯০৩ সালে ১৪৯ নাম্বার লট গোসাবা দ্বীপ, এবং

পার্শ্ববর্তী ১৪৩ নাম্বার লট রাঙ্গাবেলিয়া দ্বীপ দুটি ইজারা নিয়েছিলেন।[৬১] তবে সুন্দরবনের অন্যান্য লটদাররা যেখানে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের লোভে সুন্দরবনকে লুটতে এসেছিল সেখানে হ্যামিল্টনের লক্ষ্য ছিল সুন্দরবনের আবাদভূমিতে নতুন উপনিবেশ গড়ে জমিদার মহাজনের দ্বারা শোষিত হত-দরিদ্র মানুষগুলিকে মানুষের মত বাঁচার অধিকার দেবেন। এইসব উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে তিনি ১৯০৯ সালে ১৪৮ নম্বর লটের সাতজেলিয়া নামক আরও একটি দ্বীপের ইজারাদারি স্বত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে গোসাবা ও রাঙাবেলিয়া দ্বীপের প্রায় ৮৮৮০ একর এবং সাতজেলিয়া দ্বীপের ১৪০০০ একর অর্থাৎ প্রায় ৩৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে হ্যামিল্টন এস্টেট বা হ্যামিল্টনাবাদ গড়ে উঠেছিল।[৬২] আস্তে আস্তে অরণ্যের বুকে গড়ে উঠেছিল নতুন বাসভূমি। হিংস্র জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ গোসাবা দ্বীপকে বসবাসের উপযোগী করতে প্রাথমিক কাজ ছিল জঙ্গল সাফাই ও বাঁধ নির্মাণ। আর এইসব কাজে স্যার ড্যানিয়েলের সঙ্গী হিসাবে এসেছিল তাঁর বিশ্বাসভাজন কয়েকজন বন্ধু। পরবর্তীতে বিহারের রাঁচি থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক এবং মেদিনীপুর থেকে কুলিদের নিয়ে এসেছিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার ও বাঁধ নির্মাণের মত কাজে আগত এই সমস্ত উপজাতি সম্প্রদায় এবং কুলিরাই ছিল ড্যানিয়েল এস্টেটের প্রথম বাসিন্দা। তারাই এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল।[৬৩] এরপর ধীরে ধীরে গোসাবাকে মনুষ্য বসতির আদর্শস্থান হিসাবে গড়ে তুলতে ড্যানিয়েল বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সংগঠনের সূচনা করেছিলেন। (এই সমস্ত সমবায় সংগঠনের গঠন এবং কার্যপ্রণালী তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদে বর্ণিত হয়েছে) সমবায়ের ধারণা শুধুমাত্র বাংলাতে নয় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম আমদানি হয়েছিল তাঁর হাত ধরে। গ্রামীণ উন্নয়নের এই মহাযজ্ঞে সামিল হতে, স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলতে আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে ঋণ, দুর্যোগ ও জমিদারের অত্যাচারে ভিটেমাটি হারানো সর্বস্বান্ত মানুষগুলি ভিড় জমাতে শুরু করেছিল। এদের দেখাদেখি

মহাজন শ্রেণির লোকগুলিরও আগমন ঘটেছিল এই দ্বীপে। কিন্তু ড্যানিয়েল সাহেব কঠোর হাতে মহাজনি ব্যবসা দমন করে গোসাবার বুক থেকে মহাজন শব্দটি মুছে ফেলেছিলেন। এরপর ১৯৪২ সালের ঘূর্ণিঝড়, ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পূর্ববঙ্গ থেকে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাংশ থেকে হাজার হাজার মানুষের আগমন ঘটেছিল সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় গোসাবা, রাঙাবেলিয়া এবং সাতজেলিয়া দ্বীপে।

সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে বসতি স্থাপনের সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি ছিল লটদারি প্রথা তবে এর আপত্তিকর দিকটিও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লটদারি প্রথা সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থায় একাধিক মধ্যস্বত্বভোগীর জন্ম দিয়েছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মান বৃদ্ধির আশায় ব্রিটিশ শাসনে হঠাৎ অর্থশালী হয়ে ওঠা উকিল, ব্যবসায়ী ও বিচারপতি শ্রেণির মানুষগুলি সুন্দরবনের জমিদারি স্বত্ব কিনে লটদারে পরিণত হয়েছিল। জমির সাথে সম্পর্ক পরিবর্জিত এই মানুষগুলি কলকাতায় বসে যেসব লট ইজারা হিসাবে নিত, সেই কলকাতাতে বসেই আবার বিজ্ঞাপন বা হ্যান্ডবিল ছেপে চক, ঘেরী, গাঁতি প্রভৃতি নামে লটগুলির অংশ বিক্রি করে দিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই অংশগুলির মালিকানা স্বত্ব লাভের পর এর মালিকরা পরিচিত হত চকদার, গাঁতিদার এবং ঘেরিদার নামে। এদের মধ্যে চকদার ও গাঁতিদার যারা পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ এবং আবাদের কাজ পরিচালনা করবে এই প্রতিশ্রুতিতে আরও বেশি দামে লটদারদের কাছ থেকে লটের বিভিন্ন অংশের জমিদারি স্বত্ব লিজ নিত। লটদারদের মত এঁরাও ছিল শহরবাসী এবং বহিরাগত। জমির সাথে এদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। এই চকদার ও গাঁতিদারদের অধীনে ছিল ঘেরিদার বা উচ্চবিত্ত রায়ত। অর্থশালী ও লোকবল সম্পন্ন এই শ্রেণিই ছিল সমাজের জোতদার বা মন্ডল। সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থায়

লটদার অপেক্ষা এই তিন শ্রেণিই সাধারণ প্রজাদের কাছে জমিদার হিসাবে বিবেচিত হত। শহরবাসী এইসব জমিদারদের হয়ে জমিদারি পরিচালনা করতেন ঠিকাদার, ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি অধস্তন রায়ত। ঠিকাদার বা আড়কাঠিয়াদের কাজ ছিল বাঁধ নির্মাণ ও জঙ্গল কাটার কাজে ছোটনাগপুর মালভূমি ও উড়িষ্যা থেকে আদিবাসী শ্রমিকদের আনয়ন। পুরস্কার স্বরূপ পেত হাজার হাজার বিঘা জমি। ফলে এরাও হয়ে উঠত চকদার বা ঘেরিদার। অন্যদিকে যারা রোদ বৃষ্টি এক করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারা বছর ধরে আবাদ ভূমিকে বাসযোগ্য করার কাজে নিয়োজিত ছিল তারাই কখনো জমির মালিক হতে পারেনি।

ক্যানিং মহকুমার উল্লেখযোগ্য কয়েকজন লটদার ছিলেন রাধামাধব মুখার্জি, পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি, মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী, বিপ্রদাস পাল চৌধুরী, স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন প্রমুখ। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির আগমনের পূর্বে ক্যানিং শহর যে ৫৪ নম্বর লটের উপর গড়ে উঠছিল তার মূল লটদার ছিলেন রাধামাধব মুখার্জি। এরপর পোর্টকে কেন্দ্র করে শহর নির্মাণের সময় সৃষ্ট 'পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এন্ড রিক্লামেশন এন্ড ডক কোম্পানি লিমিটেড' সংক্ষেপে 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি' হয়েছিল ৫৪ নম্বর লট সহ পার্শ্ববর্তী আরও ২১টি লটের লটদার।[৬৪] লটগুলির মধ্যে কিছু লট বর্তমানের বাসন্তী এবং গোসাবার অধীন যেমন, ১২৪-১২৮, ১৩৩, ১৩৪ এবং ১৩৬ নম্বর লটগুলি বাসন্তী থানার অধীন। বাসন্তী থানার অন্তর্গত সরবেড়িয়া, সোনাখালী, বড়িয়া, চুনোখালি প্রভৃতি অঞ্চলগুলি ছিল কোম্পানির জমিদারির এলাকাধীন। আবার গোসাবা থানার অন্তর্গত ১৩১ নম্বর লট পাঠানখালী আবাদেরও লটদার ছিল কোম্পানি। এভাবে মধ্যবর্তী সুন্দরবন অর্থাৎ ক্যানিং মহকুমা এমনকি সুন্দরবনের সবচেয়ে বড়ো লটদার হয়ে উঠেছিল 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি'।[৬৫] 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি' ছাড়াও বাসন্তী থানাতে আরও তিনজন

মূল লটদার ছিল। নফরগঞ্জ, জ্যোতিষপুর, জয়গোপালপুর প্রভৃতি অঞ্চলের লটদার ছিলেন কৃষ্ণনগরের নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী। বাসন্তী থেকে হোগল নদীর তীরবর্তী সমস্ত ভূমিভাগের জমিদার ছিলেন মহেশচন্দ্র ল্যান্ড রিক্লামেশন কোম্পানির মালিক মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর অধীন। গোসাবা ব্লকের বিখ্যাত লটদার ছিলেন স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন। তিনি ১৪৯ নম্বর গোসাবা, ১৪৮ নম্বর সাতজেলিয়া এবং ১৪৩ নম্বর রাঙ্গাবেলিয়া লট তিনটি ইজারা নিয়েছিলেন।[৬৬] গোসাবার আরেকজন বিখ্যাত লটদার ছিলেন নদীয়ার মহেশগঞ্জ-এর জমিদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী। তিনি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান গোসাবা থানার অন্তর্গত শম্ভুনগর ১৩২ নম্বর লটের ৪২৫৬৮ বিঘা জমি ইজারা নিয়েছিলেন।[৬৭] লটদারদের পরবর্তী মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবে পরিচিত ছিল চকদার, গাঁতিদার ও ঘেরিদার। চরিত্রগত দিক থেকে এরা সকলেই মধ্যস্বত্বভোগী কিন্তু অঞ্চলভেদে ভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত। হান্টার চকদার ও গাঁতিদারদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি।[৬৮] সাধারণত সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে কাকদ্বীপ, মথুরাপুর, কুলতলী, জয়নগর, সাগর, পাথরপ্রতিমা ও নামখানাতে লটদারদের পরবর্তী এই মধ্যস্বত্বভোগীদের চকদার বলা হত। অন্যদিকে মধ্যবর্তী সুন্দরবনের ক্যানিং, বাসন্তী, সন্দেশখালি, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, হিঙ্গলগঞ্জে যারা লটদারদের থেকে ভূমিস্বত্ব গ্রহণ করেছিল তারা গাঁতিদার নামে পরিচিত ছিল। ওমেলি সাহেব গাঁতি শব্দের অর্থ করেছেন ‘Assigned or allotted’,(and probably such tenures were originally created by the zamindars for the reclamation of waste land).[৬৯] পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির লটদারিতে ক্যানিং থানার কয়েকজন গাঁতিদার বা চকদারের নাম এখানে উল্লেখ করা হল। কোম্পানির অধীনে সর্বাপেক্ষা বড়ো চকদার ছিলেন খিরিশখালি, ঘরামির চকের মফিজদ্দি ঘারামি। অন্যান্য চকদার ছিলেন মোহিনীমোহন রায় (দাঁড়িয়া), মুক্তরাম নস্কর (পাঙ্গাসখালি), বদ্যিনাথ দত্ত (তালদি), কেবলা

মোড়ল (থুমকাটি), সানি এরাদাতুল্লা মল্লিক (হিঞ্চাখালি ও বানিবাদা-বেলেখালি), শ্যাম বারুই (দিঘীরপাড়), ফনীভূষণ রায় (কুমারশা), অক্ষয় মন্ডল (কোডরাখালি), রাধাকান্ত সরদার (বড়িয়া ১০ নম্বর), হরিদাস পান্ডে (বড়িয়ার একটা অংশ), দশেরালি মোল্যা ও কায়েম মোল্যা (হোগলডুগরি), কার্তিকবাবু (কলাহাজরা), ধরণী সরদার (মধুখালী), পরশুরাম কয়াল (গোলাবাড়ি), রাজকুমার সদ্দার ও পশুপতি সরদার (বুধোখালি), মণীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি (গোলাবাড়ি), অম্বিকা চক্রবর্তী (গোলাবাড়ি) ইত্যাদি।[৭০]

পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির অধীন বাসন্তী লটের গাঁতিদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নীলকণ্ঠ জানা, শিবচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পন্ডিত, ধরণী ভট্টাচার্য, নিবারণ বাগ, সতীনাথ চক্রবর্তী, নেপাল রায়, সতীশ দুয়ারী ঠাকুর প্রমুখ।[৭১] গোসাবার উল্লেখযোগ্য লটদার ছিলেন স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন। তিনিই একমাত্র ব্যতিক্রমী লটদার যার জমিদারিতে কোনো প্রকার চকদার, গাঁতিদার ও ঘেরিদার নামক মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব হয়নি। হ্যামিল্টন এস্টেট বাদে বাকি গোসাবা অঞ্চলে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য গাঁতিদারের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা হলেন চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় (শম্ভু নগর), ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, বিজলিন্দ্র ব্রহ্ম (মিত্রপুর), অমৃত লাহা (আমতলী), সত্যনারায়ণ মল্লিক (সত্যনারায়ণপুর, আমলামেথি), ধীরেন দে, ফকিরচাঁদ দে (বালি ১নং), হরিশচন্দ্র রায়মঙ্গল (কচুখালী), মণীন্দ্র প্রধান (বিরাজনগর), তারাপদ ঘোষ (তারানগর, রাধানগর ও শম্ভু নগরের পার্শ্ববর্তী) প্রমুখ।[৭২]

সুন্দরবনের আবাদি অঞ্চলের গ্রামগুলির নামের মধ্যে থেকেও চকদার, গাঁতিদারদের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণত আবাদভূমির জমিদারি পরিচালনার সময় এইসব লটদার, গাঁতিদার, চকদারদের নাম বা তাদের স্ত্রী-পুত্রদের নাম অনুসারে তাদের নায়েব, গোমস্তারা আবাদভূমির নতুন নামকরণ করতেন। এই প্রসঙ্গে অজস্র উদাহরণ সামনে আনা যেতে পারে।

বাসন্তীর লটদার মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর নামে ভরতগড়ের মহেশপুর গ্রাম। বাসন্তী নামটি এসেছে মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর কন্যা বাসন্তীর নাম থেকে। বাসন্তীর আরেকজন বিখ্যাত লটদার নফর পাল চৌধুরীর নাম অনুসারে নফরগঞ্জ গ্রাম। নফর বাবুর তিন ছেলে জ্যোতিষ, সতীশ ও শিরিষ। জ্যোতিষের নাম অনুসারে বাসন্তীর জ্যোতিষপুর গ্রাম। সতীশের স্ত্রী হিরন্ময়ীর নাম অনুসারে হিরন্ময়ীপুর। যেটি লোকমুখে হয়ে গিয়েছে হিরন্ময়পুর। জ্যোতিষের স্ত্রীর রাধারানীর নাম অনুসারে রাধারানীপুর।[৭৩] গোসাবা থানার শম্ভুনগর গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছে কলকাতার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শম্ভুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নামে এবং চণ্ডীচরণ বাবুর নাম অনুসারে চণ্ডীপুর। কচুখালীর গাঁতিদার হরিশচন্দ্র রায়মঙ্গলের নাম অনুসারে হরিশ্চন্দ্রপুর এবং তাঁর পিতা রামচন্দ্র রায়মঙ্গলের নাম অনুসারে রামনগর। গোসাবার মূল লটদার হ্যামিল্টন সাহেবের পরিবারবর্গের এমনকি নায়েব বা ম্যানেজারের নামেও গোসাবার অনেক স্থানের নামকরণ করা হয়েছিল। হ্যামিল্টনের আত্মীয়া মেরি লাক্স এবং মিসেস এমিলির নাম অনুসারে লাক্সবাগান এবং এমিলি বাড়ি। হ্যামিল্টনের নাম অনুসারে সাতজেলিয়া মৌজার নামকরণ করা হয়েছে হ্যামিল্টন আবাদ। সাহেবের মৃত্যুর পর এস্টেটের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন জেমস হ্যামিল্টন ও তার স্ত্রী অ্যানি হ্যামিল্টন তাদের নামে জেমসপুর ও অ্যানপুর নামে দুটি অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছিল। সাতজেলিয়ার সুধাংশুপুর নামকরণ করা হয়েছিল ম্যানেজার সুধাংশু ভূষণ মজুমদারের নাম অনুসারে। গোসাবায় সমবায় আন্দোলনে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার জন্য বঙ্গীয় সমবায় সমিতির তদানীন্তন রেজিস্ট্রার শ্রী যামিনী ভূষণ মিত্রের নাম অনুসারে স্যার ড্যানিয়েল, গোসাবা রাইস মিলের নামকরণ করেছিলেন যামিনী রাইস মিল এবং একটি গ্রামের নাম রেখেছিলেন মিত্র বাড়ি।[৭৪] সুন্দরবনের ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় চকদার, গাঁতিদারদের পরে আরও এক

মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির পরিচয় পাওয়া যায় তারা ছিল হাওলাদার। তবে সুন্দরবনের এই অংশে অর্থাৎ ক্যানিং মহকুমাতে হাওলাদার শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। সতীশচন্দ্র মিত্রের লেখায় দেখা যায় মামুদ শাহী পরগনার বা যশোহরের উত্তরাংশের ভূমি মধ্যস্বত্বভোগীকে বলা হত জোরদার, যশোহরের দক্ষিণ ভাগে ও খুলনার পশ্চিমাংশে এদের বলা হত গাঁতিদার এবং খুলনার পূর্বাংশে অর্থাৎ বাগেরহাট অঞ্চলে এঁরা পরিচিত ছিলেন হাওলাদার নামে।[৭৫]

এভাবে ১৯১৫ সাল অবধি লটদারি প্রথা মারফৎ লট ক্রয়-বিক্রয় এবং তাকে ঘিরে মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব অবাধে চলতেই থাকে। অবশেষে ১৯১৯ সালে স্যার স্টিভেনসন ম্যুর নামক এক উচ্চ পদস্থ আমলা এবং পূর্ত ও সেচ দপ্তরের প্রবল আপত্তিতে লটদারি প্রথা চিরকালের মত পরিত্যক্ত হয়েছিল। এরপর রায়তওয়ারি ভিত্তিতে অধিকাংশ লট বন্দোবস্ত দেওয়া শুরু হয়েছিল।

এভাবে একসময়ের জনবসতিহীন ঘন-জঙ্গল জনপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলি আস্তে আস্তে এক একটি গ্রামের রূপ নিয়েছিল। হান্টার প্রাথমিক পর্বের সুন্দরবনের গ্রামকে গ্রাম অপেক্ষায় উপনিবেশ বলতে বেশি পছন্দ করেছেন।[৭৬] কারণ জঙ্গল পরিষ্কার করে সদ্য গড়ে তোলা বাড়িগুলি ভূমিপৃষ্ঠ থেকে মাত্র দুই এক ফুট উঁচু থাকায় প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিঝড় এবং নদী বাঁধ ভাঙ্গায় তাদের বাড়ি ঘরের পাশাপাশি ক্ষেতের শস্য এমনকি জমানো শস্যও বাঁচাতে পারত না। তাই বাধ্য হয়ে স্থান পরিবর্তন করতেই হত। এভাবে বারবার স্থান পরিবর্তন, গ্রাম গঠনের প্রক্রিয়াকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছিল। নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের গ্রাম গড়ে উঠেছিল।[৭৭] যাইহোক জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘের পাশাপাশি ভয়ানক বিষধর সাপের বাসভূমি উজাড় করে সুন্দরবনের বুকে বসতি গড়ে তোলা সহজসাধ্য কাজ ছিল না। নদী তীরবর্তী অঞ্চল ছাড়া কুমির খুব কমই দেখা যেত, তবে বাঘের বিচরণ ছিল সর্বত্র। তাই

সরকার জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে গতি আনার জন্য বাঘ শিকারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এর জন্য পুরস্কারেরও ব্যবস্থাও করেছিল। ১৮৫২ সালে সুন্দরবন কমিশনারের পরামর্শ মত বাঘ শিকারের জন্য পুরস্কারের অর্থ ধার্য হয়েছিল পাঁচ টাকা। ১৮৫৩ সালে পুরস্কারের অর্থ বেড়ে হয়েছিল ১০ টাকা। ১৮৬০ সালে মাতলার নিকট জঙ্গল পরিষ্কারের সময় বাঘের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় বাঘ শিকারের জন্য ধার্যকৃত অর্থ বেড়ে হয়েছিল কুড়ি টাকা। তবে খুব শীঘ্রই পুরস্কৃত অর্থের পরিমাণ কমিয়ে ৫ টাকা করা হয়েছিল। কিন্তু বাঘ শিকারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে সুন্দরবন কমিশনারের পরামর্শ মত পুরস্কৃত অর্থের পরিমাণ ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮ টাকা করা হয়েছিল।[৭৮] এরপরেও বাঘের আক্রমণ কোথাও কোথাও এমন ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল যে, জমি হাসিলের প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। ফলে হাসিলকৃত জমি পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। এমতাবস্থায় সরকার বাঘ মারার জন্য দেশীয় শিকারীদের দ্বারস্থ হয়েছিল। ১৮৮৩ সালের ১৮ই নভেম্বর ক্যালকাটা গেজেটের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় সরকার একটি প্রাপ্তবয়স্ক বাঘ মারার জন্য ২৫ টাকা এবং একটি বাচ্চা বাঘ মারার জন্য ১০ টাকা নির্ধারণ করেছে, আর এই পুরষ্কৃত অর্থ গ্রহণ করতে শিকারীকে চামড়া অথবা মাথা ফরেস্ট অফিসারকে দেখাতে হবে।[৭৯] ১৯১২-১৩ সালে বনদপ্তরের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯০৯ সালে পুরস্কৃত অর্থের পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল ২০০ টাকা। এভাবে ১৮৮১ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে সুন্দরবনের প্রায় ২৪০০ প্রাপ্ত বয়স্ক বাঘের মৃত্যু হয়েছিল।[৮০] প্রাকৃতিক নিয়ম ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের পরিপন্থী এইরূপ পুনরুদ্ধার নীতি গ্রহণ সত্ত্বেও মিষ্টি জলের অপ্রতুলতা, অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া এবং অর্থকারী ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী জমির অভাব বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল। এসবের পাশাপাশি বারবার ঘূর্ণিঝড় ও জোয়ার-ভাটার প্রকোপ পুনরুদ্ধারের কাজকে ব্যাহত করেছিল। এইসব প্রতিকূলতাকে পিছনে ফেলে

ঘন অরণ্যের বুক পরিষ্কার করে বসতি গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ শুরু হয়েছিল বাঁধ নির্মাণের প্রচেষ্টা। নোনা জলের প্লাবন রোধ করতে মজবুত বাঁধ নির্মাণ করে চাষের জমি ও বসত এলাকাকে নিরাপত্তা দানের মূল দায়িত্ব ছিল সরকারের। তবে ছোটো-ছোটো নদী এবং বড়ো খালের জল আটকাতে বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল ভূস্বামীদের। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বাঁধ থেকে এক মাইল দূরে বসতি স্থাপন করা হবে এবং বাঁধ তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বেলদার নামক ব্যক্তির উপর।[৮১]

এভাবে বাঁধ নির্মাণ এবং জঙ্গল সাফাইয়ের পর ধীরে ধীরে চাষের জমি উদ্ধার ও বসতি স্থাপনের সূচনা হয়েছিল। অনুমান করা যেতে পারে, প্রথম পর্যায়ের বসতিগুলি শুধুমাত্র একটি কুটির নির্মাণের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। কারণ বিপদ সংকুল এই ঘন-অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ এসে বসতি স্থাপন অসম্ভব ছিল। তাই দূরে লোকালয়পূর্ণ স্থান থেকে কাঠুরিয়া এবং বাঁধ নির্মাণকারী একদল লোক গহীন-অরণ্যে প্রথমে কুটির নির্মাণ করে জঙ্গল পরিষ্কার ও বাঁধ নির্মাণের কাজ করত আবার দিনের শেষে ফিরে আসত। এভাবে জঙ্গল সাফাইয়ের অন্তিম সময়ে কুটিরে সংখ্যা বাড়তে থাকে। এরপর ধীরে ধীরে কুটিরগুলি গ্রামের রূপ ধারণ করেছিল। যাইহোক বাঁধ নির্মাণ ও জঙ্গল পরিষ্কারের মত এই কষ্টসাধ্য কাজ করতে যারা এসেছিল তাদের বেশির ভাগই ছিল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আসা নিম্ন-বর্ণের হিন্দু। পরবর্তীতে এদের অনুসরণ করে মুসলমান ও অন্যান্য শ্রেণির আগমন ঘটে। তবে এই কাজে লটদার ও চকদারদের প্রথম পছন্দ ছিল ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগুলিই। জঙ্গল পরিষ্কার, বাঁধ নির্মাণ, রেলপথ নির্মাণ এবং ক্যানিং ও ডায়মন্ড হারবার বন্দর নির্মাণের কাজে নিয়োজিত ছোটনাগপুর মালভূমির পাদদেশ রাঁচি, হাজারীবাগ, বীরভূম, মানভূম, বাঁকুড়া থেকে আগত এইসব শ্রমিকরা ছিল মূলত ঠিকা শ্রমিক বা ভাড়াটে শ্রমিক।[৮২] শারীরিকভাবে সবচেয়ে সক্ষম

এবং বনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগুলিকে নিয়োগের জন্য চব্বিশ পরগনা সুন্দরবনের সর্বাপেক্ষা বড়ো জমিদার পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি এবং গোসাবার বিখ্যাত জমিদার হ্যামিল্টন সাহেব আড়কাঠিয়াদের নিযুক্ত করেছিল। আড়কাঠিয়ারা তাদের কথার প্যাঁচে এবং নিজস্ব জমি ও সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব দানের প্রতিশ্রুতিতে ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত সহজ-সরল প্রকৃতির লোকগুলিকে এইসব অঞ্চলে আনতে সক্ষম হয়েছিল। এঁরাই প্রথম দা-কুঠারের আঘাতে ঘন-অরণ্যের প্রথম গাছটি কেটেছিল, প্রথম বাঁধের মাটি এদের হাত দিয়েই পড়েছিল। এদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে বন্ধ্যা মৃত্তিকা প্রথম ফসলের স্বাদ পেয়েছিল। যাইহোক জল-জঙ্গল ঘেরা সুন্দরবনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই সাফল্য পার্শবর্তী অঞ্চলের বহু মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষ করে মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার নিম্ন-বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়, নিকাশি ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থার কারণে ক্রমাগত বন্যা ও অজন্মার পাশাপাশি জমিদার-জোতদার শ্রেণির অত্যাচার অনাচারের হাত থেকে বাঁচতে সম্ভাবনাময় এই নতুন দেশে ভাগ্যান্বেষণে উপনীত হয়েছিল। এরা জমি উদ্ধারের এই মহাযজ্ঞে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং আবাদ সৃষ্টির পর পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে করতে স্থায়ী বাসিন্দাতে পরিণত হয়েছিল। এইসব আদিবাসী ও পার্শ্ববর্তী জেলার নিম্ন-বর্ণের মানুষগুলির পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী বর্তমানের বাংলাদেশের খুলনা, বরিশাল থেকেও বহু মানুষের আগমন ঘটেছিল। এছাড়া চুরি, ডাকাতি ও বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত বহু অপরাধী গ্রেফতার ও শাস্তি এড়াতে সুন্দরবনের ঘন-অরণ্যকে আশ্রয় হিসাবে বেছে নিয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টির বহু সদস্য, যারা সরকারি দলিলে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী হিসাবে পরিচিত ছিল তারাও হ্যামিল্টন এস্টেটে আশ্রয় পেয়েছিল। হ্যামিল্টন সাহেব নিজ তৎপরতায় আন্দামান জেলের বহু আসামীকে তাঁর এস্টেটে এনে সমবায়ের সাথে যুক্ত করেছিলেন।[৮৩] এজন্য অনেকে

হ্যামিল্টন সাহেবকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অন্য পথে পরিচালিত করে ব্রিটিশ শাসককে সাহায্য করার দোষে দোষী করেছেন। এদের পাশাপাশি সুন্দরবনের জমি বন্দোবস্তের সময় লটদার, চকদার ও নায়েবরা তাদের সঙ্গে রক্ষিতা হিসাবে দুই-একটি করে অবৈধ নারী নিয়ে এসেছিলেন, এইসব অবৈধ নারীর অবৈধ সন্তানরাও সুন্দরবনের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে।[৮৪] এভাবে চব্বিশ পরগনা সুন্দরবনের জয়নগর, ক্যানিং, বাসন্তী, কুলপি, গোসাবা, সাগর, নামখানা, মথুরাপুর, হাওড়া, মিনাখাঁ, হাসনাবাদ, সন্দেশখালি এবং হিঙ্গলগঞ্জের জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন নতুন বসতি, গ্রাম ও চাষের ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল।[৮৫] সমগ্র সুন্দরবনের ন্যায় বর্তমানের ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে এইসব অধিবাসীদের আগমন হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন বসবাসের সূত্রে মহকুমার স্থায়ী বাসিন্দাতে পরিণত হয়েছিল, অর্থাৎ এখানে আগত সমস্ত অধিবাসীই ছিল অভিবাসী এঁরা কেউ এখানকার আদি বাসিন্দা নয়। তবে বসতি স্থাপনের প্রথম লগ্ন থেকে এদের বাস। জঙ্গল সাফাই করে বসতি এবং চাষের ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী পরিবারের প্রথম ব্যক্তি নিজেদেরকে আবাদকারী বা পুনরুদ্ধারকারী রায়ত বলে পরিচয় দিতেন এবং আবাদকৃত জমির উপর নিজের অধিকার দাবি করতেন।[৮৬]

নবগঠিত গ্রামগুলিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অভিবাসনের স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কারণ মহকুমার অধিকাংশ গ্রাম স্বদেশীয় স্বজাত বা সমজাতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। জনবসতির এই বৈশিষ্ট্য জেলার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অনেকটাই আলাদা। এই ধরনের সমজাতীয় গ্রাম সম্প্রদায় গঠনের মূল কারণ ছিল দূর দেশে পদে পদে যেখানে মৃত্যুর হাতছানি সেখানে জঙ্গল হাসিলের মত শ্রমসাধ্য ও ঝুঁকিবহুল কাজে পরিচিত স্বজনদের পারস্পারিক সহযোগিতামূলক সহাবস্থান কিছুটা হলেও নিরাপত্তা ও সাহসের যোগান

দিত। **১৮৯১** থেকে **১৯২১** সাল অবধি চব্বিশ পরগনায় আগত অভিবাসীদের একটি পরিসংখ্যান থেকে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে।[৮৭]

জেলা	১৮৯১			১৯০১			১৯১১			১৯২১		
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
যশোহর	১২৫২৫	৯৪০৫	৩১২০	৫৪০৪	৩৬১৩	১৭৮১	৪০৬৮	১৯৫৭	২১১১	৫৭৬৪	৩৭১২	২০৫২
খুলনা	১০১৪২	৫৫৪২	৪৬০০	৭৫৬১	৪৩৪৫	৩২১৬	৬৯৩১	২৩২৯	৪৬০২	১৩৯৩৩	৬৭২৮	৭২০৫
নদীয়া	৯৯১৩	৫৪৯২	৪৪২১	৭৫০৩	৪২৯৭	৩২০৬	৫৪৩০	১৭৯৬	২১৩১	৮০১৩	৪৮৫২	৩১৬১
মেদিনীপুর				২৫১৯৬	১৬৪০০	৮৭৯৬	৪৪০৩৯	২৭৮৩৫	১৬২০৪	৬২৫০৪	৩৯৭০৯	২২৭৯৫
হাওড়া	৬০৭৬	৫৮৩৮	২৪০	৩২৬৩	২০৭৪	১১৮৯	৯৭৪৮	৪৪০০	৫৩৪৮	১২৬৮৪	৭৬৭৬	৫০০৮
হুগলি	১৬৭৫৩	৯১৫৭	৭৫৮৬	১৭৩৬৩	৯৪০৫	৭৯৫৮	১০৬৮৭	১০৫৬০	৯১২৭	১১২৯০	৬৩৪০	৪৯৫০
মোট	৫৫৪০১	৩৫৪৩৪	১৯৯৬৭	৬৬২৯০	৪০১৩৪	২৬১৫৬	৮৯০০৩	৪৮৮৭৭	৪০১২৬	১১৪১৮৮	৯৬০১৭	৪৫১৭১

সারণি: ১.১- **১৮৯১-১৯২১** সাল অবধি আদমশুমারি (সেন্সাস) থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী অভিবাসীদের পরিসংখ্যান।

তবে উপরোক্ত পরিসংখ্যানটি শুধুমাত্র সুন্দরবন বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় আগত অভিবাসীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করলে বিষয়টি সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা তৈরী হত। কারণ তৎকালীন সময়ে চব্বিশ পরগনা জেলা বলতে বৃহত্তম ভূমিভাগকে বোঝাত। তাছাড়া এই অভিবাসীদের সবাই যে শুধুমাত্র জঙ্গল সাফাই করে জমি উদ্ধারের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল তা নয়, তাদের একটা অংশ জীবিকা অর্জনের জন্য শহরতলীতে অন্যান্য পেশার সাথে নিযুক্ত হয়েছিল। তবে অবশ্যই তাদের একটা বড়ো অংশ যে জঙ্গল সাফাই করে জমি দখলের কাজে এসেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এছাড়া **১৮৭০** সালে প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের প্রকাশিত বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনগুলি থেকে জানা যায় যে, সুন্দরবনে মাছ বা কাঠ সংগ্রহ করতে এবং চাষের জমিতে ধান রোপণ বা কাটার কাজে বহু মানুষের আগমন ঘটত। যাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক কাজ শেষে এখানেই থেকে যেত অর্থাৎ নিজ জেলায় আর ফেরত যেত না।[৮৮]

এভাবে সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গল হাসিল প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে জমি দখলের লোভে বহু মানুষের আগমন ঘটেছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে ডায়মন্ড হারবার, আলিপুর সদর এবং বসিরহাট মহকুমার দক্ষিণ অংশের জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া প্রায় সমাপ্তির পথে এগিয়ে গিয়েছিল এবং বাকি কিছু অংশ ও পশ্চিম সুন্দরবনের বসতি স্থাপনের কাজে গতির সঞ্চার হয়েছিল। বিংশ শতকের শুরু থেকে মানুষের আগমনের পরিমাণও বেড়েছিল। এছাড়া পরিসংখ্যানটি থেকে আরও একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয় তা'হল চারটি জনগণনা বর্ষে পুরুষ অভিবাসীদের তুলনায় মহিলা অভিবাসী অর্ধেকরও কম। কারণস্বরূপ নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্নটি সামনে আনা যেতে পারে। সুন্দরবনের অচেনা-অজানা পরিবেশে জমি এবং কাজের সন্ধানে পুরুষ অভিবাসীরা তাদের স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন না। নানারকম প্রতিকূলতাকে বশ মানিয়ে, সুন্দরবনের জমি বন্দোবস্ত নিয়ে তাকে চাষযোগ্য ভূমিতে পরিণত করে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিত হয়ে তারপর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে আসতেন। এভাবে সমগ্র সুন্দরবন ধীরে ধীরে মানুষের কোলাহলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। প্রথম পর্যায়ে আনয়নকৃত আদিবাসী সম্প্রদায় ও পরবর্তীতে আগমনকারী অভিবাসীদের মধ্যে মেদিনীপুরবাসীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। সুন্দরবনের সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ ও পাথরপ্রতিমা থানা এলাকায় এদের সংখ্যা ছিল বেশি। তবে গোসাবা ও বাসন্তী এলাকাতে মেদিনীপুরবাসীদের সংখ্যা খুব একটা কম ছিল না।

যাইহোক সমগ্র মহকুমার জনজাতির জাতিবিন্যাস করলে দেখা যায় আনয়ন ও আগমন যেভাবেই হোক না কেনো এখানে বসবাসকারী জনজাতির বেশিরভাগটাই ছিল নিম্নবর্গীয় হিন্দু, ধর্মান্তরিত মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়। নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য ছিল পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, জেলে কৈবর্ত, চাষি কৈবর্ত, কাওরা, বাগদী, দলুই, রাজবংশী, কুমার, কামার, ধোবা বা রজক, তিলি পাটনি, সদগোপ, যাদব বা গোয়ালা, তাঁতি, মুচি বা

চামার, হাড়ি, নাপিত, ডোম, যুগী, শুঁড়ি, পতিতব্রাহ্মণ, কায়স্থরাই ছিল সমগ্র সুন্দরবনের ন্যায় বর্তমান মহকুমার আয়ত্তাধীন অঞ্চলগুলির নববসতির প্রথম বাসিন্দা।[৮৯] গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমাংশ মেদিনীপুর থেকে এসেছিল মাহিষ্য বা চাষি কৈবর্ত, জেলে কৈবর্ত, করণ, তন্তুবায়, খন্ডায়িত, পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয় এবং সামান্য সংখ্যক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি।[৯০] পূর্বেই উল্লেখ করেছি মেদিনীপুর থেকে আগত এইসব জনজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বসতি ছিল পশ্চিম সুন্দরবন অঞ্চলের সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ ও পাথরপ্রতিমা থানা অঞ্চলে। তবে ক্যানিং মহকুমার গোসাবা ও বাসন্তী অঞ্চলে সংখ্যায় কম হলেও এদের বসতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া স্বাধীনতার আগে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা এবং ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার কারণ হেতু দেশভাগের সময় প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) যশোহর, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি জেলা থেকে আগমন হয়েছিল রাজবংশী, যুগী, নমঃশূদ্র, পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, কাপালি, জেলে প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় হিন্দু জনগোষ্ঠীর লোক।[৯১] এদের আগমনে গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, কুলতলী, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, সন্দেশখালি, মিনাখাঁ, হাড়োয়া, পাথরপ্রতিমা, নামখানা ও কাকদ্বীপ থানার বিভিন্ন অঞ্চল জনবহুল ও কোলাহল মুখর হয়ে উঠেছিল। তবে তুলনামূলকভাবে পশ্চিম সুন্দরবনের নামখানা, পাথরপ্রতিমা ও কাকদ্বীপ অঞ্চল অপেক্ষা ক্যানিং নদীর পূর্বপাড় গোসাবা ও বাসন্তী এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ও হাসনাবাদ অঞ্চলে এদের সংখ্যা বেশি ছিল। উড়িষ্যার কটক থেকে এসেছিল উড়িয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষগুলি। ইংরেজদের আগমনের পূর্বে স্থানীয় জমিদার কর্তৃক সাধারণত মালঙ্গী হিসাবে অর্থাৎ লবণ তৈরীর এবং লবণ তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ কাটার কাজে এদেরকে আনা হয়েছিল।[৯২] পরবর্তীতে উনিশ শতকের মধ্যভাগে দেশীয় লবণ তৈরী ও লবণের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে মালঙ্গিরা কৃষিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল এবং চব্বিশ পরগনা সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে চাষি হিসাবে বসতি স্থাপন করেছিল।[৯৩] ১৮৭২ সালের জনগণনা

রিপোর্ট থেকে দেখা যায় সমগ্র চব্বিশ পরগনা জুড়ে ২৬৭৫৯ জন উড়িয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বাস ছিল।[৯৪] সাগরদ্বীপে তাদের একটি উপনিবেশ লক্ষ্য করা যায়। তবে বর্তমানে মহকুমার উড়িয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষগুলির বেশিরভাগটাই মিষ্টি প্রস্তুতকারী পেশায় নিযুক্ত হয়েছে। মহকুমার ছোটো-বড়ো প্রতিটি বাজারে একটা না একটা উড়িয়া বা উড়ে সম্প্রদায়ের মিষ্টির দোকান লক্ষ্য করা যায়।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটা অনুমান করা অস্বাভাবিক হবে না যে, সুন্দরবন তথা আলোচিত মহকুমায় যেসব মানুষের আগমন বা আনয়ন হয়েছিল তাদের বেশিরভাগটাই ছিল তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষ, জনগণনার রিপোর্টগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও এই সত্য প্রতিফলিত হয়। তাদের ধর্মীয় বিভাজন করলে দেখা যায় বেশিরভাগটাই ছিল হিন্দু অর্থাৎ নিম্নবর্গীয় হিন্দু এবং মুসলিম পাশাপাশি ছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ও কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ, খ্রিস্টান। খ্রিস্টান বলতে অবশ্যই বেশিরভাগটাই ছিল দেশীয় খ্রিস্টান।[৯৫] কারণ সমসাময়িক সময়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু মানুষ অর্থের লোভে, সামাজিক প্রতিপত্তির লোভে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। খ্রিস্টান ধর্মের পাশাপাশি বহু মুন্ডা এবং ওরাওঁ সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসী হিন্দু ধর্মও গ্রহণ করেছিল। ১৯১১ সালে এল. এস. এস. ওমেলি-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় ওই বছর ৬৫১৭ জন ওরাওঁ ও ৭২৯৬ জন মুন্ডা সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসী নিজেদের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়েছিল।[৯৬] সর্বপ্রথম জনগণনা বা আদমশুমারি যখন হয় ততদিনে সমগ্র সুন্দরবনে কম-বেশি মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল। আমার আলোচিত ক্যানিং মহকুমার অঞ্চলগুলিও তখন ধীরে ধীরে মানুষের আগমনে ভরে উঠতে শুরু করেছে, যেগুলির বিশদ বর্ণনা পূর্বেই করেছি। তবে জনগণনার পরিসংখ্যান থেকে এখানে আগত মানুষগুলির জাতিগতবিন্যাস করতে গেলে দেখা যায় ১৮৭২ সালে যখন প্রথম জনগণনা হয় তখন অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার নিম্নাংশ, সুন্দরবনের নতুন বসতিপূর্ণ এলাকাগুলিতে নিম্নবর্গীয়

হিন্দুদের প্রাধান্য বেশি ছিল। ১৮৭২ সালে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার মোট জনসংখ্যা ছিল ২২১০০৪৭ জন তার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসী ছিল ১৩০৭০৮৭ জন। জনসংখ্যার নিরিখে এদের মধ্যে কৈবর্ত জাতিভুক্ত অধিবাসীদেরই প্রাধান্য ছিল। দ্বিতীয় স্থানে ছিল পৌন্ড্রক্ষত্রিয় বা পোদ এবং অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাগদী, কাওরা, তিওর, মুচি, চন্ডাল বা নমঃশূদ্র। বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে প্রধান ছিল ব্রাহ্মণ ১২০১০২ জন এবং কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল ৮২৮০৩ জন।[৯৭] ১৮৮১ সালে যখন ক্যানিং আলাদা মহকুমা হয়নি তখন এর অধীনস্থ অঞ্চলগুলি আলিপুর সদর বা বসিরহাট মহকুমার অধীন ছিল। সেখানেও নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্তদেরই প্রাধান্য ছিল। এরপর ১৯৫১ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী চব্বিশ পরগনার বহু অংশ পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমানের বাংলাদেশে চলে যাওয়ার পরেও জনগণনার রিপোর্ট থেকে নিম্নবর্গীয়দেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। উপরোক্ত তথ্যের যথাযথ বিচার সম্ভব হবে নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান চিত্রের মাধ্যমে।[৯৮]

জেলার মোট সংখ্যা						মহকুমা ভিত্তিক জনবিন্যাস-১৮৮১		থানা ভিত্তিক জনবিন্যাস-১৯৫১	
জাতি	১৮৭২	১৮৮১	১৯০১	১৯১১	১৯৫১	আলিপুর	বসিরহাট	ক্যানিং গ্রাম ও শহর	সন্দেশখালি
পোদ	১৪৯০৭৫	২১৭১৮৭	২৯৪৭৬০	৩৩৩৭৪৭	৪৯৫৪৩১	১১০৬৩৬	২৭২৮০	৩৩৯৫৬	৫৪৮৮৯
কৈবর্ত	১৮২৪৮৬	৯৪৫৪৮৬	২০৭০০০	২৪৪৫১৫	. .	৪৬৮৫৩	৯০২৬	১০৫(জেলে কৈবর্ত)	১১৫(জেলে কৈবর্ত)
বাগদি	৯৩৮৩২	৭৮৬৫৪	৯৯১৯৮	৯৯৪২৫	১০৯৭২০	৩৭৫৩৪	৮৭৮৫	৮৮৭৭	৪৮৪৭
কাওরা	৫৫৭৬৪	৪৮০০০	৬২৭৪১	৬৪৪৮৩	৭২২৩৩	১৭৫৮৫	৫১৩৩	৫৮২	১৩৩
তিয়র	৪৯৭০৯	৩১১৭১	৫৪৪০২	৬৪০৫৮	১১৮৯৫	১৬৬৫৮	৩৬৯০	৯৯৯	৩৫০
মুচি	৭০৪০৩	২৪৭৮০	৩৮৬২৫	৪০৫১৭	৩৯৭৪৯	৩৯৭৭	৫১৫৯	৫৫৬	১৭৭
নমঃশূদ্র	৪৬০৫৬	২১২৭৭	২৪৭১৫	২৬৮৭৪	১০২৯৯৭	৯০২৮	৪৮৫৫	৫৬৫৯	৫৮০৯

সারণি: ১.২- ১৮৭২, ১৮৮১, ১৯০১, ১৯১১ ও ১৯৫১ সালের আদমশুমারি তথ্যানুযায়ী চব্বিশ পরগনা জেলা এবং ১৮৮১ ও ১৯৫১ সালের আদমশুমারি তথ্য থেকে মহকুমা ও থানা ভিত্তিক তথাকথিত নিম্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু হিন্দু জনজাতির জনবিন্যাসগত পরিসংখ্যান।

জনসংখ্যার নিরিখে ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুদের পরেই ছিল মুসলিমদের স্থান। বর্তমানে যেসব অঞ্চল নিয়ে ক্যানিং মহকুমার প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছে সেখানে বসবাসকারী মুসলিমরা সাধারণত ধর্মান্তরিত নিম্নবর্গীয় হিন্দু। রিচার্ড. এম. ইটন (Richard M. Eaton) সহ ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও জাতিতত্ত্ববাদী (ethnographer) এবং দক্ষিণ এশিয়ার বহু ঐতিহাসিক, সাংবাদিক বিশেষ করে পাকিস্তানি ও বাংলাদেশী ঐতিহাসিকরা নিঃসংশয়ে স্বীকার করেছেন যে, দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ বর্ণীয় হিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণ শ্রেণির অত্যাচারে অত্যাচারিত নিম্ন বর্ণীয় হিন্দু সম্প্রদায়, সুফি শেখদের দ্বারা প্রচারিত সামাজিক অসাম্যের হাত থেকে মুক্তির বার্তাকে সাদরে গ্রহণ করে ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল।[৯৯] সুন্দরবন অথবা ক্যানিং মহকুমাতে ইসলামের আগমন বা রূপান্তর বিষয়ে আলোচনা আমার মূল আলোচ্য বিষয় নয়। তবে এখানে বসবাসকারী মুসলিম অধিবাসীরা যে বেশিরভাগক্ষেত্রে সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত শেখ, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এইচ. এইচ. রিসলে (H. H. Risley)-এর লিখিত 'Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন যে আনুমানিক নব্বই লক্ষ নিম্নবর্গীয় হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।[১০০] এছাড়া উপজাতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু সংখ্যক মানুষ খ্রিস্টান ধর্মের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করেছিল, তবে এক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মে রূপান্তরিত হওয়াকেই তারা বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল। হান্টার তাঁর 'A Statistical Account of Bengal' গ্রন্থে সুন্দরবনের মুসলিম সম্প্রদায়কে মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। শেখ- মূলত চাষি এবং কাঠুরিয়া, এদের মধ্যে কিছু কিছু জন সম্পদশালী তবে বেশিরভাগটাই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির। সৈয়দ- মূলত চাষি পেশাজীবী যারা সংখ্যায় কম এবং ধনী ও গরীব উভয় মর্যাদার অধিকারী। পাঠান- যারা সংখ্যায় কম এবং চাষের কাজের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া মির শিকারি, সাপুড়িয়া এবং বেদে সম্প্রদায়কে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১০১] ১৮৭২ সালের জনগণনা রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করলে উপরোক্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই সম্ভব করা হবে

বলে মনে হয়। ১৮৭২ সালে আলিপুর সদর মহকুমার জনসংখ্যার নিরিখে হিন্দু ছিল ৭৫% অন্যদিকে বারাসাত, বসিরহাট এবং সাতক্ষীরাতে মুসলমান ও হিন্দুর সংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান।[১০২] ১৮৭২ সালে চব্বিশ পরগনায় বসবাসকারী মুসলিমদের মধ্যে শেখ সম্প্রদায়রাই ছিল প্রধান প্রায় ৬২১০৪ জন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিল যথাক্রমে পাঠান (৫৫৫১) ও সৈয়দ (৪০৭৩) সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিমরা। এবার নিম্নে উল্লেখিত পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বর্তমান সময়ের ক্যানিং মহকুমাধীন থানাগুলির তৎকালীন মুসলিম জনগণের পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে দেখানোর চেষ্টা করেছি।[১০৩]

১৮৭২				১৯১১			
জেলা	মহকুমা	থানা	মোট জনসংখ্যা (মুসলিম)	জেলা	মহকুমা	থানা	মোট জনসংখ্যা (মুসলিম)
চব্বিশ পরগনা (কলকাতা বাদে)	--	--	৮৮৭৮৫৩	চব্বিশ পরগনা (কলকাতা বাদে	--	--	৮৯৭৫২৭
--	বারুইপুর	--	৬৩৩৭৬	--	আলিপুর সদর	--	২৪০৯৭৯
--	--	মাতলা	১২২৯৭	--	--	মাতলা	৩৩৯২৮
--	বসিরহাট		১৩০৯৮২	--	বসিরহাট	--	২০৩১০২
--	--	হাসনাবাদ	১১৩৪৭	--	--	হাসনাবাদ	২৯৬৬৯

সারণি: ১.৩- ১৯৭২ ও ১৯১১ সালের আদমশুমারির তথ্য থেকে মহকুমা ও থানা ভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যার পরিসংখ্যান

১৮৭২ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুসারে ধর্মের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি থানার জনসংখ্যার তালিকা থেকে দেখা যায় বারুইপুর মহকুমাতে হিন্দুদের (১৩২১০২) তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা ছিল অর্ধেক। অন্যদিকে বসিরহাট মহকুমাতে মুসলিম ও হিন্দুদের সংখ্যা (১৩৬৯৯৩) ছিল প্রায় সমান সমান।[১০৪] ১৯০১ সালের চব্বিশ পরগনার জনগণনার রিপোর্ট থেকে এটা পরিষ্কার যে,

উচ্চ মর্যাদার অধিকারী পাঠান ও সৈয়দ সম্প্রদায়ের মুসলিমরা সংখ্যার বিচারে অতিঅল্প। যেখানে শেখ সম্প্রদায়ের মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৫৭৪০০০ জন সেখানে সৈয়দ ও পাঠান সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮০০০ জন ও ১৪০০০ জন। ১৯০১ সালে জনগণনার রিপোর্ট থেকে আরও একটি মুসলিম সম্প্রদায়ের পরিচয় বা পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তারা ছিল আজলফ সম্প্রদায়ভুক্ত এদেশীয় মুসলিম। ১৯০১ সালে চব্বিশ পরগনার মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে এদের স্থান ছিল দ্বিতীয় এবং এদের সংখ্যা ছিল ১২২০০০ জন।[১০৫] ১৮৭২ সালের জনগণনা রিপোর্ট থেকে এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না বা এদের বিভাজন লক্ষ্য করা যায়নি। ১৯০১ সালের পর ১৯১১ সালের জনগণনার প্রতিবেদনে আজলফদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল, অন্যদিকে শেখদের সংখ্যা এক লক্ষের অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১০৬] কারণ হিসাবে মনে করা যেতে পারে ১৯১১ সালের জনগণনার সময় আজলফ সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিমরা উচ্চ সামাজিক মর্যাদা লাভের আশায় শেখ পরিচয় গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে পেশাগতভাবে তাঁতি হিসাবে পরিচিত জোলাদের সংখ্যা ১৮৭২ সালের জনগণনা বর্ষে সমগ্র চব্বিশ পরগনা মিলিয়ে সর্বসাকুল্লে ছিল মাত্র ৪২৮ জন। কিন্তু ১৯০১ সালে তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮০০০ এবং ১৯১১ সালে হয়েছিল ৩২৯৯৬ জন। পরবর্তীতে জোলারা তাদের বংশগত পেশা পরিত্যাগ করে কৃষক, কসাই বা ছোটো-ছোটো দোকানদারের বৃত্তি গ্রহণ করেছিল।[১০৭] সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিলের সময় মহকুমায় স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে নিম্নবর্গীয় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে আরও এক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটেছিল, প্রকৃত অর্থে তাদের আনয়ন করা হয়েছিল তারা হল সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুন্ডা এবং ভূমিজ সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসী শ্রেণি। তবে জঙ্গল হাসিলের প্রথমলগ্নে তাদের আনয়ন করা হলেও পরবর্তী সময়ে নিকট আত্মীয়ের যোগসূত্রে বহু আদিবাসী মানুষের আগমন ঘটেছিল। আদিম জীবনচর্চা ও আচার-বিশ্বাসের কারণে মহকুমার অন্যান্য জনজাতির কাছে ‘বুনো’ নামে

পরিচিত এই সমস্ত আদিবাসী মানুষগুলির আগমন স্থান ও আগমনের সময়কাল সম্পর্কে পূর্বে বিশদে বর্ণনা করেছি। এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি প্রায় তিন থেকে চার পিঁড়ি বা পুরুষ অর্থাৎ ৭৫ থেকে ১০০ বছর পূর্বে আগত মানুষগুলির জাতিগত বিন্যাস এককথায় তৎকালীন জনগণনার প্রতিবেদন অনুসারে মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে তাদের বসতি গড়ে উঠেছিল এবং তাদের উপস্থিতির হার পর্যবেক্ষণ। নিম্নলিখিত জনগণনার রিপোর্টের মাধ্যমে তুলে ধরেছি চব্বিশ পরগনায় আগত আদিবাসী জনজাতিগুলির সংখ্যা এবং ১৯০১ ও ১৯৫১ সালের জনগণনার মাধ্যমে থানা ভিত্তিক জনবিন্যাস।[১০৮]

জেলার মোট সংখ্যা						থানা ভিত্তিক জনবিন্যাস-১৯০১		থানা ভিত্তিক জনবিন্যাস-১৯৫১	
জাতি	১৮৭২	১৮৮১	১৯০১	১৯১১	১৯৫১	মাতলা (ক্যানিং)	বসিরহাট	ক্যানিং (গ্রাম ও শহর)	সন্দেশখালি
ভূমিজ	৬৬০	৫৫৫১	৯৫৬৮	১২২২৫	১৪৯৯৫	২৪০৪	১২৫	৩৪২৮	৭৮৭৩
মুন্ডা			৯২২৯	১৩১৬৫	১৭৬২৭	১৭৩৭	১২০	১৭৭৪	১০৬২৩
ওরাওঁ	৩৩৬২		৫৯৩১	১২০৫৫	২০৪২৮	১১২৪		১৩৬৬	৫৭৫২
সাঁওতাল	৮১৪	৩১	২২৩৩	৬৮৫	২৩০০২	১০৮		১৬০৬	৩১৬৪

সারণি: ১.৪- ১৮৭২, ১৮৮১, ১৯০১, ১৯১১ ও ১৯৫১ সালের আদমশুমারি তথ্যানুযায়ী চব্বিশ পরগনা জেলার এবং ১৯০১ ও ১৯১১ সালের আদমশুমারি তথ্য থেকে থানা ভিত্তিক আদিবাসী জনজাতির জনবিন্যাসগত পরিসংখ্যান।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, ১৯০১ সালের আগে অবধি মাতলা তথা ক্যানিং থানা অঞ্চলে আদিবাসী জনজাতির বাসবাস ছিল বেশি। কারণস্বরূপ হয়তো যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা অথবা প্রথম নগরায়নের কারণহেতু তাদের আনয়নের পরিমাণ বেশি ছিল। তবে ১৯৫১ সালের জনগণনা বর্ষে দেখা যায় ক্যানিং অপেক্ষা সন্দেশখালি থানা অঞ্চলে তাদের সংখ্যা বেড়েছিল। বর্তমান সময়ের বিচারেও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সন্দেশখালি ব্লকে

তাদের সংখ্যা বেশি আছে। পরবর্তীতে যখন সন্দেশখালি থানা থেকে আলাদা হয়ে গোসাবা ব্লক প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে বিবেচিত হয় গোসাবা ব্লক। কারণ বিবেচনা করলে অবশ্য উঠে আসবে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের নাম, কেননা তিনি যখন বর্তমান গোসাবা ব্লকের আয়ত্তাধীন অঞ্চলগুলির জমিদারি স্বত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন জঙ্গল হাসিলের কাজে তাঁর প্রথম পছন্দের লোক ছিল তপশিলি উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত এই মানুষগুলি। যেগুলির বিশদ বিবরণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যাইহোক মহকুমার বসতি স্থাপনের সূচনা লগ্ন থেকে যেসব আদিবাসী মানুষের আনয়ন বা আগমন হয়েছিল তারা আজ মহকুমার স্থায়ী বাসিন্দা। সময়ের গতিপথে ভুলে গেছে তাদের আদি বাসস্থান এমনকি আদি বাসভূমির নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান।

এভাবে আমার গবেষণাক্ষেত্র ক্যানিং অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মানুষের বসতি স্থাপিত হয়েছিল এবং স্বাধীনতার আগেই ধীরে ধীরে তাদের আত্মপরিচয় (identity) গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন বাদ-প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মাধ্যমে সেই আত্মপরিচয় গঠনের প্রয়াসকে লক্ষ্য করা যায়, যেটি পরবর্তী অধ্যায়গুলির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

তথ্যসূত্র:

১। W. K. Firminger, Affairs of the East India Company (Being the Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons 28th July, 1912) Vol-II, (Edited), Delhi, Reprinted, 2001), 636.

২। L. S. S. O'Malley, Bengal Disrtict Gazetteers, 24-Parganans (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot., 1914), 44.

৩। W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, vol-1, District of the 24 Parganas and Sundarbans (London: Trubner & co., 1875), 18-20.

৪। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 18.

৫। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 119.

৬। Frederick Eden Pargiter, Revenue History of the Sundarbans from 1765 to 1870 (Alipore: Bengal Government Press, 1934), 11.

৭। Aviroop Sengupta, Tidal Histories Envisioning the Sundarbans, 1860s-1920s, in Kaustubh Mani Sengupta and Tista Das Edited 'Rethinking the Local in Indian History Prespectives from Southern Bengal' (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2022), 54.

৮। সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, প্রথম খন্ড (কলিকাতা: চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জী এন্ড কোং, ১৯১৪), ৬৯।

৯। মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, প্রথম খন্ড, ৭০।

১০। পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং (কলকাতা: লোকসখা প্রকাশন, ২০১৭), ৯২।

১১। Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol. II, Muslim Period, 1200-1757 (Dacca: University of Dacca, 1948), 151.

১২। কমল চৌধুরী, চব্বিশ পরগানা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯), ৫০।

১৩। দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খন্ড (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৩৫), ৭৯০।

১৪। সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত, (কলিকাতা: দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯২২), ২০৩–২০৪।

১৫। মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, ২০৪।

১৬। বিনয় ঘোষ, বাদশাহী আমল, (কলিকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, প্রথম সংস্করণ ৭ই চৈত্র ১৮৭৯শকাব্দ), ২৪৬-৪৮।

১৭। মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, ১৮৫।

১৮। James Rennell: A Map of the Sunderbund and Baliagot Passsages, with their principal communication Harrison, William; (1780) Website https://bildsuche. digitale-sammlungen.de.

১৯। Major Ralph Smyth, "The Soonderbuns Their Commercial Importance-Statistical and Geographical Report on the 24 Pergunnahs Districts," The Calcutta Review, Vol- 31(December 1858): 393.

২০। সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খন্ড, ১১২৩-১১৩২।

২১। The Calcutta Review, Vol- 31, 393.

২২। F. E. Pargiter, "Cameos of Indian Districts- The Sundarbans," The Calcutta Review, Vol-89, Iss-178 (December 1889): 291.

২৩। J. J. A. Campos, History of the Portuguese in Bengal (Calcutta: Butter Worth & Co. (India) LTD, 1919), 47.

২৪। গোকুল চন্দ্র দাস, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত (কলিকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১), ১১১-১১২।

২৫। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আঞ্চলিক ইতিহাস দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নেওয়া হয়েছে গোকুল চন্দ্র দাস সম্পাদিত 'চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (কলিকাতা: প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪), ১৮।

২৬। Campos, History of the Portuguese in Bengal, 169; চৌধুরী, চব্বিশ পরগানা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন, ৫২।

২৭। Sengupta, Tidal Histories Envisioning the Sundarbans, 55.

২৮। মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, প্রথম খন্ড, ৫৭।

২৯। -------"The Gangetic Delta," The Calcutta Review, Vol-32, Iss-63 (March 1859): 5-6; মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, প্রথম খন্ড, ৫২।

৩০। Frank David Ascoli, A Revenue History of the Sundarbans from 1870 to 1920 (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot., 1921), 3.

৩১। Calcutta Review, Vol-89, Iss-178, 281-282.

৩২। Sengupta, Tidal Histories Envisioning the Sundarbans, 51; Pargiter, Revenue History of the Sundarbans, 5; Hunter, A Statistical Account of Bengal, 331.

৩৩। Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans, 1.

৩৪। Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans, 16.

৩৫। O'Malley, Bengal Disrtict Gazetteers, 24-Parganans, 46-47; চৌধুরী, চব্বিশ পরগনা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন, ৫৬-৫৭।

৩৬। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 317.

৩৭। Annual Progress Report of Forest Administration(India office Library, London, hereafter cited as PRF) for 1867-68, Calcutta 1869; Taken from Ranjan Chakrabarti, "Local People and The Global Tiger, An Environmental History of the Sundarbans" Global Environment 3(2009),72-95,

http;//W.W.W.environmentandsociety.org/node/4614.

৩৮। The Calcutta Review, Vol-89, Iss-178, 285-286.

৩৯। Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans, 22; West Bengal State Archive, Proceeding of Revenue Department, 17th April, 1832, Proceeding No-7;

Anil Chandra Lahiri, Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of the 24 Parganas, 1924-33 (Alipore: Bengal Government press, 1936), 111.

৪০। A. K. Mandal & R. K. Ghosh, Sundarban: A Socio Bio-ecological Study (Cornell University: Bookland, 1989, Digitized, January, 2009), 106.

৪১। The Calcutta Review, Vol-89, Iss-178, 290; Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans, 35.

৪২। The Calcutta Review, Vol- 31, 1858, 401.

৪৩। চৌধুরী, চব্বিশ পরগনা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন, ৫৮।

৪৪। Mandal & Ghosh, Sundarban: A Socio Bio-ecological Study, 106.

৪৫। Lahiri, Final Report on the Survey and Settlement Operation, 117.

৪৬। Lahiri, Final Report on the Survey and Settlement Operation, 117.

৪৭। Lahiri, Final Report on the Survey and Settlement Operation, 117.

৪৮। West Bengal State Archive, Proceeding of Revenue Department, August 1871, proceeding No. 10, Para-3.

৪৯। West Bengal State Archive, Proceeding of Board of Revenue, Lower Provinces, 7th March 1856, Proceeding No-77, Letter from Sundarbans Commissioner to Presidency Commissioner.

৫০। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 92-93.

৫১। West Bengal State Archive, Proceeding of Revenue Department, August 1871, Proceeding No. 10&11, Para-10.

৫২। West Bengal State Archive, Proceeding of Revenue Department, June 1871, Proceeding No. 36.

৫৩। Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans, 108-109; O'Malley, Bengal District Gazetteer, 24 Parganas, 238.

৫৪। West Bengal State Archive, Proceeding of Revenue Department, June 1871, Proceeding No. 68.

৫৫। West Bengal State Archive, Proceeding of Revenue Department, June 1871, Proceeding No. 36; West Bengal State Archive, Proceeding of Revenue Department, Land Revenue Branch, 24th November 1859, Proceeding No. 44ct, Letter from Presidency Commissioner to Sundarban Commissioner.

৫৬। West Bengal State Archive, Proceeding of General Miscellaneous, 1st April 1866, Proceeding No. 41.

৫৭। West Bengal State Archive, Proceeding of Revenue Department, June 1871, Proceeding No. 36.

৫৮। West Bengal State Archive, Proceeding of Revenue Department, December 1870, Proceeding No.21, Para-5.

৫৯। Ascoli, A Revenue History of the Sundarbans, 73.

৬০। Ascoli, A Revenue History of the Sundarbans, 73-74.

৬১। Alapan Bandyopadhyay, Anup Matilal (ed), The Philosopher,s Stone Speeches and writing of Sir Daniel Hamilton (Gosaba: Sir Daniel Hamilton Estate, 24 Parganas (S), 2003), 302.

৬২। Ascoli, A Revenue History of the Sundarbans, 124.

৬৩। কালীপদ ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, নেওয়া হয়েছে সন্তোষ বর্মন সম্পাদিত 'স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও গোসাবা-প্রবন্ধ সংকলন' (কলকাতা: কথা, ২০১২), ২০।

৬৪। Lahiri, Final Report on the Survey and Settlement Operation, 117; West Bengal State Archive, Proceeding of Revenue Department, June 1871, Proceeding No. 68.

৬৫। ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং, ১০৩।

৬৬। Bandyopadhyay, Anup Matilal (ed), The Philosopher,s Stone Speeches and writing of Sir Daniel Hamilton, 302.

৬৭। Ascoli, A Revenue History of the Sundarbans, 74.

৬৮। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 60.

৬৯। O'Malley, Bengal District Gazetteers, 24-Parganans, 228.

৭০। ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং, ১১২।

৭১। স্বপন কুমার মন্ডল, এক ব্যতিক্রমী জমিদারের কথা, নেওয়া হয়েছে সন্তোষ বর্মন সম্পাদিত 'স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও গোসাবা-প্রবন্ধ সংকলন' (কলকাতা: কথা, ২০১২), ১০৩-১০৪।

৭২। মন্ডল, এক ব্যতিক্রমী জমিদারের কথা, ১০৪।

৭৩। বিকাশকান্তি মিদ্যা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্থান নাম (কলিকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০১০), ২৪০-২৪১।

৭৪। ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ৩৫।

৭৫। মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ৯৬২।

৭৬। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 335.

৭৭। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 335.

৭৮। Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans, 110.

৭৯। The Calcutta Gazette, Wednesday, 21st November, 1883, Notification 16th November, 1883, 1020.

৮০। Chakrabarti, "Local People and the Global Tigar: An Environmental History Of Sundarban" Global Environment 3(2009):72-95.

http://WWW.environmentandsociety.org/nodel/4614.

৮১। Rathindra Nath De, Sundarban (Calcutta: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 1991), 56.

৮২। Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans, 57.

৮৩। গোপীনাথ বর্মন, মহান স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও মানসকন্যা গোসাবা, নেওয়া হয়েছে রামনাথ মাইতি সম্পাদিত 'সুন্দরবন সমাচার' অষ্টম সংস্কার, (গোসাবা, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৮৭), ৩-৪; সৌমেন দত্ত, স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবা আখ্যান (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, এপ্রিল ২০১০), ১৪১।

৮৪। শচীন দাশ, জল-জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ১৯৯৭), ৮৫।

৮৫। Mandal & Ghosh, Sundarban: A Socio Bio-ecological Study, 112.

৮৬। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 332.

৮৭। J. A. Baines, Census of India, A General Report, 1891, Chapter III (Delhi: Manas Publication, 1985, First Print London, 1893); E. A. Gait, Census of India, 1901, Vol-VIA, Part-II and Vol-VIB, Part-III (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902); L. S. S. O'Malley, Census of India, 1911, Vol-V, Part-II, Table-IX, Part-A (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1913); W. H. Thompson, Census of India, 1921, Vol-V, Part-II, Table-II, Part-A (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot., 1923).

৮৮। Government of Bengal, General Department, Miscellaneous Branch, Annual General Report, Presidency Division for 1876-77, File No. 152-1.

৮৯। ধুর্জটি নস্কর, সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ, প্রথম খন্ড (কলিকাতা: শ্যামলী পাবলিকেশন, জানুয়ারি ১৯৯৭), ৫৩।

৯০। নস্কর, সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ, ৫৩।

৯১। নস্কর, সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ, ৫৩-৫৪।

৯২। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 318.

৯৩। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 37.

৯৪। H. Beverley, Report on the Census of Bengal, 1872, General Statement V. B, Statement of Nationalities, Race, Tribes and Castes (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872), pp. CXIV-OXXIV.

৯৫। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 317.

৯৬। O'Malley, Bengal District Gazetteers, 24-Parganans, 69.

৯৭। H. Beverley, Report on the Census of Bengal, 1872, General Statement V.B, Statement of Nationalities, Race, Tribes and Castes (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872), pp. CXIV-OXXIV; H. Beverley, Report of the Census of Bengal, 1872, General Statement 1. B, Details of the Population Classified According to Religion and Sex (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872), XlVI.

৯৮। A. Mitra, Census 1951, West Bengal, The Tribes and Castes of West Bengal, Land and Land Revenue Department (Alipore: West Bengal Government Press, 1953), 152-156; J. A. Bourdillon, Report on the Census of Bengal, 1881, Appendix-B (Calcutta: The Bengal Secretariat Press, 1883); H. Beverley, Report on the Census of Bengal, 1872, General Statement V.B, Statement of Nationalities, Race, Tribes and Castes (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872), CXIV-OXXIV.

৯৯। Richard M. Eaton, The Rise of the Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760 (Berkeley, London: University of California press, 1996), 113-119.

১০০। Mandal & Ghosh, Sundarban: A Socio Bio-ecological Study, III.

১০১। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 318.

১০২। H. Beverley, Report of the Census of Bengal, 1872 (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872), 136.

১০৩। H. Beverley, Report of the Census of Bengal, 1872, General Statement 1. B, Details of the Population Classified According to Religion and Sex (Calcutta:

Bengal Secretariat Press, 1872), XlVI; L. S. S. O'Malley, Census of India, 1911, Vol-V, Part-II, Provincial Table-II (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1913), 420-422.

১০৪। H. Beverley, Report of the Census of Bengal, 1872, General Statement 1. B, Details of the Population Classified According to Religion and Sex (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872), XlVI.

১০৫। Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Bengal Vol-I (Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1909), 360.

১০৬। O'Malley, Bengal District Gazetteers, 24-Parganans, 107.

১০৭। O'Malley, Bengal District Gazetteers, 24-Parganans, 82.

১০৮। A. Mitra, Census 1951, West Bengal, The Tribes and Castes of West Bengal, Land and Land Revenue Department (Alipore: West Bengal Government Press, 1953), 152-156; E. A. Gait, Census of India, 1901, Vol. VIB, Part-III (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902), 76-77.

দ্বিতীয় অধ্যায়

পোর্ট ক্যানিং: বিতর্কের মাধ্যমে শহরের উত্থান (১৮৫৩- ১৮৭১)

দ্বিতীয় অধ্যায়

পোর্ট ক্যানিং: বিতর্কের মাধ্যমে শহরের উত্থান (১৮৫৩ – ১৮৭১)

সময়ের গতিপথে ঘটতে থাকা সব ঘটনা একদিন ইতিহাস হবে। ইতিহাসের সময় সরণি বেয়ে দিনে দিনে যে জনপথ একদিন জনহীন থেকে জনপূর্ণ হয়েছিল, আবার কখনো সে কালের অমোঘ নিয়মে লোকশূন্য হয়েছে। কালচক্রের দুর্বিপাকে একদা যে জনপদ সভ্যতা স্বপ্নের আলোকনগরী, সময়ান্তরে তাই আবার অনালোকিত কোনো গ্রাম। এইরূপ সত্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন মাতলাচরের ক্যানিং। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণ অংশের একটি মহকুমা হল ক্যানিং, বৃহত্তম সুন্দরবনের একটি অংশমাত্র। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ সরকার বড়ো-বড়ো মাতাল ঢেউ সমৃদ্ধ এই মাতলার তীর বরাবর কলকাতা বন্দরের পরিপূরক একটি বন্দর তৈরীর পরিকল্পনায় নিয়োজিত হয়েছিল। বন্দর তৈরীর এই প্রচেষ্টা কালক্রমে শহর তৈরীর সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছিল। তবে সময়ের কালস্রোতে সেসব আজ বিলীন, নিশ্চিহ্ন প্রায়। মাতলার তীরে বন্দর তৈরীর এই করুণ বিয়োগান্তক পরিসমাপ্তি যেমন শহর হিসাবে মাতলার স্বপ্নকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল তেমনি সামনে এনেছিল কিছু প্রশ্নকে – কেন ব্রিটিশ সরকার কলকাতার পরিপূরক বন্দর হিসাবে মাতলা নদীর তীরে বন্দর গড়ে তোলার উদ্দ্যোগ নিয়েছিল? কলিকাতার পরিপূরক বন্দর তৈরীর কথা বলা হলেও পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল কি? পরিকল্পনামাফিক হলেও এই উদীয়মান বন্দর কেন ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়েছিল? বন্দর তৈরীর পথ ধরে কেমন করে নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল? বন্দর ধ্বংসের সাথে সাথে কি নগরায়ণের কাজ স্থগিত হয়েছিল?

মাতলার তীরে বন্দর তৈরীর মাধ্যমে শহরের উত্থান-পতনের ইতিহাস যে অঞ্চলকে কেন্দ্র করে, সেই ক্যানিং আজ থেকে বহু বছর পূর্বে মাতলা নদীর নামে নামাঙ্কিত মাতলা

জনপদ রূপে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগের সাথে যুক্ত ছিল। তবে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলার দক্ষিণাংশে পাঠান-সুলতানী শাসনের বলিষ্ঠ রাজকীয় কর্তৃত্বের অনুপস্থিতির সুযোগে "দ্বাদশ ভৌমিক" অর্থাৎ বারোভূঁইয়ারা শাসনকার্য পরিচালনায় সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে মহা-প্রতাপান্বিত রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের শাসনে মাতলা জনপদ প্রথম ঐতিহাসিকের দলিলে স্থায়ী আসন নিয়েছিল। তিনি মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের হাত থেকে রাজ্যকে সুরক্ষিত করতে রাজ্যের নানা স্থানে কতকগুলি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। নদী সংকুল মাতলা অঞ্চলে প্রতাপের একটি দুর্গ ছিল। যেটি 'মাতলা দুর্গ' নামে পরিচিত ছিল। দুর্গাধিপতি হায়দার মানকসি-এর নাম আনুসারে এটি হায়দর গড় দুর্গ নামেও পরিচিত ছিল বলে মনে হয়।[১] তবে ১৬১০ সালে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর সাথে সাথে সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল বা নিম্নবঙ্গের জনপদগুলির অধিকার চলে যায় পর্তুগীজ বা ফিরিঙ্গিদের হাতে। পর্তুগীজরা সে সময় পরিচিত ছিল ফিরিঙ্গি নামে।[২] এদের সাথে যুক্ত হয়েছিল পার্শ্ববর্তী আরাকান অঞ্চল থেকে আগত মগ জলদস্যু। এই পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচারে বাংলার নিম্নাংশের জনাকীর্ণ জনপদগুলি জনহীন অরণ্যে পরিণত হয়েছিল।[৩] পর্তুগীজ অত্যাচার ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল প্রতাপাদিত্যের সময়কার প্রসিদ্ধ দুর্গগুলিকেও। এসময় পর্তুগীজদের অত্যাচার থেকে বাদ যায়নি মাতলা দুর্গও। তাই মাতলা দুর্গের সামান্যতম ধ্বংসাবশেষও আজ আর লক্ষ্য করা যায় না। এইসব দুর্গের অবস্থান ও পতনের বিস্তারিত বিবরণ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রমে বলা যেতে পারে সময়ের গতিপথে ইংরেজদের আগমনে জনশূন্য এই অঞ্চল আবার জনপূর্ণ হতে শুরু করেছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাকে পরাজিত করার প্রতিদান স্বরূপ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৎকালীন নবাব মীর জাফর কর্তৃক কলকাতা ও চব্বিশ পরগনার জমিদারি স্বত্ব গ্রহণ করে এক নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিল।[৪] এর কয়েক বছর পর ১৭৬৫

সালে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী লাভের পর ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি এবং সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠনকে উদ্দেশ্য করে শ্বাপদ-সংকুল সুন্দরবনের অনাবাদি জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করার উপর গুরুত্ব দিয়েছিল।[৫] উদ্দেশ্য যাই হোক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই প্রচেষ্টা জনমানবশূন্য এই সুন্দরবনের বুকে নতুন করে বসতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

যেভাবে সুন্দরবন দ্বিতীয়বার বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠেছিল, তদনুরূপভাবে প্রতাপাদিত্যের সময়ের প্রসিদ্ধ হায়দার গড় বা মাতলা দুর্গ লর্ড ডালহৌসির হাতে শহর তৈরীর পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পুনরায় তার অতীত গৌরব ফিরে পেতে শুরু করেছিল। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসির সরকার কলকাতা বন্দরের পরিপূরক বন্দর হিসাবে মাতলা নদীতে যে বন্দর তৈরীর পরিকল্পনা করেছিল তার সূত্র ধরেই পরবর্তীতে মাতলা তথা ক্যানিং শহর তৈরীর সূচনা হয়েছিল। "It was decided that a new port would be set up on the river Matla and was initially visualized to function as a subsidiary to the port of Calcutta".[৬] মাতলা বন্দরকে কেন্দ্র করে শহর তৈরী প্রসঙ্গে হান্টার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মাতলাকে নিয়ে শহর ও পৌরসভা তৈরীর প্রথম পদক্ষেপটি ১৮৫৩ সালেই নেওয়া হয়েছিল। একটা সময় আশঙ্কা করা হয়েছিল যে নাব্যতা হ্রাসের কারণে হুগলি নদী খুব দ্রুত জাহাজ চলাচলে অক্ষম হয়ে পড়বে। এই ভয়ে ভীত হয়ে বণিকসভা মাতলায় একটি সহায়ক বন্দর তৈরীর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সরকারকে অবগত করেছিল। যেটি রেলপথ অথবা ক্যানেল-এর মাধ্যমে কলকাতার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে।[৭] তবে ক্যানেল নয় রেলপথ নির্মাণই সবচেয়ে উপযুক্ত হবে বলে, রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।[৮]

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন মাতলা জনপদকে আজও যে শহরের মর্যাদা প্রদান করছে, সেই ক্যানিং থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রসারিত রেলপথের সূচনা সম্পর্কে

আলোচনার পূর্বে যে ঘটনার হাত ধরে মাতলাকে শহর হিসাবে গড়ে তোলার সূচনা হয়েছিল, সেটি আলোচনা করে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে।

হুগলি নদীর তীরে গড়ে ওঠা কলকাতা বন্দর এবং তার পশ্চাদভূমি সমগ্র বাংলা তথা কলকাতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। উনিশ শতকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এশিয়াতে তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে দৃঢ় করতে পেরেছিল দুটি বিশেষ বন্দরের সহায়তায় এদের একটি হল কলকাতা এবং অপরটি সিঙ্গাপুর। ১৬৯০ সালে যখন জব চার্নক কলকাতা আবিষ্কার করেছিলেন তখন হুগলী তীরবর্তী কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর ছিল সম্পূর্ণ গ্রাম। কিন্তু বণিক জাতির চোখ ঠিকই উপলব্ধি করেছিল কলকাতা ও তাঁর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি লাভজনক ও সম্ভাবনাময় বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে। তাছাড়া কোম্পানির আগমনের পূর্বে এখানকার আদি বাসিন্দা তাঁত ব্যাবসায়ী সেঠ ও বসাক-রা কলকাতার প্রাকৃতিক জলপথকে ব্যবহার করে সুতানুটি ও গোবিন্দপুরকে তুলো ব্যাবসায়ের এক সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। কলকাতার প্রতি ইংরেজ কোম্পানির আকর্ষণ বৃদ্ধির এটি একটি অন্যতম বড়ো কারণ।[৯] অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে বাণিজ্যিক উদ্দ্যোগ ও বিনিয়োগের কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার ছোটো বাজার খুব শীঘ্রই বড়ো বাজারের আকার ধারণ করেছিল। এই বাজারগুলির আশপাশে ইংরেজরা তাদের বসতি গড়ে তুলেছিল। এভাবে কলকাতা হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সদর দপ্তর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্ত বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র।[১০] এরপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত এবং পশ্চিমের দেশগুলির উপর একচেটিয়া বাণিজ্যেক অধিকার লাভ করলে কলকাতা বন্দর তার বিশাল পশ্চাদভূমি নিয়ে ভারতের মধ্যে এমনকি বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কোম্পানির উপনিবেশিক বাণিজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে পরিণত হয়েছিল। আর এটি কলকাতা বন্দরকে আন্তর্জাতিক বন্দরের মর্যাদা প্রদান করেছিল।[১১]

এই-সময় থেকে কোম্পানি বাংলার আঞ্চলিক অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে বাংলাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এক নতুন ধারা, ক্যান্টন ট্রেড বা রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে পরিচয় করিয়েছিল। আর কোম্পানির অধীনে রেখেছিল এর একচেটিয়া অধিকার। ভারতীয় বণিকরা কলকাতাকে মিলিয়ে দিয়েছিল ক্যান্টন এবং লন্ডনের সঙ্গে এবং বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক সংস্থার মাধ্যমে কোম্পানির লভ্যাংশ চলে যেত লন্ডনে। এভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভারতীয় অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। আর রপ্তানিযোগ্য কাঁচামাল সরবরাহের বিশাল পশ্চাদভূমির কারণে কলকাতা হয়ে উঠেছিল প্রধানতম রপ্তানী বাজার।[১২] এছাড়া কলকাতা ছিল পাশ্চাত্য প্রভাবে সৃষ্ট পূর্বদিকের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রোটোটাইপ বন্দর।[১৩] তাইতো ব্রিটিশরা বহিঃভারতীয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সৃষ্টির প্রধান দ্বার হিসাবে কলকাতাকে করেছিল ভারতের রাজধানী।[১৪] এরপর উনিশ শতকে কলকাতার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তারের করণে এবং পরিবর্তিত পণ্যদ্রব্য ও ক্রমাগত উদ্বৃত্ত তৈরীর ক্ষেত্রে বোম্বে অথবা মাদ্রাজ অপেক্ষা বৃহৎ জায়গা দখল করেছিল কলকাতা।[১৫] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কলকাতার বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে এর শারীরিক অবক্ষয়ও শুরু হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রকৃতিগত কারণে সৃষ্ট নাব্যতা হুগলী নদীর গতিপথকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। ফলে কলকাতাবাসীরা যেমন গঙ্গা নদীর মিষ্টি জলের প্রবাহ থেকে ক্রমশ বঞ্চিত হয়েছিল, তেমন বাণিজ্যিক কার্যক্রম নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ভীত সন্ত্রস্ত ঔপনিবেশিক প্রশাসক তাই এমন ব্যস্ত বন্দরের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছিল। এই সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের অভিপ্রায়ে ১৮২০ সালের দিকে ডায়মন্ডহারবার এবং কলকাতাতে 'wet docks' নির্মাণের পরিকল্পনার উপর আলোচনা শুরু হয়েছিল। তবে কোনোটাই ফলপ্রসূ হয়নি। এরপর ১৮৪২ সালে প্রলয়কারী সাইক্লোনে কলকাতা বন্দরের জাহাজ-নোঙ্গরখানা ভেঙে যাওয়ায় আরও একবার কলকাতা বন্দর

পুনঃগঠনের পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। তবে কলকাতা বন্দরের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ নতুন মোড় নিয়েছিল মাতলার তীরে নতুন বন্দর তৈরীর পরিকল্পনা দ্বারা।[১৬]

ইতিমধ্যে চেম্বার অব কমার্সের কিছু সদস্য বড়ো বোঝার জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্য কলকাতা অপেক্ষা মাতলাকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল। এছাড়া হুগলীর প্রবেশ পথে সমুদ্রের মুখের চ্যানেলগুলিতে দ্রুত পলি সঞ্চার-এর করণে জাহাজ ডুবির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিল, ফলে হতাহতের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছিল, যেটি জাহাজ মালিক ও সামদ্রিক বীমাকারীদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল।[১৭] তাই বাংলা সরকারের প্রতিনিধি স্বরূপ চেম্বার অব কমার্স হুগলীতে নৌ চলাচলের বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে মাতলাতে একটি নতুন চ্যানেল খোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল।[১৮] ১৮৫৩ সালের ২৭শে মে চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ থেকে টি. এম. রবিনসন গভর্মেন্ট অব বেঙ্গলকে উদ্দেশ্য করে মাতলার তীরে বন্দর তৈরীর অপরিহার্যতা নিয়ে একটি চিঠি লেখেন: (চিঠিটির ইংরেজি প্রতিলিপি সূত্র নির্দেশ অংশে দেওয়া হল)

“বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের কমিটি কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে আমি, হুগলি নদীর নাব্যতার কঠিন ও বিপজ্জনক বিষয় যা অদূর ভবিষ্যতে কলকাতা বন্দরে ছোটো জাহাজ ব্যতীত যে-কোনো জাহাজ চলাচলের জন্য হুমকিস্বরূপ হিসাবে বিবেচিত হবে, সেই বিষয়টিকে বাংলার সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় সরকারের নজরে আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছি।

বর্তমান মরসুমে লয়েড চ্যানেলের জেমস এবং মেরি ও গ্যাসপার বালির ওপর জলের গভীরতা আগের মৌসুমের চেয়ে কম ছিল এবং গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পাইলটরা বাষ্প ছাড়া ৫০০ টনেরও বেশি মাল যুক্ত জাহাজ চালায়নি বলে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। ঠিক ওই সময়ে বন্দরের বাষ্প চালিত স্টিমারগুলি এতটা পরিপূর্ণভাবে নিযুক্ত হয়েছিল যাতে সমুদ্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং নিজ বন্দর পরিত্যাগ করে অন্য বন্দরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত

মাল বোঝাই জাহাজগুলি তাদের যাত্রা পথে অগ্রসর হতে না পেরে পনেরো থেকে তিন সপ্তাহ ধরে আটকে ছিল।

বর্তমানে এই অবস্থানে থাকা বেশ কয়েকটি জাহাজের জুলাইয়ের শুরু পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

হুগলি নদীর সাথে সুপরিচিত বেশিরভাগ নাবিকের অভিমত যে এর নাব্যতা সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতাগুলি নদীর রূপ, তার মাটি এবং জোয়ারের প্রকৃতি থেকে বেড়েই চলেছে এবং কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা দ্বারা এগুলি অপসারণ অসম্ভব।

তাই বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের কমিটি বাংলার সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় সরকারকে কিছু নতুন চ্যানেল দ্বারা সমুদ্র থেকে ওই বন্দরের সাথে নতুনভাবে যোগাযোগের প্রচেষ্টা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই বিষয়ে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছে এবং মাতলা নদীর সক্ষমতার বিষয়টিকে সর্বাধিক শ্রদ্ধার সাথে তার দৃষ্টি আকর্ষন করানোর চেষ্টা করছে।

হুগলির পূর্ব দিকের প্রায় ৫০ মাইল দূরে মাতলা নদীর প্রবেশপথটি কোনো প্রকার নাব্যতার সমস্যা ছাড়াই সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছে যেত। এর মুখ থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে বড়ো ধরনের জাহাজের জন্য একটি ভালো আশ্রয়স্থল আছে। এখানে ঘন্টায় ৩ থেকে ৪ কিলোমিটারের বেশি জোয়ার প্রবাহিত হয় না এবং পূর্ণ-জোয়ার (flood-tide) কখনো সঙ্গে করে বন্যা নিয়ে আসে না। নিম্ন জোয়ারের সময়ের সবচেয়ে অগভীর অংশে জল থাকে ৩ ১/২ Fathoms (১ fathoms = ৬ feet(১.৮ মিটার) এবং সমুদ্র থেকে কলকাতার ২৫ মাইলের মাঝামাঝি পর্যন্ত এর গতিপথ জুড়ে বেশিরভাগ জায়গায় জল থাকে ৬ থেকে ৯ Fathoms। এভাবেই এটি নাব্যতার দিক থেকে হুগলি অপেক্ষা উন্নততর যোগাযোগের সুবিধা দান করে।

কলকাতা থেকে ২৫ মাইল দূরত্বের মধ্যে মাতলা যদিও নাব্যতাযুক্ত, যথেষ্ট বাতাস পরিবাহী এবং সংকীর্ণ হওয়া সত্বেও মধ্যবর্তী অঞ্চলটি রেলপথ অথবা ক্যানেল গঠনের পক্ষে

অনুকূল বলে মনে হয়, যার মাধ্যমে কলকাতার সাথে যোগাযোগ চালিয়ে যেতে পারা এবং বাণিজ্য ব্যবস্থা পরিচালনার সব রকম সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা যাবে। কমিটির কাছে আন্তরিক অনুরোধ যে, বাংলার সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় সরকার মাতলা নদী সমীক্ষা করার জন্য একটি অর্ধাদেশ প্রদান করবেন, যেটি সমুদ্র থেকে শুরু করে কলকাতা এবং সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে নিয়ে, এছাড়া সমীক্ষাটিতে যাতে হুগলি নদী অপেক্ষা মাতলার নাব্য সুবিধার বিষয়টি কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং বিষয়টি যাতে তার লর্ডশিপের অনুকূল বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। খুব শীঘ্রই বৃষ্টিপাতের সূত্রপাত হবে এবং নদীগুলি এখন যেহেতু সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে তাই কমিটিকে এটি উল্লেখ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে এটি সমীক্ষার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় এবং এটি খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে।

প্রশ্নটিকে কেবলমাত্র স্থানীয় নয় জাতীয় গুরুত্ব হিসাবে বিবেচনা করে, কমিটি এটা বিশ্বাস করে যে বাংলার সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় সরকার অনধিকার প্রবেশকারী হিসাবে বিবেচিত হবেনা যেহেতু তাদেরই অনুরোধে বিষয়টির প্রতি তিনি তাঁর প্রাথমিক দৃষ্টি প্রদান করেছেন"।[১৯]

বণিকসভা, কলকাতা এবং কলকাতার পশ্চিমাংশে ভবিষ্যৎ বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ক্যানিং-এ সহায়ক বন্দর তৈরীর এই প্রকল্পটিকে উল্লেখ্য কমিটি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। হুগলী নদীর নাব্যতা কম হয়ে আসায় বড়ো-বড়ো জাহাজগুলি বোম্বে বন্দরে নোঙ্গর করা শুরু করেছিল। ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে কলকাতার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়ে পড়েছিল। এছাড়া ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সামরিক বাহিনীর জাহাজের আকার এবং বার্ষিক প্রায় এক টন হারে বাণিজ্যিক জাহাজের ওজন ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই অনুমান করা হচ্ছিল যে, কলকাতা বন্দরে এই ধরনের জাহাজ পরিবহণ করা সম্ভব হবে না। তাই বাণিজ্যিক ও সামরিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে পোর্ট ক্যানিংকে অনিবার্য মনে হয়েছিল। কারণ মাতলাই ছিল একমাত্র নদী যেটি সব ঋতুতে জলপূর্ণ থাকত।[২০] এছাড়া দূরত্বের দিক থেকেও

মাতলা ও কলকাতার দূরত্ব বিশেষ ছিল না। মাত্র ২৮ মাইল দূরত্ব সেটাও যদি রেলপথের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয় তাহলে এই দূরত্ব নগণ্য বলে মনে হবে।[২১] এভাবে কলকাতাকে বিশ্ববাণিজ্যের দরবারে তুলে ধরতে মাতলা বন্দরই হবে একমাত্র চাবিকাটি এই ধরনের ভাবনা খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক ছিল না।

বঙ্গোপসাগরের মোহনায় মাতলা নদীর তীরে নতুন বন্দর তৈরীর পিছনে কেবলমাত্র হুগলি নদীর নাব্যতা হ্রাসই একমাত্র কারণ ছিল, নাকি অন্য কোনো প্রেক্ষিত ছিল সেগুলি একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে :

- একদল ব্রিটিশ অফিসার মনে করতেন যে, চাল ও তৈলবীজের মত ভারী ধরনের সামগ্রী যেগুলি পরিবহণের ভাড়া সত্যিই খুব বেশি ছিল সেগুলিকে কলকাতা অপেক্ষা মাতলা দিয়ে সরবরাহ করলে পরিবহণ মূল্য অনেকাংশে কমে যাবে।[২২]
- পাশাপাশি এটাও দেখা গিয়েছিল যে, তীর বরাবর মাতলা নদী তাৎপর্যপূর্ণভাবে গভীর ছিল এর ফলে জাহাজগুলিকে খুব সহজে জাহাজ-ঘাটাতে দাঁড় করানো যেত এবং পণ্যসামগ্রী নিচে নামিয়ে নেওয়া সহজ হত। ফলস্বরূপ অবতরণ এবং সরবরাহ মূল্যে সাশ্রয় হত। এছাড়া হুগলি নদীতে উচ্চবেগে স্রোত (ঘন্টায় সাড়ে সাত মাইল বেগে) প্রবাহিত হওয়ার কারণে বন্দরে দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যেত। যেখানে মাতলা নদীর স্রোতের গতি ছিল তুলানমূলক কম (ঘন্টায় চার মাইল) ফলে মালবাহী জাহাজগুলিকে নিরাপদে রাখা যেত। এমনকি বৃষ্টির সময়েও মাতলাতে খুব একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হত না। এভাবে মাতলা উন্মুক্ত নদীবন্দর এবং উঠতি বাণিজ্যিক শহর হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল।[২৩]
- কলকাতা বন্দরকে উন্নত করে তুলতে সাহায্য করেছিল উন্নত রেলপথ ও সড়ক পথ, যেটি মাতলা বন্দরের ক্ষেত্রে ছিল না বললেই চলে। এই প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও সস্তা শ্রমিক ও মাটির উর্বর ক্ষমতার কারণে মাতলা নদীর মাধ্যমে হওয়া ধানের বাণিজ্যকে প্রতিরোধ

করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাতলা বন্দরের পশ্চাদভূমি থেকে যে পরিমাণ ধান উৎপাদিত হত তাতে ইউরোপের ৬৫ হাজার টন থেকে ২ লক্ষ টন ধানের চাহিদা মিটিয়েও সুন্দরবনের অনুদান খাতে আরও ২ লক্ষ টন ধান সরবরাহ করা যেতে পারত।[২৪]

- এগুলো ছাড়াও মাতলা ছিল তুলো চাষের কেন্দ্র। উন্নত মানের তুলো উৎপাদনের জন্য সুন্দরবনের মাটি এবং জলবায়ু উপযুক্ত ছিল। তবে বিভিন্ন কৃষিবিদদের পরামর্শ নিয়ে এই চাষের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে মাতলার কাছাকাছি সুন্দরবনে তুলা চাষের পরিকল্পনাটি ছিল সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষামূলক চাষবাষের ক্ষেত্র। এই মতের স্বপক্ষে নিচের রিপোর্টটি খুবই যুক্তিযুক্ত, যেটির বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়: (ইংরেজি প্রতিলিপিটি সূত্র নির্দেশ অংশে দেওয়া হল)

"ক্যালকাটা এগ্রিকালচারাল সোসাইটির কার্যপ্রণালীতে মাতলার তুলো সংক্রান্ত প্রতিবেদন, ৯ই ডিসেম্বর ১৮৫৮।

সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে অনুদান হিসাবে দেওয়ার জন্য সমাজ থেকে তুলো Sea Island বীজের নং ১ এবং নং ২ নমুনা সংগ্রহ করে টেবিলের উপর রাখা হয়েছিল এর সঙ্গে ছিল মূল Sea Island বীজের সঙ্গে তুলনা করে কমিটির সদস্যদের একটি প্রতিবেদন এবং মেলবোর্নের Sea Island বীজ থেকে প্রাপ্ত তুলোর উচ্চতর বর্ণনা পাওয়া যায়। মিস্টার ফ্রিল্যান্ড রিপোর্ট করেছেন যে নমুনা নং ১-এর দৈর্ঘ্য মেলবোর্নের নমুনা চেয়ে নিকৃষ্ট এবং এই কারণে এর মান এতটাই নিচে। নমুনা নং ২ সম্পূর্ণভাবে মেলবোর্নের নমুনার সাথে সমান এবং লিভারপুলের বাজারেও একই দাম পাওয়া যাবে, এটি Sea Island তুলোর মূল নমুনার সাথে খুব অনুকূল তবে শক্তিতে একটু কম"।[২৫]

মাতলা অ্যাসোসিয়েশন[২৬] বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো তুলো বীজ এনে পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল এবং নতুন বন্দরের আশেপাশে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে এই পরীক্ষামূলক চাষের সূচনা করেছিল।[২৭]

- এরই পাশাপাশি অন্য একটি কারণও ছিল, অনুমান করা হয়েছিল যে লবণ উৎপাদন এই অঞ্চলের একটা বাজার খুঁজে পাবে, যেটি নতুন বন্দরের বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে। লবণ তৈরীর জন্য অস্থায়ী 'ভাসমান গোলা (floating Golah)' তৈরীর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল।[২৮]

নতুন বন্দর তৈরীর কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে এইসব কারণগুলিও সরকারকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিল।

তৎকালীন বাংলার সর্বেসর্বা লর্ড ডালহৌসি উপরোক্ত বিষয়গুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কোনো প্রকার সময় নষ্ট না করে চেম্বার অফ কমার্স-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই ব্যাপারে প্রথম সরকারি পদক্ষেপের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৫৩ সালের ১৮ই জুলাই। ঐ দিন ডালহৌসি সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম মাতলা নদীর আশপাশের জমিতে বন্দর তৈরীর জন্য এলাকা খালি করার নির্দেশ জারি করেছিল। ডালহৌসি এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে চেম্বার অব কমার্সকে জানায় যে, সত্যিই যদি হুগলী নদীর মুখে পলি জমে নৌ চলাচল ব্যাহত হয় তাহলে ভারতের এই অংশের সাথে বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মাতলাই হবে হুগলীর বিকল্প পথ।[২৯]

এইসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য অতি দ্রুত দুটি কমিটিও তৈরী করা হয়েছিল। ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ওয়ার্ড (Ward) এর নেতৃত্বে একটি কমিটিকে মাতলা নদীর সক্ষমতার উপর তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল এবং 'রিভার হুগলি কমিটি' নামে অন্য

একটি কমিটিও নিয়োগ করা হয়েছিল। ওয়ার্ড দুটি সরকারি জাহাজের সহায়তায় খুব সতর্কতার সাথে অঞ্চলটি জরিপ করে ১৮৫৩ সালের ১৫ই নভেম্বর তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে দেখান যে, ১৮৩৯ সালের পর থেকে মাতলা নদীতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন চোখে পড়েনি। লেফটেন্যান্ট ওয়ার্ড মাতলা অ্যাসোসিয়েশনের এক সদস্যকে, মাতলা নদী বন্দর তৈরীর জন্য কতটা অনুকূল এবং তার সক্ষমতার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে ১৮ পৃষ্টা সমন্বিত একটি রিপোর্ট সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করেন। রিপোর্টটিকে বাংলায় তর্জমা করলে এইরূপ দাঁড়ায়:

"আমার ধারণা বা অভিমত হল এই যে, নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে কলকাতা বন্দর হিসাবে হুগলি অপেক্ষা মাতলা অনেক শ্রেয়। বাষ্পের সহায়তায় একটি জাহাজ সর্বদা সর্বত্র যাতায়াত করতে সক্ষম, জোয়ারের সময় সর্বদা ২৪ ফুটের বেশি পরিমাণ জলের গভীরতা থাকে, ফলে জাহাজে কোনো প্রকার টানের সৃষ্টি হয় না, ঘণ্টায় সাড়ে ৩ থেকে ৪ মাইলের বেশি কখনো জোয়ার-ভাটার টান থাকে না, যার ফলে জাহাজের সম্মুখস্থ অংশ ও নোঙ্গরের ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই, কোনো চলমান বালির অস্তিত্ব নেই, ফলে যে-কোনো সচেতন নাবিক সামুদ্রিক মানচিত্রের সাহায্যে তার জাহাজকে এদিক-সেদিক চালিত করতে পারে। হুগলির মত মাতলার প্রবেশপথ এতটাই সহজ ছিল যে পাইলট প্রায় নিষ্প্রয়োজনীয় হয়েছিল। এগুলি হল ভালো দিক। কেবলমাত্র একটি বিষয় আমি সতর্ক করতে চাই, যেটি আপনি পূর্বেই উল্লেখ করেছেন সেটি হল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাব, তবে আমার মতে ৩০০ মাইলের স্থলে ৩৫ মাইল দূরত্বের জন্য এটি সামান্যতম পরিণতির বিষয়। এছাড়া আমরা দেখেছি যে মৌসুমী বায়ুর মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ চালভর্তি জাহাজ আকুয়াব (Akyab) বন্দর পরিত্যাগ করে।

আমি বলি যে, যদি কলকাতা বন্দরের মত 'মাতলাকে' গ্রহণ করা হয় তাহলে নৌ-পরিবহণের ক্ষতি এখন যা হয় তার ১ শতাংশ হবে।

উপরের বিষয়টি যদি আপনার কোনো প্রকার উপকারে আসে তাহলে এটিকে আপনি যেখানে উপযুক্ত মনে করেন সেখানেই স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করতে পারেন"।[৩০]

তবে হুগলি কমিটির রিপোর্ট ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তাদের মতে মাতলা নদীর চরিত্র বন্দর গঠনের পক্ষে কম অনুকূল ছিল। চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃক নিযুক্ত এই কমিটির সদস্য ছিল মাস্টার অ্যাটেনডেন্ট থেকে ক্যাপ্টেন ডি. রবার্টসন, সরকারি সদস্য হিসাবে ছিল ক্যালকাটা এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতাত্ত্বিক মিস্টার. এইচ. পিডিংটন এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকে মিস্টার. জে. জে. মেকেঞ্জি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তথ্যগুলো সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এইসব সদস্য তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছিল। তারা রিভার স্টিমার (River Steamers) এবং স্টিম ঠাগস (Steam Tugs) নামক দুটি জাহাজের কম্যান্ডোদের থেকে ১৭ জন অভিজ্ঞ লোকদের নিয়ে ব্যক্তিগত পরীক্ষাও করেছিলেন। তারা ১৮০৪ থেকে ৪০ বছরের সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও দলিলকৃত অথবা দলিলভুক্ত তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করেন, তাদের মিলিত বিবরণটি ছিল এইরূপ :

"নিচে স্বাক্ষর যুক্ত বিবৃতিটি যদি প্রমাণের সত্যতা প্রকাশের সূচক হয় তাহলে এটা পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় যে বর্তমানে হুগলি নদীর অবনতি ঘটছে, পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে এর গভীর চ্যানেলগুলি অগভীর ও সংকোচিত হয়েই চলেছে আর এটি ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হয়েছে এবং বর্তমানে নদীর এইরূপ অবস্থার কারণে অবনতির এই প্রক্রিয়া বাড়তেই থাকবে"।[৩১]

তবে মাতলার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাঁরা তাঁদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিটি নিম্নলিখিত একটি অনুচ্ছেদ এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন :

"এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই বন্দরে প্রতিবছর জলের ভারী খসড়াযুক্ত জাহাজের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন ১৮৪০ থেকে ১৮৫৪ এই ১৪ বছরে মাল পরিবহন এবং বকেয়া pilotage-এর হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, পূর্বের সাড়ে ৩৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৪ শতাংশ। সেই সময় আর বেশি দূর নেই যখন কোনো একটি শ্রেণির জাহাজ ভারতে আসতে চাইলে হুগলির সম্ভাব্য উন্নতি সেটিকে চলাচলযোগ্য করে তুলবে এবং ওই সময় হুগলিকে বাণিজ্যিক মহাসড়ক হিসাবে সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি স্নায়ু তার চ্যানেলকে সক্রিয় রাখতে চাইবে ফলে সহায়ক বন্দর হিসাবে মাতলা তার আকর্ষণ হারাবে না"।[৩২]

১৮৫৫ সালের ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে উপরে বর্ণিত বিস্তারিত প্রতিবেদনটি কমিটি কর্তৃক ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং প্রতিবেদনটি না পৌঁছানো অবধি মাতলা নেভিগেশনের পুরো বিষয়টি আপত্তিহীন বলে মনে হয়েছিল। তবে চেম্বার অফ কমার্স হুগলির চ্যানেলগুলোকে গভীরতম করার সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত ছিল। চেম্বার অফ কমার্স তাদের নতুন প্রকল্প "Improving the Hoogly" পরিচালনার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগী হয়নি। এমনকি ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যাগুলি সমাধানের পুরো প্রশ্নটিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাগিয়ে রেখেছিল। চেম্বার অফ কমার্স পূর্বেই ধরে নিয়েছিল তাদের পরামর্শগুলি সরকার 'মৃত শব্দ' মনে করে কখনোই গ্রাহ্য করবেনা।

যদিও চেম্বার অফ কমার্স একটি সম্মিলিত সংস্থা এবং এর কিছু কিছু সদস্য এই-সময় মাতলার প্রতি আগ্রহহীন হয়ে পড়েছিল অথবা নামমাত্র সম্মতি প্রকাশ করেছিল। তবে এর বেশ কিছু সদস্য তাদের সিদ্ধান্তে অনড় ছিল। তাই চেম্বার অব কমার্সের সদস্যদের একটি দল যার অধীনে কমিটি হিসাবে নিযুক্ত কিছু সরকারি কর্মকর্তা সম্মিলিতভাবে বন্দরের দিকটি পরীক্ষা করে দেখার এবং বন্দরের পার্শ্ববর্তী স্থানীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৮৫৬ সালের মার্চ মাসে মাতলা ভ্রমণ করেছিলেন।[৩৩] এই দলটির সদস্যরা ছিল :

এ. আর. ইয়ং, সি. এস. স্কুয়ার, শুল্ক সংগ্রহকারী।

ক্যাপ্টেন ডি. রবার্টসন, সামুদ্রিক কার্যনির্বাহক।

ক্যাপ্টেন ইয়েল, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারের অধীনস্থ সেক্রেটারি।

ডব্লিউ. মেইটল্যান্ড স্কুয়ার, মেসার্স ম্যাকিলপ, স্টেওারট অ্যান্ড কোম্পানি।

এফ. শিলার স্কুয়ার, মেসার্স জন ব্রদেল অ্যান্ড কোম্পানি।

আর. হামিল্টন স্কুয়ার, মেসার্স স্মিথ, ফেরি অ্যান্ড কোম্পানি।

এইচ. আয়ারল্যান্ড স্কুয়ার, মেসার্স সালিজ অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড।

ও. ভি. আর্নস্টাউসেন স্কুয়ার, মেসার্স ওয়িএনহট, আর্নস্টাউসেন অ্যান্ড কোম্পানি।

এন. সি. টুকেরম্যান স্কুয়ার, মেসার্স ওহিটনেয় অ্যান্ড কোম্পানি।

ডব্লিউ. চ্যাপম্যান স্কুয়ার, মেসার্স লিছ, রাওসন অ্যান্ড কোম্পানি।

এডওয়ার্ড. ডি. কিলবার্ন স্কুয়ার, মেসার্স সছেন, কিলবার্ন অ্যান্ড কোম্পানি।[৩৪]

মাতলা পরিদর্শনের সময় কিলবার্ন অ্যান্ড কোম্পানির কর্ণধার এডওয়ার্ড. ডি. কিলবার্ন এই অঞ্চলের একটি বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি একটি জায়গার নামকরণ করেছিলেন এলেনগঞ্জ (Ellengunge) যেখানে শুধুমাত্র একটি পাকা বাড়ি ছিল। সেই সময় মোল্লা খাল (Mallee Khal) গভীর জঙ্গলে মোড়া ছিল।[৩৫] মিস্টার মোরে ৪৩, ৪৮, ৪৯, ১২৯, এবং ১৩০

নাম্বার প্লটের ম্যানেজার ছিলেন এবং ছয় মাস এই অঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে দিন কাটিয়েছেন। তাঁর মতে এই অঞ্চলটি ছিল স্বাস্থ্যকর এবং মিষ্টি জল পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। কুলিদের দ্বারা কোনো রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। এমনকি কুলিরাই সাগ্রহে জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিল।[৩৬] ডি. কিলবার্ন চাইছিল নতুন বন্দরের শুরু হোক মোল্লা খাল (Mallee Khal) থেকেই এবং জঙ্গল পরিষ্কারের কাজও শুরু হোক খুব শীঘ্রই। সরকারকে দেওয়া তাঁর একটি পরামর্শ ছিল যে, যতটা সম্ভব পোর্ট চার্জ কমানো এবং কৃষিকাজের সম্প্রসারণ করা হোক।[৩৭]

এই অঞ্চলেই বন্দর তৈরীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তবে বন্দরের সাথে যুক্ত একটি শহর তৈরীর জায়গা নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছিল। এ. আর. ইয়ং, এইচ. ইয়েল এবং ডি. রবার্টসন, বাংলা সরকারের সেক্রেটারিকে চিঠি লিখে লট নাম্বার ৫৪ কে শহর তৈরীর উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচনের অনুরোধ জানান। কারণ লট নাম্বার ৫৪ বিদ্যাধরী এবং মাতলা নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল। যেটি মাতলা নদীর তীরে পোর্ট টাউন তৈরীর জন্য উপযুক্ত স্থান।[৩৮]

লট নাম্বার ৫৪-কে বেছে নেওয়ার পিছনে আরও বেশ কিছু কারণ ছিল সেগুলি নিম্নরূপ :

- ৫৪ নম্বর লটের নিকটবর্তী মাতলা নদী সব ধরনের জাহাজ চলাচলের জন্য উপযুক্ত ছিল।
- অঞ্চলটি অভ্যন্তরীণভাবে সারা দেশের সাথে সংযুক্ত ছিল। সারা বছর ধরে বাংলার পূর্ব দিকের জেলাগুলির উৎপাদিত দ্রব্য এই অঞ্চলের উপর দিয়ে কলকাতাতে নিয়ে যাওয়া হত এবং সেখান থেকে বাইরে রপ্তানি হত, পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ আমদানিকৃত দ্রব্যও এই অঞ্চলের উপর দিয়ে অন্তর্দেশীয় জেলাগুলিতে সরবরাহ করা হত। এছাড়া বিদ্যাধরী নদীর যে অংশটি সরকারি সম্পত্তির অংশ সেখান থেকে একদিনে দু'শটি মালবাহী ভারী জাহাজ যাওয়া-আসা করতে পারত। এছাড়া এই অঞ্চল এবং কলকাতার মধ্যে আগে থেকেই জল-

যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্তমান ছিল এবং তা বড়ো ধরনের জাহাজ চলাচলের জন্যও পর্যাপ্ত ছিল।

- ৫৪ নম্বর লটের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিও বসতি স্থাপনের পক্ষে সহায়ক ছিল। ৫৪ নম্বর লটের জলবায়ু ছিল খুবই মনোরম। তবে ১৮৫৬ সালের ২৬শে মার্চ এ. আর. ইয়ং, এইচ. ইয়েল, এবং ডি. রবার্টসন বাংলা সরকারের সেক্রেটারিকে একটি চিঠি লিখে জানান যে, ৫৪ নম্বর লটের জঙ্গল পরিষ্কারের সময় পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত কয়েকজন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল, এছাড়াও বাঘের দ্বারা আক্রান্ত বা বাঘের খাদ্যে পরিণত হয়েছে এমন কয়েকটি রিপোর্ট ও লিপিবদ্ধ আছে।[৩৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জঙ্গল কেটে জমি হাসিলের এই-পর্বে সবচেয়ে কঠিন এবং ভয়াবহ কাজ ছিল সুন্দরবনের বাঘ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের হাত থেকে প্রাণরক্ষা করা। যে কিনা মানুষ ভক্ষক বা man-eater নামে পরিচিত। বাঘের আক্রমণ কোথাও কোথাও এমন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল যে জমি হাসিলের প্রক্রিয়া বন্ধ রাখতে হয়েছিল দীর্ঘসময়। ফলে হাসিলকৃত জমি পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল।[৪০] এমতাবস্থায় সরকার বাঘ শিকারের জন্য দেশীয় শিকারীদের দ্বারস্থ হয়েছিল। জঙ্গল কেটে জমি হাসিলের কাজে সাহায্য করতে সরকার বাঘ শিকারের জন্য অর্থ প্রদানের ব্যাবস্থাও করেছিল। “The government in 1852 seems to have thought that special measures were necessary for the destruction of tigers in the 24-Parganas. The Collector recommended (and the Sundarban Commissioner supported him) that the reward should be raised from Rs. 5/- which afforded very little profit, to Rs. 10/- and paid over promptly. Government sanctioned the increase in 1853 and doubled the reward in

1860, for every tiger killed near the Matla in order to aid the work of reclamation there."[৪১]

যাইহোক লেফটেন্যান্ট ওয়ার্ড-এর রিপোর্ট প্রকাশের পূর্বেই সরকার একটি নির্দেশ নামার মাধ্যমে ৫৪ নম্বর লটকে পরিষ্কার করে সব ধরনের কাজ শুরু করার আদেশ দিয়েছিল।[৪২] সরকার ১৮৫৩ সালের ৫ই জুলাই, তৎকালীন লটদার রাধামাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ১১ হাজার টাকার বিনিময়ে ৫৪ নাম্বার লটটিকে বন্দর ও রেলপথ নির্মাণের জন্য কিনেছিল। অঞ্চলটির জমির পরিমাণ ছিল আনুমানিক প্রায় ২৫ হাজার বিঘা, যার মধ্যে ৩৮৮৩ বিঘা জমিতে চাষবাস হত এবং বাকিটা ঢেকে ছিল জঙ্গলে।[৪৩]

প্রায় ঐ একই সময়ে মাতলার ৫৪ নম্বর লট সংলগ্ন এলাকার ৬৫০ একর আয়তনের জমিতে পোর্ট ক্যানিং টাউন তৈরীর সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল এবং একটি কমিটি গঠন করে এলাকা পরিদর্শন ও জরিপ করে কোথায় শহর তৈরী হবে তার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।[৪৪] ১৮৫৬ সালে ৫৪ নম্বর লটের দক্ষিণ দিকের সঙ্গে জোড়া ৫০ নম্বর লটটিকে নতুন করে গ্রহণ করে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয়েছিল।[৪৫] অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর ১৮৫৭ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মাতলা নদীর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত লটের এক বর্গমাইল স্থান সরকারের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। আর অবশিষ্ট অংশটিকে পুনরায় ইজারা দেওয়া হবে পূর্বের তালুকদারকে। তবে শর্ত ছিল একটি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫৪ নম্বর লটের উত্তর দিকটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিতে হবে। পরবর্তীতে ১৮৫৯ সালে মাতলা নদীর সীমানা সূচক ৪৩ নম্বর লট গোলাবাড়ি আবাদ, ১২৯ নম্বর লর্ড স্টার ভাঙ্গি আবাদ, ১৩০ নাম্বার লট রামচাঁদ খালি আবাদ এই তিনটি স্থানকে পুনঃদখল করে সরকার নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলিকে সুরক্ষিত করে রাখতে চাইছিল। তবে ১৮৬২ সালে আলোচনার পর সরকার লটগুলিকে পুনরায় পূর্বতন জমিদারদের ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথম দিকে এটা প্রস্তাবিত ছিল যে, মিস্টার

রেইলি (Reilly)-এর নেতৃত্বে বা নির্দেশে সমগ্র প্রকল্পটি অভিষ্ট লক্ষ্য পূরণের পথে এগিয়ে যাবে। পরবর্তীতে ১৮৫৬ সালে ভারত সরকার সমগ্র স্কিম বা পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়িত করতে মিস্টার লিওনার্ডকে (Leonard) নিয়োগ করেন এবং স্বাধীনভাবে সমস্ত কার্য পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেন তাঁর হাতে। লিওনার্ড-এর নির্দেশ অনুযায়ী ৫০ ও ৫৪ নাম্বার লটের পরিষ্কার কার্য দ্রুত গতিতে চলতে থাকে।[৪৬] তবে মাতলা তীরের লটগুলি দখল, কলকাতার পরিপূরক বন্দর ও তার প্রয়োজনে রেলপথ, পৌরসভা টাউন এইসব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু হয়েছিল লর্ড ডালহৌসির সময়ে। এরপর শাসক হিসাবে আসেন লর্ড ক্যানিং। তিনি কলকাতা বন্দরের পরিপূরক হিসাবে মাতলা বন্দর নির্মাণের ধরণাটিকে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি বা সুনজরে দেখেনি। তবে জনশ্রুতি আছে মাতলা নাকি লেডি ক্যানিং-এর নৈসগির্ক প্রকৃতি অঙ্কনের প্রিয় জায়গা ছিল। ফলে সমর্থন যে একেবারেই ছিল না একথা বলা যায় না। ফলস্বরূপ ১৮৫৮ সাল থেকে বন্দরের কাজ পূর্ণমাত্রায় শুরু হয়ে যায় “The establishment of the port was begun about 1858, and it was called Port Canning.”[৪৭] বন্দর স্থাপনের দায়িত্ব পড়েছিল কলকাতার মেসার্স ‘বোরোডেইল-শিলার অ্যান্ড কোম্পানি’র উপর।

এই সময়েই কলকাতা থেকে মাতলা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। ৩০ মাইল দূরত্বের এই রেলপথই ছিল ভারতের প্রথম সরকারি মালিকানাধীন রেলপথ।[৪৮] তবে রেলপথ তৈরীর সিদ্ধান্ত এক বড়ো-ধরনের বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছিল। রেলপথ নাকি ক্যানেল, মাতলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহে কোনোটি সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত হবে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা বা বিবাদ হয়েছিল।

১৮৫৩ সালের ২৫শে আগস্ট ভারত সরকারের কন্সাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার এবং পূর্ত বিভাগের সেক্রেটারি কর্নেল ডব্লিউ. ই. বেকারকে এক রিপোর্ট-এর মাধ্যমে রেলওয়ে তৈরীর

সিদ্ধান্তের উপর জোর দিতে দেখা যায়, "the perfect practicability of establishing a connection between Calcutta and the head of the Mutlah, by means either of railway or a ship canal, the country being perfectly flat and free from all impediments, except such as arise from water courses and from natural and artificial inundation."[৪৯] কর্নেল বেকার উল্লেখ করেছিলেন যে বড়ো-ধরনের জাহাজ আসার জন্য বড়ো-ধরনের ক্যানেলের প্রয়োজন হয়। যেটি তৈরীর জন্য বেকারের অনুমান অনুযায়ী ১৪ লক্ষ পাউন্ডের বেশি অর্থের প্রয়োজন ছিল এবং এই অর্থের পুরোটাই কোনো প্রকার অর্থাগমনের পূর্বেই ব্যয় করার কথা ভাবা হয়েছিল। যেখানে রেললাইন তৈরীর জন্য ব্যয়িত অর্থ যেমন কম ছিল তেমনি গড়িয়া অবধি এর প্রথম যাত্রা শুরু হলে ব্যয় করা অর্থের অনেকটা উঠে আসত। এছাড়া নির্মাণ কার্য্যের সময় নিয়েও তুলনামূলক দৃষ্টিপাত করেন কর্নেল বেকার। তিনি তাঁর রিপোর্ট-এ উল্লেখ করেন "I would not venture to estimate the time likely to be occupied in the excavation of 32 mile of canal through 22 feet of saturated soil requiring to be kept dry by artificial means, and in the construction of the massive works required at either extremity"[৫০] এই ধরনের কাজে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পুঁজি থেকে লাভজনক বিনিয়োগের প্ররোচনা, পরামর্শ হিসাবে প্রচার করা হয়। অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্যারান্টির যে শর্তগুলি শেয়ার হোল্ডারদের দেওয়া হয়েছিল সেগুলি তাদের সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা হিসাবে কাজ করবে। পুঁজিপতিরা রেলপথের উপর যে বিনিয়োগ করেছিল তার থেকে লাভবান হবে এতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিছুটা এই কারণেই কলকাতা থেকে মাতলা পর্যন্ত শিপ ক্যানেল তৈরীর ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের মত ছিল না।[৫১] কর্নেল বেকার বলেছিলেন, "I have no hesitation in stating my preference for the railway"[৫২] তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়ান

রেলওয়ে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর. এম. স্টিফেন্সনকে (R. M. Stephenson) লেখা এক চিঠিতে ব্রুদেল অ্যান্ড কোম্পানির কর্ণধার জন ব্রুদেল উল্লেখ করেন যে, "Opening of matlah and formation of railways would help to export cargo of rice for the straits"[৫৩] ব্রুদেল আরও উল্লেখ করেন তাঁর এই মত আরও অনেক কোম্পানিরও পছন্দ হয়েছে যেমন- মেসার্স আল্যন ডেফেল অ্যান্ড কোম্পানি (Messrs, Allen Defell and Company), স্কোয়েম কিলবারন অ্যান্ড কোম্পানি (Schoeme Kilburn & Co.), ম্যাকিলপ স্টেওাট অ্যান্ড কোম্পানি (Mackillop Stewart and Co.)। এইসব কোম্পানিগুলি রেলওয়ে নির্মাণের কাজে বিনিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। ব্রুদেল উপলব্ধি করেন যে, "... if your powerfull company were to amalgamate as one the proposed Railway line from 'Mutlah' to Calcutta with their other line, now in course of construction, thus co-operating with those parties who are most anxious to see fresh outlet opened to the growing trade of Bengal, this not only would tend to accomplish quickly the object aimed at, but likewise prove of great benefit to the Railway enterprises of India generat as it would give a new, and we believe, unprecedented stimulus to the relations of this empire with the mother country"[৫৪] যাইহোক উপরে উল্লেখিত রেলপথ এবং ক্যানেল তৈরীর তুলানমূলক আলোচনার সারসংক্ষেপ করলে এটা বোঝায় যে, প্রথমত, ক্যানেল তৈরীর আনুমানিক ব্যয় ছিল ১৪ লক্ষ পাউন্ড, অপরদিকে একক লাইন (single line) বিশিষ্ট রেলপথ তৈরীতে খরচ ধরা হয়েছিল আনুমানিক দুই লক্ষ আশি হাজার পাউন্ড। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে ক্যানেল তৈরীর সময় নির্ধারণ সঠিকভাবে করা অসম্ভব, তবে কোনো প্রকার প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়া রেলপথ তৈরীর সময় ধরা হয়েছিল দুই বছর।

তৃতীয়ত, ক্যানেল তৈরীর উদ্দেশ্য যেমন যথার্থ ছিল না তেমনি এর তৈরীর সময়কাল নিয়েও সংশয় ছিল প্রচুর। এছাড়া মাতলা পোর্ট-এর উন্নতি এবং কলকাতার সাথে এর আন্তঃযোগাযোগ সহজ হয়ে গেলে ক্যানেল তৈরীর উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যাবে। এভাবে রেলপথ থেকে চারগুণ অর্থ ব্যয়ে তৈরী করা ক্যানেল একটিমাত্র উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারে তা'হল আন্তঃযোগাযোগ সেটিও আবার দ্রুততাহীন এবং স্বচ্ছন্দহীনভাবে। অন্যদিকে রেলপথ যদি তার সব লাইন খুলে দেয় তাহলে এর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে তৈরীর সময়ের ব্যায়িত অর্থ উঠে যাবে এবং ক্যানেল অপেক্ষা গতি সম্পন্ন হবে ও সাধারণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাবে। এইসব কিছুকে মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, শিপ ক্যানেল অপেক্ষা রেললাইন তৈরীর পরিকল্পনা সর্বপ্রকার সুবিধা দান করবে। অনেকের অনুমান অনুযায়ী রেলপথ নির্মাণ, ক্যানেল নির্মাণ প্রকল্পের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী পরিকল্পনা ছিল। মিস্টার লংগ্রিজ (একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, যাকে কলকাতা এবং সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে কোম্পানির পরিচালকবর্গ মাতলা রেল লাইনের রুট সার্ভের জন্য ভারতে পাঠিয়েছিলেন) তাঁর রিপোর্টে মাতলা পোর্ট-এর অধীনে রেলপথের সম্ভাব্য সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। মাতলার সহায়ক বন্দরের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আমদানি-রপ্তানীর ক্ষেত্র ছিল এই অঞ্চল, যাকে ভারতের ভবিষ্যত রেলপথ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা সম্ভব হবে। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা হিসাবের মাধ্যমে রেললাইনের সাম্ভাব্য লভ্যংশের পরিমাণও তুলে ধরেছিলেন।

1st. Mutlah line per se.....dividend 9.93 percent.

2nd. ,, during first phase of Port ..15.16 ,,

3rd. ,, ,, second ,, 14.12 ,,

4th. ,, ,, third ,, 21.75 ,,[৫৫]

উপরোক্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী এটা মনে করা যায় যে, মাতলা পোর্ট-এর বিকাশের সাথে সাথে রেললাইনের লভ্যাংশেরও বৃদ্ধি ঘটেছিল। কলকাতার পশ্চিমদিকের জেলাগুলির মত এখানে যানবাহনের চাহিদা বেড়েছিল। মাতলার আশপাশের অঞ্চলগুলির জঙ্গল পরিষ্কারের ফলে চাল, চিনি, পাট প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতে থাকে। কলকাতার চাহিদা মিটিয়ে এইসব দ্রব্যগুলিকে আবার রপ্তানির জন্য পাঠানো হত। তবে দুই বন্দরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্রাপ্ত দ্রব্যাদি এবং সরবরাহ মূল্যের পরিমাণ এই চাহিদাকে প্রভাবিত করত। রেলপথের দ্বারা দুই বন্দরের মধ্যে পণ্য সরবরাহের খরচ পড়ত ১৪ আনা প্রতি টন। সিল্ক, লাক্ষা, জতু, সূর্যমুখী, চামড়া এবং চিনি প্রভৃতি দ্রব্যাদি যত্নসহকারে বাছাই করে কলকাতাতে পাঠানো হত। পাটনাই চাল প্রধানত উৎপাদিত হত দুই বন্দরের মধ্যবর্তী দুই চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে এবং সেখান থেকে ছোটো-ছোটো বোট এবং গরুর গাড়িতে করে তুলনামূলকভাবে কম মূল্যে কলকাতাতে সরবরাহ করা হত। সেখান থেকে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে রপ্তানি করা হত। এছাড়া কলকাতাবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন নোনা জলের মাছ, পোল্ট্রি, ফলমূল-সবজি প্রভৃতি রেলপথের মাধ্যমে গ্রাম থেকে কলকাতার বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করা হত। আর এইসব দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিল রেলের তৃতীয় শ্রেণির সাধারণ মানুষ যারা গ্রামের বিভিন্ন বাজার থেকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে কলকাতার বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে যেমন লাভবান হত তেমনি স্বল্পমূল্যে জীবন ধারণের সামগ্রী পেয়ে কলকাতাবাসীও উপকৃত হত।

ভারতের মধ্যে এর আগে আর কোনো রেলপথ তৈরীতে শেয়ারহোল্ডাররা এতটা আগ্রহ দেখায়নি যতটা মাতলা রেলপথ তৈরীতে দেখিয়েছিল। কারণ কলকাতা ও মাতলার মধ্যবর্তী টার্মিনাল হওয়ায় এর আশে পাশের অঞ্চলগুলির থেকে ব্যবসায়িক সুবিধা ভোগ করা যাবে। তাছাড়া মাতলা থেকে রেললাইন তৈরীর পরিণতি হিসাবে কমপক্ষে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের

কথা সবাই স্বীকার করেছিল যে প্রথমত, সুবিশাল জাহাজগুলির জন্য নিরাপদ এবং উপযোগী বন্দর হিসাবে গড়ে উঠতে মাতলা নদীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়ত, এর ফলে সুন্দরবনের একটি বৃহৎ অংশকে সুগভীর বনাঞ্চল থেকে মুক্ত করে মানুষের বসবাস ও চাষবাসের জেলায় পরিণত করা যাবে। প্রথম দিকে এর সুবিধা ভোগ করেছিল বিশেষ করে ব্যবসায়ী শ্রেণির লোকেরা কিন্তু পরবর্তীতে এই রেলপথ প্রভাবিত করেছিল সাধারণ মানুষ এবং রাজ্য রাজস্ব বিভাগকে। এভাবে রেলপথ নির্মাণের সবরকম বাদানুবাদের অবসান ঘটিয়ে ১৮৬২ সালে 'ক্যালকাটা অ্যান্ড সাউথ ইস্টার্ন (গ্যারান্টিড) রেলওয়ে' নামক এক বেসরকারি কোম্পানি রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিল। প্রথম পর্বে ১৬ মাইল রেলপথের কাজ শেষ করে ১৮৬২ সালের ২রা জানুয়ারি বালিগঞ্জ, গড়িয়া, সোনারপুর হয়ে চাম্পাহাটি পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ৬ কামরার রেলগাড়ি চালানো শুরু হয়েছিল। এরপর ১৮৬৩ সালের ১৫ই মে এটি ক্যানিং পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল। কিন্তু পোর্ট ক্যানিং-এর ব্যর্থতা রেলপথকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। ১৮৬৬ সালে ভারতের মধ্যে কোম্পানির পরিচালনায় যেসব রেলপথ পরিচালিত হত তার মধ্যে মাতলা রেলপথ থেকে কোম্পানির লাভের পরিমাণ ছিল শূন্য। ফলস্বরূপ রেলপথ বিক্রি করে দিয়েছিল কোম্পানি। ১৮৬৮ সালে সরকার এটিকে গ্রহণ করেছিল।[৫৬] সরকার কর্তৃক রেলপথ অধিগ্রহণের পর ১৮৭৩ সাল থেকে এর নাম হয়েছিল 'ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে'। এই-সময় পর্যন্ত ক্যানিং রেলস্টেশনের নাম ছিল মাতলা স্টেশন। পরবর্তীতে ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং-এর নাম অনুসারে এর সর্বশেষ স্টেশনটির নাম রাখা হয়েছিল ক্যানিং। এইভাবে 'মাতলা' পুরোপুরি 'ক্যানিং' হয়ে উঠেছিল।

এভাবে শহর তৈরীর কাজ এগিয়ে চললেও নানাপ্রকার বিফলতায় শহর তৈরীর কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এমতাবস্থায় ১৮৬০ সাল থেকে সরকারি সম্পত্তির যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সুন্দরবন কমিশনার। তাঁর নির্দেশে জঙ্গল পরিষ্কার, ধান উৎপাদকের

হাতে জমি ইজারা দেওয়া, ক্রমাগত মেরামতের দ্বারা নদী বাঁধ ঠিক রাখা এবং শহরের নাগরিকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের কাজকর্ম চলতে থাকে। ১৮৬০ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত মাতলা লটের পরিষ্কারের খরচ ৩৮০০০ পাউন্ড হবে ধরে নিয়ে সরকারি স্তরে 'মাতলা টাউন ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড' নামে একটি অর্থভাণ্ডার তৈরী করা হয়েছিল। ১৮৬৪ সালে সুন্দরবন কমিশনার সি. পি. ক্যাস্পারাজ (Caspersz) ৫৪ নম্বর লটের বিস্তারিত বিবরণ সহ একটি মানচিত্র সরকারের কাছে জমা দিয়েছিলেন।[৫৭]

১৮৬২ সালের জুন মাসে ১৮৫০ সালের আইনানুসারে (Act No. XXVI of 1850) পোর্ট ক্যানিং টাউন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত পূর্বোল্লিখিত ৬৫০ একর জমিতে শহর নির্মাণের জন্য 'পোর্ট ক্যানিং মিউনিসিপ্যালিটি' গঠিত হয়েছিল। মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল শহর ও স্টেশনের শ্রীবৃদ্ধি, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, সদর রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা এবং নিকাশি ব্যবস্থার মত বিষয়গুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা।[৫৮] শুনতে অবাক লাগলেও 'পোর্ট ক্যানিং মিউনিসিপ্যালিটি' ছিল সমগ্র চব্বিশ পরগনা জেলার প্রথম পৌরসভা। এই-সময় শহর তৈরী ও তার উন্নয়ন, জাহাজ বন্দর, থানা, রেলপথ ও পৌরসভা প্রায় একই সময়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাতারাতি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৫৭ সালের শেষ কিংবা ১৮৫৮ সালের প্রথম দিকে মাতলা থানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে ১৮৬৩ সালের ২০ই এপ্রিল মাতলা থানার নাম পরিবর্তিত হয়ে 'ক্যানিং থানা' নামে চিহ্নিত হয়েছিল। মাতলা নদীর পশ্চিম তীরের অনেকটা জমি আগে থেকেই শহরের জন্য সংরক্ষিত ছিল, তবে জমির বাকি অংশে চাষাবাদ হত। সরকার ১৮৫৮ ও ১৮৫৯ সালে সাধারণ নিলাম ডেকে টাউন লটের লিজ হোল্ড রাইট বিক্রি করে দিয়েছিল। শর্ত ছিল এই জমি ভোগ করার জন্য ৬০ বছর পর্যন্ত বছরে বিঘা প্রতি ৮ টাকা থেকে ২০ টাকা হারে খাজনা বাড়াতে হবে। ১৮৬২ সালে মিউনিসিপ্যালিটি তৈরী হলে সরকার এই জমিগুলির যাবতীয় আয় ও অন্যান্য দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটির হাতে তুলে

দিয়েছিল। এরপর থেকে শহরের উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছিল মিউনিসিপ্যাল কমিশনার।[৫৯] পোর্ট ক্যানিং পৌরসভার প্রথম কমিশনারবৃন্দ ছিলেন চব্বিশ পরগনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এইচ. লিওনার্দো, সি. পি. কাসপার্স, ই. ডি. কিলবার্ন, ফার্দিনান্দ শিলার ও বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ। প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনার ভি. এইচ. শ্যালাশ পরবর্তীতে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রধানত এরা সবাই ছিলেন নতুন বন্দর তৈরী পক্ষে থাকা বণিক সম্প্রদায়। এদের মধ্যে ফার্দিনান্দ শিলার ছিলেন ভাইস-চেয়ারম্যান। ১৮৬৩ সালে ক্যানিং শহর তৈরীর জন্য সরকারি সম্পত্তির সমস্ত রকম অধিকার প্রদান করা হয়েছিল মিউনিসিপ্যালিটি ট্রাস্ট এর উপর। মিউনিসিপ্যালিটি তার আয়ের উৎস হিসাবে ভাড়া নেওয়া, লিজ বিক্রির মত পদ্ধতির মাধ্যমে পৌরসভার তহবিলে অর্থ সঞ্চয় করতে শুরু করেছিল। এছাড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী শহর ও বন্দরের সুবিধার জন্য জমির সমস্যাগুলির নিষ্পত্তি করতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বা সর্বসাধারনের উন্নতির উদ্দেশ্যে যেমন, রাস্তা বা ট্যাংক তৈরী, রেলপথ সম্প্রসারণ, জাহাজ ঘাটা অথবা জেটি নির্মাণ এবং সরকারি অফিস বা প্রতিরক্ষা কাজে কমিশনের প্রয়োজন হতে পারে এমন কোনো জমি তার পূর্বতন দখলদারের কাছ থেকে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ ছাড়াই কিনে নিতে পারবে।[৬০]

১৮৬৩ সালের জুন মাসে নিশ্চিতভাবেই ট্রাস্টটি গড়ে উঠেছিল এবং পূর্ববর্তী শর্তসাপেক্ষে জমিগুলিকে ফ্রী হোল্ড মেয়াদে চিরস্থায়ীভাবে দেওয়ার জন্য একটি চুক্তি তৈরী হয়েছিল। জমির নিরাপত্তা হিসাবে টাকা সংগ্রহ এবং লিজ দেওয়ার ব্যাপারে কমিশনারের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইন তৈরী হয়েছিল। তবে সরকার নিজে থেকে কোনো প্রকার ঋণ দিতে রাজি ছিল না। ১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারি কমিশনার 'মাতলা টাউন ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ডের' অর্থ সংগ্রহের জন্য টাউন ল্যান্ডের কিছু জমি বিক্রয় করেছিল এবং কিছু জমি বন্ধক দিয়ে পূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে শহর তৈরীর কাজ পরিচালনা করতে শুরু করেছিল। এরপর জমি ভরাট,

পুকুর খনন, রাস্তাঘাট তৈরী, নদীর সম্মুখভাগ রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেন তৈরী ও অন্যান্য কাজে ২০০০০০ পাউন্ড অর্থ ব্যয়িত হবে এই অনুমান করে ১৮৬৩ সালের নভেম্বরে মিউনিসিপ্যালিটি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সরকারের অনুমোদন নিয়ে একটি ফান্ড তৈরী করে, যেখান থেকে ১০০০০০ পাউন্ড পাবলিক লোন-ডিবেঞ্চার ছাড়া হয়েছিল। সেটির সুদের হার ছিল সাড়ে ৫ শতাংশ এবং পাঁচ বছরের ছাড়। কিন্তু জনগণের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ না থাকায় কেবলমাত্র ২৬৫০০ পাউন্ড অর্থের শেয়ার বিক্রি হয়েছিল। তাই ১৮৬৪ সালে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার সরকারের কাছে ৪৫০০০ পাউন্ড ঋণের দাবি করে, যেটি সরকার দিতে রাজি হয়নি। সরকার চেয়েছিল শহর তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় ২০০০০০ পাউন্ড অর্থ বণিক সম্প্রদায়গুলি একযোগে দান করুক।[৬১] ঠিক এই রকম সংকটময় পরিস্থিতিতে 'পোর্ট ক্যানিং মিউনিসিপ্যালিটির' ভাইস চেয়ারম্যান এবং বোরোডেইল-শিলার অ্যান্ড কোম্পানির অন্যতম অংশীদার মিস্টার ফার্দিনান্দ শিলার একজন প্রকৃত রক্ষাকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বন্দর উন্নয়নের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ এবং মাতলা তীরবর্তী জলাজমি ক্রয় ও পুনরুদ্ধারের উদ্দশ্যে শিলার এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগি ১৮৬৪ সালের শেষের দিকে 'পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, রেক্লামেশন অ্যান্ড ডক কোম্পানি লিমিটেড' নামে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৬২] নবগঠিত এই কোম্পানি ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে কিছু বিশেষ শর্তে, কিছু সুবিধা লাভের বিনিময়ে মিউনিসিপ্যালিটিকে অগ্রিম ২৫০০০ পাউন্ড অর্থ ঋণ হিসাবে প্রদান করতে চেয়েছিল। শর্তগুলি ছিল মিউনিসিপ্যালিটি কোম্পানিকে শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে ১০০ একর নিষ্কর জমি (Free hold land) উপহার হিসাবে প্রদান করবে। এছাড়া কমিশনারের নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে বন্দর এলাকায় গুদামঘর, ট্রামপথ, পারঘাটা, অবতরণ ও বহির্গমনের জন্য জেটি নির্মাণের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করবে। এইসব সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে ৫০ বছরের শুল্ক আদায়ের অধিকার পাবে।[৬৩]

এইসবের বিনিময়ে মিস্টার শিলার এবং তাঁর কোম্পানি আরও কিছু সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব মিউনিসিপ্যালিটিকে দিয়েছিলেন। যেমন,

- বরাদ্দ জমির উপর ২ বছরের মধ্যে ২৫০০ ফুট গভীর বোট-ডক নির্মাণ করা।
- মাতলার সম্মুখস্থ কমিশনারের সমস্ত সম্পত্তি নদী বাঁধের মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং রক্ষার ব্যবস্থা করা।
- ১০ শতাংশের বেশি যেসব কাজ হয়ে গেছে সেখান থেকে লাভের এক-তৃতীয়াংশ কমিশনকে প্রদান করা। তবে ৫০ বছর পর সম্পূর্ণ হওয়া কাজগুলি প্রকৃত মূল্যে ক্রয় করার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে মিউনিসিপ্যালিটির হাতে। আর যে কাজগুলি সম্পূর্ণ হবে না তার জন্য নির্ধারিত মেয়াদ আরও ২৫ বছর বাড়াতে হবে।

সরকার, কোম্পানির এই শর্তগুলিকে মেনে নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটিকে ২৫০০০ পাউন্ড ঋণ গ্রহণের সম্মতি দিয়েছিল।[৬৪] মিস্টার ফার্দিনান্দ শিলার (Ferdinand Schiller) আরও কয়েকটি প্রস্তাব রেখেছিলেন সরকারের কাছে যেমন, ক্যানিংকে হেডকোয়ার্টার করে সুন্দরবনকে একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে গড়ে তোলা, বারুইপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে সরিয়ে সুন্দরবন কমিশনারকে নবগঠিত জেলার দায়িত্ব প্রদান করা, এছাড়াও কিছু সংখ্যক সরকারি দোকান কলকাতায় থেকে ক্যানিংয়ে পাঠানো।[৬৫] তবে সরকার শিলারের এই প্রস্তাবগুলিকে অযৌক্তিক বিবেচনায় কর্ণপাত করেনি।

শিলার-এর প্রস্তাবিত এই প্রস্তাবগুলি বর্তমানে এসে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ভাবলে অবাক হতে হয়, বর্তমানে সুন্দরবনকে পৃথক জেলা তৈরীর যে স্বপ্ন জাগ্রত হয়েছে সেটি আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে শিলারই প্রথম দেখেছিল। এটা ঠিক যে পরিকল্পিত পথে যদি বন্দরের সাফল্য আসত, তাহলে ক্যানিং-এর সামগ্রিক পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন

ঘটে যেত এবং ফার্দিনান্দ শিলার বন্দর ও শহর ক্যানিং-এর একজন জব চার্নকের মর্যাদা লাভ করতেন।

মিস্টার শিলার-এর পরামর্শে কোম্পানি এবং মিউনিসিপ্যালিটি একসাথে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করতে শুরু করেছিল। কোম্পানি ১২১, ১২২, ১২৫, ১২৬ ও ১২৮ নাম্বার লটগুলো ক্রয় করেছিল এবং পারিশ্রমিক হিসাবে পেয়েছিল ১৩২ নাম্বার লটটি। এরপর ১৮৬৫ সালে ১২৩, ১২৭, ১২৯-১৩১, ১৩৩, ১৩৪ এবং ১৩৬ নাম্বার লটগুলির উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। কর্মসূচি রূপায়ণ করতে গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি দেখল কিছু অর্থের ঘাটতি পড়েছে। এরপর মিউনিসিপ্যালিটির পুনশ্চ আবেদনের ভিত্তিতে সরকার ১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে ৫ বছরের জন্য বিনা সুদে ৪৫০০০ পাউন্ড ঋণ মঞ্জুর করেছিল। অবশ্য এর জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে তাদের জমি ও সম্পত্তি, সরকারের কাছে সিকিউরিটি হিসাবে রাখতে হয়েছিল। ১৮৬৬ সালের এপ্রিলে ঋণপত্র মঞ্জুর হয়েছিল এবং ঋণপত্র কার্যকর করার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৮৬৮ সালের আগস্ট মাস থেকে। প্রয়োজনীয় অর্থ পেয়ে কোম্পানি ও পৌরসভা একযোগে জোরকদমে বন্দর তৈরীর কাজ শুরু করেছিল। কোম্পানি ও মিউনিসিপ্যালিটি আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে যেসব কাজ সম্পাদন করেছিল তা নিম্নরূপ :

১. দেশীয় নৌকা থাকার জন্য ৩৫০০×৪০০ ফুট ওয়েট ডক নির্মাণ।

২. মাতলা নদীর পূর্ব ভাগকে ভূমিক্ষয় এর হাত থেকে রক্ষা করা।

৩. সাতটি অবতরণ ঘাট এবং লোহার জেটি নির্মাণ, যেখানে একই সাথে দুটি জাহাজকে অবতরণ করা সম্ভব হয়।

৪. জেটির সাথে সম্পর্কিত পণ্যগুলির জন্য শেড ও ট্রামপথ।

৫. জাহাজগুলি মেরামতের জন্য একটি gridiron এবং graving ডক তৈরী।

৬. সর্বশেষে, বড়ো চালকল তৈরী যেটি বছরে প্রায় ৯০ হাজার টন ধান ঝাড়াই করে চাল তৈরী করতে সক্ষম ছিল। এই চালকল থেকে প্রচুর পরিমাণ লাভের সম্ভাবনা ছিল।[৬৬] শোনা যায় এই চালকল তখন এশিয়ার বৃহত্তম চালকল হিসাবে পরিগণিত ছিল এবং ক্যানিং বন্দরকে আর্থিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর করে তুলেছিল। পরবর্তীতে এ সকল কাজগুলির মধ্যে কিছু কাজ হতাশায় পরিণত হয়েছিল আবার কিছু সংখ্যক পরিকল্পনা অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়েছিল। তবে এই সমস্ত কাজের বেশিরভাগই প্রয়োজনের আগেই করা হয়েছিল। ফলে কোম্পানির ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু সেই অনুপাতে আয় ছিল সীমিত। যাইহোক কোম্পানির কাজের অগ্রগতি ও সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে ১৮৬৫ সালের জানুয়ারিতে যে পরিকল্পিত কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হয়েছিল তার উপর নির্ভর করে কোম্পানির শেয়ার মূল্য অসম্ভব হারে বেড়ে গিয়েছিল। ২০০ পাউন্ড-এর শেয়ার মূল্য কলকাতায় প্রায় ১০০০ পাউন্ড এবং মুম্বাইতে আরও বেশি ১২০০ পাউন্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে খুব শীঘ্রই শেয়ার যেমন দ্রুত বেড়েছিল তেমনি দ্রুত পড়েও গিয়েছিল। এই-সময় কোম্পানির ডিরেক্টর এবং শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে মতানৈক্য বাড়তে থাকে।[৬৭]

কোম্পানি এবং মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যেও বিতর্ক বা মতানৈক্য শুরু হয়েছিল। বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল, মিঃ শিলারের মাধ্যমে কোম্পানি, মিউনিসিপ্যালিটিকে যে ২৫০০০ পাউন্ড অর্থের ঋণ দিয়েছিল তার সুদের দাবিকে কেন্দ্র করে। কোম্পানির দেওয়া এই অর্থের বিনিময়ে মিউনিসিপ্যালিটিও কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান সহ কোম্পানিকে শহর এলাকায় সমমূল্যের কিছু জমি দিয়েছিল। কিন্তু দলিল ভুলের অজুহাতে কোম্পানি সেই জমি গ্রহণ করেনি। ১৮৬৮ সালে বিষয়টি যখন জটিল আকার ধারণ করেছিল তখন কোম্পানি তাদের

সবরকম লেনদেন বিচ্ছিন্ন করে মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে ২৭০০ পাউন্ড সুদের অর্থ দাবি করেছিল। মিউনিসিপ্যালিটি সেটি দিতে অস্বীকার করলে কোম্পানি কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা রুজু করেছিল। এই মামলায় কোম্পানি প্রথম দিকে নিজ দাবির অনুকুলে ডিক্রি পেলেও পরবর্তীতে মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাপিলের ভিত্তিতে তা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। ফলস্বরূপ কোম্পানি তাদের জমিস্বত্ব দখল করতে পারেনি।[৬৮]

এদিকে মিউনিসিপ্যালিটিও তাদের ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কোম্পানির সেক্রেটারি ১৮৭০ সালে পুনরায় মিউনিসিপ্যালিটি যে ঋণ নিয়েছিল সেটি পূরণ করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করেছিল। জবাবে ভারত সরকার কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করতে সম্মত ছিল না এবং ঋণ পরিশোধের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের ফান্ড দিতেও রাজি ছিল না। আবার ১৮৭১ সালের এপ্রিলে ১০০০০০ পাউন্ডের প্রথম সরকারি ঋণপত্রগুলির ম্যাচুরিটির সময় চলে এসেছিল, যেটি মিউনিসিপ্যালিটি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল। সরকার, মিউনিসিপ্যালিটির বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত ঋণপত্র ধারকদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বন্টন করে দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি নোটিশ পাঠায় এবং সমস্ত সম্পত্তি নিলামে তোলে।[৬৯]

এইসব পারস্পারিক দোষারোপ ও বিবাদের সঙ্গে আরও একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। তা'হল কলকাতার পরিপূরক বন্দর হিসাবে যে ক্যানিং বন্দর তৈরী হয়েছিল, যাকে ঘিরে এতসব মহাযজ্ঞের আয়োজন, সেই বন্দরে জাহাজ আগমনের সংখ্যা কমতে থাকে। ১৮৬১-৬২ সালে শুরু হওয়া বন্দরে সবচেয়ে বেশি জাহাজ এসেছিল ১৮৬৫-৬৭ এই দুই বছরে। ১৮৬১-

৬২ সালে শুরু হওয়া বন্দর এর সমাপ্তি ঘটে ১৮৭০-১৮৭১ সালে। এই দশ বছরের আয়ুষ্কালে ক্যানিং বন্দরে নোঙ্গর করা জাহাজের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

বছর	জাহাজের সংখ্যা
১৮৬১ – ৬২	০
১৮৬২ – ৬৩	১
১৮৬৩ – ৬৪	১১
১৮৬৪ – ৬৫	১৪
১৮৬৫ – ৬৬	২৬
১৮৬৬ – ৬৭	২০
১৮৬৭ – ৬৮	৯
১৮৬৮ – ৬৯	১
১৮৬৯ – ৭০	২
১৮৭০ – ৭১	০

৭০

সারণি: ২.১- ১৮৬১-১৮৭১ সাল অবধি ক্যানিং বন্দরে আগত জাহাজের পরিসংখ্যান।

১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত জাহাজ আসার সংখ্যা ঠিক ছিল। তবে ১৮৬৭ সালের ১লা নভেম্বর প্রলয়কারী সাইক্লোনের সঙ্গে মাতলা নদীর জলোচ্ছ্বাসে ক্যানিং শহরের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। ক্যানিং রেলস্টেশন, রেলওয়ে হোটেল ও কয়েকটি মাল-গুদাম ঝড়ের দাপটে উল্টে গিয়েছিল। পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির, মাল-গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত একটি পুরাতন জাহাজ ঝড় ও ঢেউয়ের আঘাতে জেটির একটা অংশকে সঙ্গে নিয়ে দূরে আছড়ে পড়েছিল। নোঙ্গর করা জাহাজগুলিও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সাইক্লোন থামলেই নাবিকরা

ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজগুলিকে নিয়ে ক্যানিং বন্দর ত্যাগ করেছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং নাবিকরা আশাহত হয়েছিল।[৭১] এইসমস্ত ঘটনার কারণ হেতু বন্দর পরিচালনায় কোম্পানি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এমতাবস্থায় ১৮৬৯ সালের মার্চ মাসে কোম্পানি সরকারের কাছে বন্দর কর এবং শুল্ক কমানোর জন্য আবেদন করেছিল। আবেদনের বিষয়বস্তু ছিল এইরকম যে, সরকার একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ক্যানিং বন্দরকে একটি মুক্ত বন্দর হিসাবে ঘোষণা করবে এবং ছয় মাস পর আবার একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুনরায় শুল্ক নির্ধারণ করবে। এই বিজ্ঞপ্তির কোনো প্রয়োজন হয়নি বা প্রভাব পড়েনি। কারণ ১৮৬৯-৭০ সালে শুধুমাত্র দুটি জাহাজ ক্যানিং বন্দরে এসেছিল। চালকলগুলির ব্যবসা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কোম্পানি তাদের সঙ্গে চার্টার চুক্তি করেছিল। এমনকি উপরে উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তির সুবিধাও দিয়েছিল। সবরকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকে কোনো সমুদ্রগামী জাহাজ এই বন্দরে আসেনি। তবে ১৮৬৭-৬৮ সালে বেশি সংখ্যক জাহাজ আসার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে এটাই ছিল কোম্পানি কর্তৃক বণিক সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করার শেষ চেষ্টা। এছাড়া সরকার কর্তৃক কলকাতার পরিপূরক বন্দর হিসাবে মাতলাকে প্রতিষ্ঠিত করার বিজ্ঞাপনের ফল হিসাবেও জাহাজের আগমন বেড়েছিল।[৭২]

এরপর ১৮৭০ সালের আগস্ট মাসে ‘পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট রিক্ল্যামেশন অ্যান্ড ডক কোম্পানি’ ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু শর্তে কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি এবং তার অধিকার স্থানান্তর ও বিক্রয় করে দিয়েছিল নতুন ‘পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড’কে। প্রথম অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বিশদে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে বন্দর স্থাপনা সরকারের জন্য একটি ভারী এবং অ-লাভজনক ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৬৯-৭০ সালে বন্দরটির পিছনে ব্যয় হয়েছিল ১৫৭০৯ পাউন্ড যেখানে প্রাপ্তি ছিল কেবল মাত্র ১১৩৪ পাউন্ড। কোম্পানির অবস্থান ও মাতলা বন্দরের ধারণক্ষমতা বিচার করে এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির আশাহীনতা বিবেচনা

করে সরকার ১৮৭১ সালের জুন মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্দরটিকে বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে মাঝে মাঝে পূর্বদিক থেকে আসা ছোটো জাহাজগুলি যাতে খারাপ আবহাওয়ার থেকে বাঁচতে নোঙ্গর করতে পারে এমন স্থাপনাগুলো বাদে আর সবগুলিকে গুটিয়ে নিয়েছিল। ১৮৭০ সালে ক্যানিং শহরের মোট বাসগৃহের সংখ্যা ছিল ৩৮৬টি এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ৭১৪ জন। ১৮৭১ সালে বন্দর পুরোপুরি বন্ধ হলে স্থানটি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল ('nearly deserted')।[৭৩] ১৮৭৩ সালের ১০ই এপ্রিল সুন্দরবন কমিশনার একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে বলেছিলেন যে, নতুন 'পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড কোম্পানি' দ্বারা নিযুক্ত এজেন্ট ও অন্যান্য কর্মচারী এবং একজন ডাকমুন্সী বা ডেপুটি পোস্টমাস্টার ব্যতীত ক্যানিংয়ে কেউ বাস করত না।[৭৪]

মাত্র ১০ বছর সময়কালের মধ্যেই ক্যানিং বন্দরের অন্তিম দশা ঘনিয়ে এসেছিল। আর বন্দর তৈরীর মাধ্যমে যেভাবে মাতলাকে শহর হিসাবে গড়ে তোলার সূচনা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই সরকার কর্তৃক বন্দরের কাজ বন্ধ হতেই শহর তৈরীর কাজেরও সমাপ্তি ঘটেছিল। এত গভীর উৎসাহ, সমারোহ ও আগ্রহ নিয়ে শুরু হওয়া বন্দর প্রকল্পটি কি কারণে শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, কেন সরকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল তার কয়েকটি কারণ এমন হতে পারে। কারণগুলি নিচে উল্লেখ করেছি:

- মাতলা কেবলমাত্র কলকাতা বন্দরের সহায়ক বন্দর ছিল। একে স্বাধীন বন্দর হিসাবে গড়ে তোলার মানসিকতা ছিল না। এর জন্য হয়তো আরও বেশি ভাবতে হত আরও বেশি সময় লাগত। তাই মাতলা বন্দর সব সময় একটি শাখা বন্দর হিসাবে থেকে গিয়েছিল। তাছাড়া রেলপথ ছাড়া অন্য কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা সেসময় গড়ে ওঠেনি এবং মাতলা বন্দর কলকাতার কাস্টম হাউজ গার্ডেন রিচ থেকে ভৌগোলিকভাবে বেশ দূরেই ছিল।
- মাতলা বন্দরের সমর্থক এবং প্রোমোটারদের মননে সবসময় রেলপথের ভাবনাই ছিল প্রকট বন্দর নয়। মাতলা বন্দরের মাধ্যমে যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে ভাবা হয়েছিল যেমন,

সময় ও জাহাজের ক্ষতি বাঁচানো এবং কলকাতা অপেক্ষা কম মূল্যে চাল সরবরাহ, এই সুবিধাগুলির সবকিছুই সম্ভব হয়েছিল রেলপথের মাধ্যমে। তাই প্রথম পরীক্ষামূলক রেল চালানোর পর আর বিশেষ কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন পড়েনি।

- এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কলকাতার বেশিরভাগ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি (Mercantile house) অন্যের এজেন্ট হিসাবে কাজ করত। সাধারণত এরা ঝুঁকির সময় নিজের পয়সা খরচ করে আমদানি ও রপ্তানি করতে প্রস্তুত থাকত না। তারা তাদের নিজস্ব স্বভাব পাল্টে মাতলার বিকাশে ঝুঁকি নিতে সম্মত ছিল না।[৭৫]
- মাতলা বন্দর বন্ধের পিছনে এর অস্বাস্থ্যকরতাকে অনেকে দায়ী করেছেন। তবে সব সময় নদীতে পড়ে থাকা জাহাজগুলির নাবিকদের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলছে। মাতলার তীরে সব সময় বসবাসকারী মিস্টার জেমস লংগ্রিজ (James Longridge)-এর অভিজ্ঞতা ছিল এইরূপ :

"এটা অস্বীকার করা অসত্য হবেনা যে বছরের একটি সময়ের জলবায়ু জ্বরের প্রকোপ নিয়ে আসে তবে এইরূপ অপরিষ্কৃত জঙ্গলে এটি একটি সাধারণ ঘটনা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। তবে নদীর উপরের অংশ যেখানে শহর ও নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরী হবে সেখানে এখন যে হারে জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ চলছে তাতে খুব দ্রুত এর জলবায়ুও উন্নত হবে এবং কোনো সন্দেহ নেই যদি রেলপথ চালু করা হবে এটা জানানো যায় তাহলে ৫০, ৫৪, ৪৯, ৪৮, ৪৩, ১২৮ এবং ১২৩ নং লটগুলি খুব দ্রুত পরিষ্কার করে কৃষিজমিতে পরিণত করা সম্ভব হবে।

মাতলা এবং কলকাতার মধ্যে অনেকগুলো অঞ্চল এখন পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর, যেগুলি কয়েক বছর আগে বিপরীত প্রকৃতির ছিল, যা দরকার তা'হল জঙ্গল পরিষ্কার করে উপরে উল্লেখিত লটগুলির চারিপাশে সামান্য বাঁধ নির্মাণ, যাতে লটগুলিকে ভরা-কটাল থেকে রক্ষা করা যায়; এভাবেই দেশটি উর্বর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে"।[৭৬]

এছাড়া ১৮৫৭ সালের ২রা নভেম্বর বন্দরের অধীক্ষক এইচ. লিওনার্ড, সরকারকে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল, সেখানেও অস্বাস্থ্যকরতার বিষয়ে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সরকারকে দেওয়া লিওনার্ডের প্রতিবেদনটি ছিল এমন:

"আমি মনে করি ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাস খুবই স্বাস্থ্যকর মাস, এপ্রিল মাসে স্থানীয়রা (যারা দেশীয় রায়ত নয় তাদেরও অন্যান্য যে-কোনো স্থানের বাঙ্গালীদের মত স্বাস্থ্যবান মনে হয়) জ্বরে আক্রান্ত হয়, যাদের মধ্যে খুব কম লোক মারা যায়, মে এবং জুন মাসে সবাই না হলেও বেশিরভাগ ইউরোপীয় জ্বরে আক্রান্ত হত। তবে সেখান থেকে কেউ মারা যেত বলে আমার ধারণা ছিল না এবং খুবই অসুস্থ হত এমন লোকের সংখ্যাও ছিল কম। স্থানীয় মানুষদের একটা বড়ো অংশের এই-সময় জ্বর হত। মে এবং জুন অপেক্ষা জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে তারা বেশি আসুস্থ হত, কিন্তু কিছু কিছু ইউরোপীয় ওই মাসগুলিতেও অসুস্থ থাকত। বর্তমানে আমাদের এখানে ৮০০ জন কর্মী রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে অসুস্থতাও খুবই কম। স্থানীয়রা যাদেরকে দেশের অন্য প্রান্ত থেকে এখানে আনা হয়েছিল, তারা ইউরোপীয়দের থেকেও বেশি আক্রান্ত হত। বাংলার অনেক জায়গায় তখন কলেরার প্রাদুর্ভাব কম ছিল। ইউরোপীয় ক্রুদের মধ্যে মৃত্যুর বিষয়ে আমি ততটা অবগত ছিলাম না, তবে মাতলাতে একজনের মৃত্যুর খবর শুনেছিলাম, তিনি শোকোমোক্সন (Shockomoxon) এর বাসিন্দা ছিলেন এবং এখানে আসার সময় অসুস্থ ছিলেন, তবে কলকাতায় এসে অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছে এমন পুরুষের কথা আমি শুনিনি"।[৭৭]

এটা ভাবা অসঙ্গত হবে না যে সুন্দরবনের মত লবণাক্ত অঞ্চলে বন্দর তৈরীর প্রথম দিকে মিষ্টি জলের অভাব কমবেশি সবাইকে ভুগিয়েছিল। তবে খুব শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধানও হয়েছিল। মাতলার আশেপাশের বাসিন্দাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সরকার নতুন শহরের নিকটে একটি দীঘি নির্মাণ করেছিল। বৃষ্টির জলে পুষ্ট এই দীঘি মিষ্টি জলের

সমস্যাকে মিটিয়েছিল। এটা কখনোই আশা করা যায় না যে, সদ্য জঙ্গল পরিষ্কার করে তৈরী মাতলা বন্দর কলকাতার মত স্বাস্থ্যকর হবে ও সব সুবিধা মেটাবে। এইসব অস্থায়ী অসুবিধাগুলো নিরসন করা সম্ভব শুধুমাত্র বাণিজ্যিক সুবিধা দানের মাধ্যমে। বাণিজ্যিক সুবিধা আছে আর অস্বাস্থ্যকরতার জন্য তার অগ্রগতি বন্ধ হয়েছে এমন কোনো বন্দর নেই। মাতলার প্রতিবেশী আরাকানের আকুয়াব (Akyab) বন্দর এটির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রতিষ্ঠার সময় এই বন্দর মাতলার থেকেও বেশী বিপজ্জনক ছিল কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আকুয়াব (Akyab) বন্দরের বাণিজ্য, জনসংখ্যা ও আবাদ দ্রুত বাড়তে শুরু করেছিল এবং শীঘ্রই তুলনামূলকভাবে এলাকাটি স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছিল।

উপরের বর্ণিত সব সমস্যাতত্ত্বকে পিছনে ফেলে দিয়েছিল মিস্টার জেমস লংগ্রিজ (James Longridge) এর বুদ্ধিদীপ্ত একটি অভিমত। তাঁর মতে কলকাতার স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে গিয়ে মাতলার ভবিষ্যতকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল।[৭৮] বন্দর শহর মাতলা ধ্বংসের সর্বশেষ কারণ শক্তিশেল সম মহা-ঘূর্ণিঝড় (সাইক্লোন)। মাতলা অঞ্চলটি সাইক্লোন প্রবণ অঞ্চল, এখানে প্রতিষ্ঠিত শহরতো সাইক্লোনে আক্রান্ত হবেই। হুগলি কমিটির সদস্য, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ ক্যালকাটার ভূতাত্ত্বিক মিস্টার. হেনরি. পিডিংটন (Piddington) মাতলা নদীর তীরে বন্দরকে কেন্দ্র করে শহর প্রতিষ্ঠার আগে ১৮৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল জেমস এন্ড্রু মারকুইস ডালহৌসিকে (James Andrew Marquis Dalhousie) একটি চিঠি লিখে সুন্দরবনের জলাভূমিতে ক্যানিং বন্দর তৈরীর কাজ এগিয়ে না নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদি নতুন বন্দর তৈরী হয় "প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে অবশ্যই এমন একটা দিন দেখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যখন হ্যারিকেনের ভয়াবহতার সাথে সাথে ঘূর্ণায়মান নোনাজলের এক ভয়ঙ্কর স্রোত তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে। ফলস্বরূপ খুব দ্রুততার সাথে সমস্ত উপনিবেশ ৫ থেকে ১৫ ফুট

গভীরতায় ডুবে যাবে।"[৭৯] সরকার তাঁর পরামর্শে কর্ণপাত করেনি সেদিন। তাঁর মৃত্যুর ৯ বছর এবং ভবিষ্যৎ বাণীর ১৪ বছর পর ১৮৬৭ সালের ১লা নভেম্বর আশঙ্কাকে সত্য করে মহাপ্রলয়কারী সাইক্লোন দক্ষিণবঙ্গে আছড়ে পড়েছিল এবং নতুন বন্দর শহর মাতলাকে তছনছ করে মাতলা শহরের ভাগ্যাকাশে নিয়ে এসেছিল অমানিশার অন্ধকার। এই ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে মাতলা বন্দরে আসা জাহাজের সংখ্যা কমতে শুরু করেছিল এবং ১৮৭০-১৮৭১ সালে আর কোনো জাহাজ না আসার কারণে সরকারিভাবে ১৮৭১ সালে মাতলা বন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

আসলে যে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে মাতলা নদীতে বন্দর তৈরীর পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল তার ভিত্তিভূমি কেবলমাত্র কতকগুলি মিথ 'Myth' ছাড়া অন্য কিছু নয়। সেই হুগলির চ্যানেলগুলি দিয়ে আজও বহাল তবিয়তে জাহাজ চলাচল করছে আর যাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এত বড়ো করে দেখানো হয়েছিল সেই মাতলার বুক আজ শুষ্ক প্রায়। পরবর্তীতে চেম্বার অফ কমার্স এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, হুগলি সম্পর্কে তাদের ভয় ছিল অতিরঞ্জিত এবং পোর্ট ক্যানিং-এর উপর আর অর্থ ও সময় নষ্ট না করে হুগলির উন্নতির জন্য ভালো কিছু করার পদক্ষেপ নিতে হবে। এরপর থেকে হুগলির চ্যানেলগুলির নাব্য অবস্থা বজায় রাখার জন্য উন্নত প্রযুক্তি এবং হাইড্রোলিক স্কিল ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল। তাই ক্যানিং বন্দর তৈরীর মাধ্যমে যেভাবে শহর তৈরীর সূচনা হয়েছিল, গড়ে উঠেছিল রেলপথ ও পৌরসভা, বন্দর ধ্বংসের সাথে সাথে সমাপ্তি ঘটেছিল তাদেরও। বর্তমানে সেই সকল সমাপ্ত প্রকল্পগুলির কিছু চিহ্ন আজ অবশিষ্ট আছে, আর অর্ধসমাপ্ত প্রকল্পগুলি মিশে গেছে মাটির সাথে, প্রমাণ বলতে আছে কেবল মাত্র কিছু সরকারি দলিল ও নথিপত্র। বন্দর বিলীন হয়েছে, পৌরসভা স্থান নিয়েছে স্মৃতিপটে, শুধুমাত্র রেলপথকে আশ্রয় করে ক্যানিং আজও তার অধরা স্বপ্নকে খুঁজে চলেছে।

তথ্যসূত্র:

১। সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত (কলিকাতা: দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯২২), ২০৩–২০৪।

২। J. J. A. Campos, History of the Portuguese in Bengal (Calcutta: Butter Worth & Co. (India) LTD, 1919), 47.

"Frank is the parent word of Fringhi by which name the India-Born Portuguese aer still known. The Arabs and Persians Called the French crusaders Frank, Ferang, a corruption of France when the Portuguese and other Europeans came to India, the Arabs applied to them the same name Ferong, and then Feringi."

৩। বিনয় ঘোষ, বাদশাহী আমল, (কলিকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:, প্রথম সংস্করণ ৭ই চৈত্র ১৮৭৯শকাব্দ), ৭৬-৭৭।

৪। W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, vol-1, District of the 24 Parganas and Sundarbans (London: Trubner & co., 1875), 18; L. S. S. O'Malley, Bengal Disrtict Gazetteers, 24-Parganans (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot., 1914), 44.

৫। Annual Progress Report of Forest Administration (India office Library, London, hereafter cited as PRF) for 1867-68, Calcutta 1869; Taken from Ranjan Chakrabarti, "Local People and The Global Tiger, An Environmental History of the Sundarbans" Global Environment 3(2009), 72-95. http;//W.W.W.enviromentandsociety.org/node/4614; কমল চৌধুরী, চব্বিশ পরগনা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৯), ৫৬।

৬। Nilmani Mukharjee, The Port of Calcutta, A Short History (Calcutta: The Commissioners for the Port of Calcutta, 1968), 9.

৭। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 92.

"The first step towards creating a town and municipality on the Matla appears to have been made in 1853, when in consequence of the deterioration of the

navigation of the Hugli, which it was feared at that time was rapidly closing, the Chamber of Commerce addressed Government on the necessity of providing an auxiliary shipping port on the Matla, and opening communication with Calcutta by means of railway or canal."

৮। Paper relating to the formation of Port Canning on the Matla River, extending from 27 may 1853 to 11 march 1865, Calcutta,1865.

৯। A. K. Roy, Census of India, 1901, Vol-VII, Calcutta, Town and Suburbs, Part-I, A Short History of Calcutta (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902), 11.

১০। Sudipta Sen, Empire of Free Trade: East Indian Company and The Making of the Colonial Market Place Critical History (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1998), P-

১১। Tai-Yong Tang, Port Cities and Hinterlands: A Comparative Study of Singapore and Calcutta, Political Geography, 26/2007, 851-865, taken from w.w.w.elsevier.com/locate/pol-geo.

১২। P. Banerjee, Calcutta and its Hinterland: A Studay of Economic History of India, 1833-1900, (Calcutta, Progressive Publishers, 1975) 1.

১৩। Mukherjee, The Port of Calcutta, 18-19.

১৪। Frederick Eden Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans From 1765 to 1870 (Alipore: Bengal Government Press, 1934), 108; Mukherjee, The Port of Calcutta, 24.

১৫। Bhaskar Chakraborty, Entrenchment of Colonialism, in Satyesh Chakraborty ed. 'Port of Calcutta 125 Years, 1870-1995' (Kolkata: Calcutta Port Trust, 1995), 15.

১৬। Chakraborty, Entrenchment of Colonialism, 16.

১৭। The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta: Its Progress and Prospect, (Calcutta: Published Under the Auspices of the Mutlah Association, 1858), 2.

১৮। West Bengal State Archive, General Proceedings, November, 1864, Proceeding No. 103.

১৯। The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta, 3.

“I am directed by the Committee of the Bengal Chamber of Commerce to solicit the favor of your bringing to the notice of the Most Noble the Governor of Bengal, the difficult and dangerous state of the navigation of the River Hooghly, which threatens, at no distant period, to render access to the Port of Calcutta altogether impracticable for any vessels but those of the smallest tonnage.

During the present season, the depth of water on the James and Mary’s, in Lloyd’s Channel, and on the Gaspar Sand, has been less than ever previously known, and for many weeks past, Pilots have not felt themselves warranted in moving ships of more than 500 tons burthen without stream, during which time the towing steamers of the port have consequently been so fully employed, that many outward-bound vessels, loaded and ready for sea, have been detained from a fortnight to three weeks, unable to proceed on their voyages.

At the present time several vessels in this position have no prospect of getting to sea until the beginning of July.

It is the opinion of most nautical men, well acquainted with the River Hooghly, that these serious impediments to its navigation are progressive and inevitable from the form of the river, its soil, and the nature of its tides, and that they are beyond the reach of removal by any engineering skill.

The Committee of the Bengal Chamber of Commerce beg therefore to submit, for the consideration of the Most Noble the Governor of Bengal, the very great importance of endeavoring to open a new communication from the sea to this port by some new channel, and most respectfully to call his attention to the practicability of this object by means of the Mutlah River.

The entrance to the Mutlah River is about 50 miles to the eastward of the Hooghly, to be approached from the sea without any material difficulties of

navigation. At the distance of 23 miles from its mouths, it has a goog sheltered anchorage for vessels of the largest burthen. Its tides never run more than from 3 to 4 miles an hour, and the flood-tide is never accompanied by a bore. It has, in the shallowest part, 3 ½ fathoms throughout its course from the sea to within 25 miles of Calcutta, thus offering facilities for navigation superior to those that ever existed in the Hooghly.

Within the distance of 25 miles from Calcutta, the Mutlah, although navigable, winds considerably, and becomes narrower; the country, however, in this intervening space, is believed to be very favorable for the formation either of a Railroad or Canal, by means of which the communication could be continued to Calcutta, and every facility afforded for the conduct of the commerce of the place. It is the earnest request of the Committee, that the Most Noble the Governor of the Bengal will order a survey to be made of the Mutlah River, its approaches from the sea, and the country intervening between it and Calcutta, in order that, should the survey so obtained give confirmation to the views expressed above by the Committee of its navigable advantages over the River Hooghly, the subject may be further taken into His Lordship's favorable consideration. The will soon be setting in, and as the rivers are now at their lowest, the Committee beg to point out that this is the most opportune time for a survey, and also that it will very soon have passed away.

Viewing the question as on not only of local, but of national importance, the Committee trust that the Most Noble the Governor of Bengal will not deem intrusive in soliciting, as they now beg to do, his early attention to the subject.

I have, & c.,

(Signed) T. M. ROBINSON,

Secretary to the Bengal Chamber of Commerce."

২০। John Daly Beseremes, The Port Canning Problem, A Letter to the Right Honourable Lord Stanley (Calcutta: Thacker's Spink & co, 1868, British Library, Digital copy, 2013), 7-8.

২১। Beseremes, The Port Canning Problem, P- 8.

২২। Paper relating to the formation of Port Canning, on the Matla River, extending from 27th May, 1853 to 11th March, 1865, Calcutta, 1865, Memorandum on the advantages of the the Matla River.

২৩। Paper relating to the formation of Port Canning, ibid.

২৪। West Bengal State Archive, Proceeding of Board of Revenue, Lower Proviences, 18th March, 1856, Letter from E. D. Kilburn to Lieutenant Governor of Bengal.

২৫। The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta, 26.

"Report on the Mutlah Cotton given in the Proceeding of the Agricultural Society of Calcutta, December 9th 1858.

Two samples of cotton, Nos.1 and 2, raised in different Grants in the Sunderbunds, fron sea Island seed received from the Society, were placed on the table, together with a Report on them from a Member of the Committee, in comparison with samples of original sea Island, and with a most superior description of Cotton raised at Melbourne from sea Island seed. Mr. Freeland reports that "sample No. 1 is inferior to the Melbourne sample in length of staple, and its value is much depreciated by being so neaped. Sample No. 2 is fully equal to that from Melbourne, and would, in the Liverpool market, fetch about the same price: it contrasts very favourable with the original sample of Sea Island cotton, but is inferior in strength."

Cotton Supply Association;

Offices, 13, Corporation Street.

Manchester, 22nd December 1857

২৬। মাতলা অ্যাসোসিয়েশনঃ

১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেশ কিছু ব্যবসায়ী এবং আগ্রহী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের কিছু বিশেষ উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডিত করার চেষ্টায় মাতলা অ্যাসোসিয়েশন নামক একটি সুসংহত এবং সক্রিয় সংগঠন গঠন করেছিলেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি সহায়ক বন্দর হিসাবে মাতলার অগ্রগতির প্রচার। এছাড়া নতুন বন্দরের অগ্রগতিতে সরকারি সাহায্য ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে সবরকম বাধা অতিক্রম করার প্রচেষ্টা এবং সেই বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা।

২৭। The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta, 27-28.

২৮। West Bengal State Archive, Proceeding of Board of Revenue, Lower Proviences, Proceeding No. 229, 8th July 1856, Letter from J. H. Reilly, Commissioner in the Sundarban to Secretary to the Board of Revenue.

২৯। West Bengal State Archive, General Proceedings, 20 November, 1856, Proceeding No. 103.

৩০। The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta, 17.

“I am of opinion that, in every point of view, the Mutlah is superior to the Hooghly as the port of Calcutta, for the following reason :- Aship can always, with the aid of steam, go up or down in one day; there is always sufficient depth of water at all times of tide for vessels not drawing more than 24 feet; the tide never runs stronger than from 3½ to 4 miles per hour; whereby there is no fear of loss of anchors, cut-water, &c. &c., or fouling other vessels; there are no shifting sand; so that a carefull Commander may, with the assistance of the Chart(as many already have done), navigate his own vessel up and down. Pilots, therefore, are almost needless; the entrance is as easily made as that of the Hooghly. These are the pros. The only con I am aware of is, as you mention, it being further to leeward in the South-West Monsoon. This, in my opinion, is a matter of little consequence, for what is 35 miles in a space of 300, and again how many ships we find (heavily laden with rice) leaving the port of Akyab (which is as far to leeward as’tis possible to be) throughout the Monsoon.

I would bind myself to say, that if the "Mutlah" were adopted as the Port of Calcutta, the loss of shiping would be only one percent, of what it now is.

Should the above be of any use to you, you are at liberty to make what use of it you may think fit.

(Signed) C. J. Ward,

Hon'ble E. I. Co.'s Surveyor."

৩১। The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta, 6.

"If the statement now submitted by the undersigned be the true exponent of the evidence taken, its follows clearly that the River Hooghly has deteriorated up to the present time; that that deterioration has been gradual, and caused by the shoaling and contraction of its deep channels from accumulation of silt; and that, under the present conditions of the river, the deterioration will be progressive."

৩২। The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta, 6-7.

"It must be borne in mind, that the number of ships of heavy draft of water frequenting this port is annually increasing, as is shown by the comparative rates of increase of Tonnage and Pilotage Dues for fourteen years, 1840-1854, the former being $34^{1/2}$ percent. and the latter 54 percent. The time may not be very distant when vessels of a class may visit India or which no probable improvement of the Hooghly would render it navigable; and while therefore every nerve should be strained to keep its channels efficient and preserve it as a commercial highway, it may be well not to lose sight of the Mutlah as an auxillary port."

৩৩। The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta, 10.

৩৪। The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta, 11.

৩৫। West Bengal State Archive, Proceeding of Board of Revenue, Lower Proviences, 18th March, 1856, from E. D. Kilburn to Lieutenant Governor of Bengal.

৩৬। ibid,

৩৭। ibid,

৩৮। West Bengal State Archive, Proceeding of Board of Revenue, Lower Proviences, 26th March, 1856, Letter from A. R. Young, H. Yule and D. Robertson to Secretary to Government of Bengal.

৩৯। ibid,

৪০। Thomas Bacon, First Impression and Studies from Nature in Hindustan (London: Hurst and Blackett, 1837) 2-3.

৪১। Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans, 109.

৪২। F. E. Pargiter, "Cameos of Indian Districts- The Sundarbans," The Calcutta Review, Vol-89, Iss-178 (December 1889): 284.

৪৩। West Bengal State Archive, Proceeding of Board of Revenue, Lower Proviences, Proceeding No 333, 7th August, 1854, Letter from Sundarban Commissioner to Presidency Commissioner.

৪৪। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 92.

৪৫। West Bengal State Archive, Proceeding of Board of Revenue, Lower Province, Proceeding No. 77, 7th March 1856, Letter from Sundarban Commissioner to Presidency Commissioner.

৪৬। West Bengal State Archive, Proceeding of Board of Revenue, Lower Province, Proceeding No 18ct, 27th December 1856, Letter from Presidency Commissioner to Sundarban Commissionar.

৪৭। O'Malley, Bengal Disrtict Gazetteers, 24-Parganan, 184.

৪৮। পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং (কলকাতা: লোকসখা প্রকাশন, ২০১৭), ১২৫।

৪৯। The Mutlah as an Auxiliary Port To Calcutta, 4.

৫০। The Port of Calcutta and the Port of Mutlah considered in connection by A Railway or A Ship Canal (Calcutta: Cranenburgh Military Orphan Press, 1858), 33-34.

৫১। The Port of Calcutta and the Port of Mutlah, 35.

৫২। West Bengal State Archive, Proceeding of Board of Revenue, Lower provinces, 26th august, 1853, letter from W. E. Baker (Consulting Engineer to Government of India) to secretary to the Government of Bengal.

৫৩। West Bengal State Archive, Proceeding of Board of Revenue, Lower provinces, 30th November 1855, letter from John Borradaile and co. to R. M. Stephenson managing director and agent of the East Indian Railway.

৫৪। West Bengal State Archive, Proceeding of Board of Revenue, Lower provinces, 30th november 1855, Letter from John Borradaile and co. to R. M. Stephenson manageing director and agent of the East Indian Railway.

৫৫। The Port of Calcutta and the Port of Mutlah, 18.

৫৬। O'Malley, Bengal Disrtict Gazetteers, 24-Parganan, 167.

৫৬। West Bengal State Archive, Proceeding of Board of Revenue, Lower Province, Proceeding No 43, 16th June 1862, Letter from Sundarban Commissioner to Presidency Commissioner.

৫৮। Hunter, Statistical Account of Bengal, 92-93.

৫৯। ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং, ১১৫।

৬০। Hunter, Statistical Account of Bengal, 93.

৬১। Hunter, Statistical Account of Bengal, 93-94.

৬২। Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans, 108-109.

৬৩। Hunter, Statistical Account of Bengal, 94.

৬৪। Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans, 108-109.

৬৫। O'Malley, Bengal Disrtict Gazetteers, 24-Parganan, 224

৬৬। Hunter, Statistical Account of Bengal, 97.

৬৭। Hunter, Statistical Account of Bengal, 94-95.

৬৮। Hunter, Statistical Account of Bengal, 95.

৬৯। Hunter, Statistical Account of Bengal, 95.

৭০। Hunter, Statistical Account of Bengal, 97.

৭১। ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং, ১২১ - ১২২।

৭২। Hunter, Statistical Account of Bengal, 197.

৭৩। Hunter, Statistical Account of Bengal, 98.

৭৪। Hunter, Statistical Account of Bengal, 98.

'With the exception of the Agent and other employed by the new Port Canning Land Company, and a dak munshi or deputy post Master, no one lives at Canning'

৭৫। The Port of Calcutta and The Port of Mutlah, 11 – 14.

৭৬। The Mutlah as an Auxiliary port to Calcutta, 40.

"It would be untrue to deny that, at present, during a portion of the year, the climate is productive of fever, but this is nothing more than is common in an uncleared jungle. At the rate, however, at which clearing is now going on, the climate would rapidly improve in the upper part of the river, where the town and shipping will be, and no one can doubt that, were it known that the Railway was to be commenced, the whole of Lots 50, 54, 49, 48, 43, 128 and 123 would be rapidly cleared and brought in to cultivation.

There are many district between the Mutlah and Calcutta now cleared and healthy, which a few years ago, were the contrary: all that is required is to

clear the jungle and put a slight bund round the above- named Lots, so as to procect them from extraordinary spring-tides, and the country would then become fertile and healthy."

৭৭। The Port of Calcutta and The Port of Mutlah, 15.

"During the months of December, January, February and March, I think it is very healthy; in the month of April, natives (not to native ryots, they appear to get quite as good health as Bengallees any where else) suffered very much from fever, though few died. In May and June nearly all, of not all, the Europeans had fever, but I am not aware of any who died there, and few were very ill. A large proportion of natives had fever also. There appears to have been less sickness during the months of July, August and September, than in May and June, but few, if any, Europeans remained during those months. At present we have 800 men at work, and there is very little sickness amongst them. Natives from other part of the country who are brought there, suffer much more than Europeans. Cholera is less prevalent then in many part of Bengal. I am not aware of considerable mortality amongst the European crews, only one man died in the Mutlah that I heard of, he belonged to the Shockomoxon and was ill when he came, but men who come up to Calcutta ill may have died of which I did not hear."

৭৮। The Mutlah as an Auxiliary port to Calcutta, 41.

৭৯। H. Piddington, 'A Letter to the most noble James Andrew Marquis of Dalhousie, Governor General of India, on the storm wave of the cyclones in the Bay of Bengal and their effects in the Sunderbunds, (Calcutta: Baptist Mission Press, 1853), 20. Taken from A. K. Sen Sarma, Henry Piddington (1797 -1858): A bicentennial tribute, Climate Resilience and Sustainability, Weather/ volume 52, 2012, p. 192 taken from rmets. Onlinelibrary. Wiley. Com.

“everyone and everything must be prepared to see a day when, in the midst of the horrors of a hurricane, they will find a terrific mass of salt water rolling in, or rising up upon them, with such rapidity that the whole settlement will be inundated to a depth of from five to fifteen feet.”

তৃতীয় অধ্যায়

হ্যামিল্টনের আবাদ: স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনা (১৯০৩-১৯৪৬)

তৃতীয় অধ্যায়

হ্যামিল্টনের আবাদ : স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনা (১৯০৩-১৯৪৬)

জল-জঙ্গল ঘেরা এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল সুন্দরবন। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্ব থেকেই এখানে মানুষের বসবাস, তবে ব্রিটিশ কর্তৃক চব্বিশ পরগনা তথা সুন্দরবনের রাজস্ব আদায়ের অধিকারের সময় থেকে জঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষের বসতি স্থাপন এক নতুন গতি পায়। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি সরকার কলকাতা বন্দরের পরিপূরক বন্দর হিসাবে মাতলা নদীতে যে বন্দর তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তার সূত্র ধরেই তৎকালীন সুন্দরবনের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে শহর তৈরীর সূচনা হয়েছিল।[১] শহর তৈরীর এই কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে এই অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক মানচিত্রে এক বিশেষ পরিবর্তন পরিলিখিত হয়। বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের আগমন ঘটেছিল এই অঞ্চলে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে দলে দলে মানুষের আগমনের সূত্রপাত হয়েছিল, যেটি শুধুমাত্র ক্যানিং নয় এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে বহু মানুষকে বসতি স্থাপনে আগ্রহী করেছিল। এইসব ঘটনা স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন নামের এক সমাজ-সংস্কারককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, যিনি অনুভব করেছিলেন ভারতের গ্রামগুলি ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তিভূমি। এই গ্রামগুলিকে সমবায় ব্যবস্থার অধীনে এনে স্বনির্ভর করে তুলতে পারলেই অর্থনীতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তাই স্যার হ্যামিল্টন তাঁর সমবায় ধারণাকে সামনে রেখে ক্যানিং থেকে আরও দক্ষিণে বাদা-আবাদ সংমিশ্রিত তিনটি দ্বীপ গোসাবা, রাঙাবেলিয়া এবং সাতজেলিয়াকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্র হিসাবে।[২] স্বৈরতন্ত্রকে পিতৃতন্ত্রের আড়ালে রেখে হ্যামিল্টন সাহেব তাঁর স্বপ্নের সমবায় ধারণার মাধ্যমে সেই স্বপ্ন পূরণের কাজ শুরু করেছিলেন। স্বাভাভিকভাবে প্রশ্ন উঠে আসে যে, কেমন করে হ্যামিল্টন

সাহেব তাঁর সমবায় ভাবনার মাধ্যমে গোসাবাবাসীকে স্বনির্ভরতার শিক্ষায় নিজের অজান্তে স্বায়ত্তশাসনের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন? কেমন ছিল তাঁর সেই সামগ্রিক প্রচেষ্টা এবং তা পূরণ করার কার্যপ্রনালী? শুধুমাত্র ভারতীয়দের অর্থনীতির মডেলকে নতুনভাবে গড়ে তোলা না কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল ড্যানিয়েলের সমবায় ভাবনার পিছনে? এইসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানই হবে এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

পশ্চিম স্কটল্যান্ডের অ্যারন (Arran) দ্বীপের ছোট্ট একটি শহর হেলেনবার্গের (Helensberg) এক সুপ্রতিষ্ঠিত ও পুরাতন ব্যবসায়ী পরিবারে ১৮৬০ সালের ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খুব অল্প বয়সেই তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের হাতেখড়ি হয়েছিল। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে পারিবারিক ফার্ম বা কোম্পানির স্কটল্যান্ডের অফিসে শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন।[৩] তিনি স্কটল্যান্ডের একটি নৈশ স্কুলে পড়াশোনা করতেন। এই-সময় প্রশিক্ষণ ও পঠন-পাঠন দুটোই সমান তালে চালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই ড্যানিয়েল তাঁর অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার জন্য পরিচিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই তিনি কোম্পানি পরিচালনার বিষয়ে সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। কর্মসিদ্ধির জন্য ত্যাগ, আদর্শ-নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় এই তিন দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিলাতের বিভিন্ন অঞ্চলে 'ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি এন্ড কোম্পানি' পরিচালিত অফিসে ও কারখানায় কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। কাজের কৃতকার্যতার পুরস্কার স্বরূপ কোম্পানি তাঁকে নানান বিভাগের উচ্চ পদে বসিয়েছিলেন। কুড়ি বছর বয়সে কোম্পানি তাঁকে ভারতের অন্যতম অফিস বোম্বে পাঠিয়েছিলেন।[৪] তবে খুব শীঘ্রই ড্যানিয়েল বোম্বে অফিস থেকে কলকাতা অফিসে চলে এসেছিলেন। এই-সময় থেকেই একটি আদর্শ গ্রাম গড়ার মতাদর্শ তাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, যে গ্রামটি সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। তিনি মনে করতেন ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতির জন্য এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে উপযুক্ত।[৫]

তাই এই-সময় থেকে স্বনির্ভর গ্রাম তৈরীর স্বপক্ষে বা এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। এমনকি সমবায়ের মূলনীতিকে সমর্থন করে ভারত সরকারের নিকট স্মারকপত্র পাঠিয়েছিলেন।[৬] স্যার হ্যামিল্টন সাহেব তখন কলকাতার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন ফলে একটি মডেল ফার্ম প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিতে তাকে কোনো প্রকার আসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। তিনি এমন একটি ফার্ম তৈরীর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেটির মাধ্যমে তাঁর কৃষি-জীবন পুনর্গঠনের তত্ত্বগুলিকে বাস্তবায়িত হতে পারে। তিনি মনে করতেন ভারতের কৃষি-জীবন পুনর্গঠনে সমবায়ের ধারণা সর্বাপেক্ষা উপযোগী।[৭] ভারতে কর্মজীবনের সূচনা লগ্ন থেকে স্যার ড্যানিয়েল গঠনমূলক কিছু করার তাগিদ অনুভব করতেন।[৮] এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি আরও গভীর মনোযোগ দিয়ে ভারতের ইতিহাস পড়তে এবং ব্যাপকভাবে ভারত ভ্রমণের কাজ শুরু করেছিলেন।[৯] এইসব পঠন-পাঠন এবং ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাত লক্ষ গ্রামের উপর ভর করে ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি প্রস্তরটি দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই প্রস্তরখন্ডটি অধিশায়িত হয়ে আছে "India's foundation stones are her 700000 villages; but the stones are badly laid"।[১০]

স্যার ড্যানিয়েল নিজে শাসক সম্প্রদায় ব্রিটিশ জাতিভুক্ত হলেও ভারতে ব্রিটিশ রাজের সবচেয়ে তিক্ত সমালোচক ছিলেন। তিনি মনে করতেন ব্রিটিশ রাজ ভারতে আইনের শাসন, ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসন এবং ন্যায়পরায়ণ বিচার ব্যবস্থা চালু করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করলেও সাধারণ জনগণ এসবের থেকে খুব বেশি সুবিধা পায়নি। তাই তিনি বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ কর্তৃক প্রদত্ত আইন-আদালত, শান্তি ও নিরাপত্তা এসব আইনজীবী ও পুঁজিপতিদের বা ঋণদাতাদের সমৃদ্ধ করেছে আর ধ্বংস করেছে সাধারণ জনগণকে।[১১] তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের অর্থনীতি গ্রামকেন্দ্রিক। তাই গ্রামের পুনর্গঠনই ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করবে। তিনি নিজস্ব উপায়ে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ

করেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন দেশের বিশালতার কারণে এককভাবে তা করা অসম্ভব। তাই তিনি এমন একটি মডেল স্থাপন করতে চাইছিলেন, যেটি পরবর্তীতে গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে নিযুক্ত অন্যদের কাছে একটি উদাহরণ হিসাবে থেকে যেতে পারে।[১২] স্যার ড্যানিয়েল এই-সময় বিশ্বব্যাপী সমবায় আন্দোলনের মূলনীতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি গ্রামকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য সমবায় সমিতি গঠনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। স্যার হ্যামিল্টন বিশ্বাস করতেন ভারত জুড়ে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতকে তার অর্থনৈতিক অবনমনের গভীরতা থেকে বের করে আনা সম্ভব হবে। ড্যানিয়েল তাঁর উদ্দেশ্যগুলিকে ফলপ্রসূ করার জন্য এমন একটি জায়গা বেছে নিয়েছিলেন যেখান আগে থেকে কোনো মানুষের বসবাস ছিল না। তাঁর বিশ্বাস ছিল এমন একটি জায়গায় সাফল্যের সঙ্গে যদি আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা যায়, তাহলে সেই আদর্শ ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রাম জীবনের নিরাশার অন্ধকারকে আলোকবর্তিকা দেখাতে প্রামাণ্য হিসাবে কাজ করবে। তাই সুন্দরবনের জনশূন্য তিনটি দ্বীপ গোসাবা, রাঙ্গাবেলিয়া এবং সাতজেলিয়াকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর স্বপ্নের এস্টেট। গোসাবা এবং রাঙ্গাবেলিয়া দ্বীপ দুটিকে ১৯০৩ সালে এবং ১৮৭৯ সালের 'বৃহৎ পুঁজিবাদী নীতি' (Large Capitalist Grant Rules)[১৩] অনুযায়ী ১৯০৯ সালে সাতজেলিয়া দ্বীপটিকে ইজারা নিয়েছিলেন।[১৪] জনমানব শূন্য এই অঞ্চল তখন গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। দিনে-রাতে বিচরণ করত বিভিন্ন বন্য জন্তুর দল। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক ছিল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। নদী দিয়ে ঘেরা দ্বীপগুলির চারিপাশের জলে বিরাজ করত কুমির, হাঙ্গর যারা একলহমায় যে-কোনো মানুষকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারত।

শুরুতে বসতি স্থাপনের জন্য আগত মানুষগুলিকে গাছের উপর বাঁশের মাচা তৈরী করে রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। হিংস্র জন্তুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে মাচার চারিপাশে সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হত। জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ, নদীর জল লবণাক্ত এমন

ভয়াবহ পরিবেশে কেবলমাত্র খাবার নয়, পানীয় জলও সঙ্গে করে আনতে হয়েছিল।[১৫] স্যার ড্যানিয়েল প্রথম যখন তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধু এবং কয়েকজন কুলিকে সঙ্গে করে এখানে এসেছিলেন তখন এখানে কোনো দোকান বা ঔষধালয়, পানীয় জল বা মানুষের বাস ছিল না। সবকিছুই তাকে নিজের হাতে সাজাতে হয়েছিল। তিনি বিহারের রাঁচি থেকে বহু উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক এবং মেদিনীপুর থেকে কুলিদের নিয়ে এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হ্যামিল্টন কর্তৃক গৃহীত বাঁধ নির্মাণ, সীমানা কাটাই, এক-কাঠিয়া ইত্যাদি পুনঃনির্মাণের পদ্ধতি সবই সুন্দরবনের অন্যান্য অংশের মতই ছিল। কিন্তু পার্থক্য ছিল একটাই, জমি পুনরুদ্ধারের কাজে আগত শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি জমিদার হিসাবে নয়, নিজের স্বপ্ন পূরণের সহযোগীর মতই আচরণ করতেন।

জমি পুনরুদ্ধারে স্যার ড্যানিয়েলের প্রথম কাজ ছিল জঙ্গল পরিষ্কার করা, জলাভূমির স্তর বাড়ানো এবং সমস্ত ভূ-ভাগকে চাষযোগ্য ভূমিতে পরিণত করা। লবণাক্ত জলের প্রবেশ বন্ধের জন্য বড়ো-বড়ো খাল ও নদীর মুখে বাঁধ দিয়ে জমির স্তর উঁচু করা হয়েছিল। এইসব কাজের জন্য প্রথমে তাকে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা'হল শ্রমিকের অভাব। কারণ বেশিরভাগ মানুষ হিংস্র জন্তুর ভয়ে সুদূর দক্ষিণের ভয়াবহ এই জঙ্গলে জঙ্গল পরিষ্কার করতে ও বাঁধ বাঁধার কাজে আসতে সাহস পাচ্ছিল না।[১৬] এইসব সমস্যাগুলিকে তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন মূলত দুটি উপায়ে। প্রথমত- তিনি শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করেছিলেন। দ্বিতীয়ত- তাদেরকে বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক কথার মাধ্যমে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, দলবদ্ধ মানুষের হাত অনেক শক্তিশালী। তাঁর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথম দিকে যেসব শ্রমিক এখানে এসেছিলেন তাদের বেশির ভাগটাই পরবর্তীতে এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাতে পরিণত হয়েছিল।[১৭] এলাকাটিকে বসবাসযোগ্য ও পুনরুদ্ধারকৃত জমিগুলিকে আবাদযোগ্য করে তোলার সময় পানীয় জলের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই সমস্যার সমাধানকল্পে স্যার

হ্যামিল্টন প্রচুর অর্থ ব্যয় করে জল পরিস্রুত করার মেশিন কিনেছিলেন। এই জল পরিস্রুত যন্ত্র, লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিবর্তিত করতে সক্ষম ছিল।[১৮] তবে পরবর্তীতে বসতি বৃদ্ধির সাথে সাথে পানীয় জলের সমস্যা পুনরায় দেখা দিয়েছিল। জল পরিস্রুত যন্ত্রের সাহায্যে বর্ধিত জনসংখ্যার পানীয় জলের চাহিদা মেটানো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তাই কিছুদিন নিকটবর্তী মসজিদবাটি নামক লটের একজন লোক তাঁর পুকুর থেকে বিনা আপত্তিতে প্রয়োজনমত পানীয় জল সরবরাহ করেছিলেন। স্যার ড্যানিয়েল সেই ব্যক্তিকে ৫০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তিনি গ্রামে গ্রামে বহু অর্থ ব্যয়ে পুকুর খননের কাজ শুরু করেছিলেন এবং পুকুরের পাড় ভেঙে যাতে নোনাজল প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য পুকুরের পাড়গুলিতে মাটি ক্ষয়রোধি নানাবিধ বৃক্ষ রোপন করেছিলেন।[১৯] এভাবে ১৯০৩ – ১৯০৭ সাল এই ৫ বছরে গোসাবা এবং তার নিকটবর্তী কিছু এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও জমির স্তর বাড়ানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। বৃষ্টির জলে মাটির লবণাক্ততা ধুয়ে গিয়ে অনাবাদি জমি চাষযোগ্য জমিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ১৯০৭ সালের এক ভয়াবহ বন্যায় নদী বাঁধ ভেঙে নোনাজল চাষের জমিতে প্রবেশ করায় চাষযোগ্য জমিগুলি পুনরায় চাষের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল।[২০] এরপর থেকে স্যার ড্যানিয়েল আর ইংরেজ তত্ত্বাবধায়ক নয় বাঙালি তত্ত্বাবধায়কদের ওপর তাঁর সমগ্র এস্টেটের দেখভালের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ১৯০৮ সালে ইংরেজ তত্ত্বাবধায়ক মিস্টার লেকেন সাহেবের স্থানে মিস্টার নবীন চন্দ্র মিত্রকে সমগ্র প্রকল্পের ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। ঠিক ওই বছরই তিনি ‘ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি এন্ড কোম্পানি’ থেকে অবসর গ্রহণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কোম্পানির সদস্য থাকাকালীন তিনি বহুবার গোসাবাতে এসে কাজের গতি-প্রকৃতি তদারকি করতেন। কেমন করে কাজের অগ্রগতি সম্ভব হবে সে বিষয়ে বহু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অবসর গ্রহণের পর গোসাবা কেন্দ্রীক তাঁর সমস্ত প্রকল্প কিভাবে পরিচালিত হবে, তাঁর স্বপ্ন

কিভাবে বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে যেতেন। তিনি এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর গোসাবা এস্টেট থেকে যা কিছু অর্থ উপার্জিত হবে তার সবটুকুই যেন পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়।[২১]

১৯০৯ সালের মধ্যে গোসাবা দ্বীপের আরও অনেকটা অঞ্চলের জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। এই সময়ের জনগণনা অনুসারে সমগ্র গোসাবা দ্বীপের মোট জনসংখ্যা ছিল ৯০০ জন তার মধ্যে ৬০০ জন ছিল শ্রমিক। অবশিষ্ট ৩০০ জন অধিবাসীর মধ্যে কয়েকজন এস্টেটের কর্মচারীবৃন্দ বাকিরা সবাই ছিল বসতি স্থাপনকারী এখানকার স্থায়ী অধিবাসী।[২২] স্যার ড্যানিয়েল সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকদের এখানে এসে বসতি স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তারা তাঁদের পূর্ববর্তী জমিদারদের প্রতিনিধি বা আড়কাঠিয়াদের দ্বারা এতবেশি প্রতারিত হয়েছিল যে, হ্যামিল্টনের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারা তাকে অন্য জমিদারদের থেকে খুব একটা আলাদা করে ভাবতে পারেনি। তাই সর্বশেষে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে যারা এখানে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল তাদের অনেকেই ছিল অসামাজিক কাজে লিপ্ত ব্যক্তি।[২৩]

১৯০৯ সালে হ্যামিল্টন সাহেব সাতজেলিয়া (লট নং ১৪৮) নামে গোসাবার পার্শ্ববর্তী আরও একটি দ্বীপ ৪০ বছরের জন্য ইজারা নিয়েছিলেন।[২৪] গোসাবা থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত সাতজেলিয়া সহ স্যার ড্যানিয়েল এস্টেটের মোট জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২২ হাজার একর অর্থাৎ প্রায় ৫০ বর্গমাইল।[২৫] এই বিশাল এস্টেট পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল একজন দক্ষ তত্ত্বাবধায়াকের যিনি তাঁর দক্ষ পরিচালনায় হ্যামিল্টন সাহেবের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯১০ সালে শ্রী সুধাংশু ভূষণ মজুমদারকে সহকারী ম্যানেজার হিসাবে সমগ্র গোসাবা এস্টেটের কার্যভার তুলে দেওয়া হয়েছিল।

১৯১১ সাল থেকে রাঙাবেলিয়া দ্বীপে জমি পুনরুদ্ধার এর কাজ শুরু হয়েছিল এবং ১৯২০ সালের মধ্যে ২৬০০০ বিঘা জমি পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছিল। এই সময়ের শেষের দিকে সাতজেলিয়ার পুনরুদ্ধারের কাজও সম্পন্ন হয়েছিল। ফলে বহু মানুষের আগমন ঘটে এই অঞ্চলে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯০০ থেকে ৫০০০।[২৬] স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা ও সমস্যাগুলোও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাদের এই সমস্যাগুলিকে একে একে নিরসনের ব্যবস্থাও করেছিলেন হ্যামিল্টন সাহেব।

এবার স্যার হ্যামিল্টন সাহেবের জনহিতকর কাজগুলি পরপর আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯১৯-১৯২০ সালে প্রতি বিঘা জমির সেলামি ছিল ৮ টাকা অর্থাৎ ১ বিঘা জমি পুনরুদ্ধার করে ফসল উৎপাদনের জন্য হ্যামিল্টন সাহেবকে ৮ টাকা ভাড়া দিতে হত, যেটি অনেকের কাছে বেশি মনে হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে আমরা দেখব যে শুধুমাত্র জমির ভাড়া হিসাবে প্রজাদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ নয় নিজের ব্যক্তিগত অর্থ থেকে কেমন ভাবে তাঁর প্রজাদের জন্য পানীয় জল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিশুদের শিক্ষা, ব্যাংক ব্যবস্থা এবং বিপণনের সুবিধার জন্য অর্থ ব্যয় করেছিলেন। মাঝে মাঝে কৃষকরা যখন তাদের খাজনা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন বা পরিশোধ করতে পারেননি তখনো তাদেরকে একই জমি অর্থাৎ নিজের চাষ করা জমিতে চাষ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে একটি শর্ত অবশ্যই ছিল সেটি হল তাদের মোট উৎপাদিত পণ্যের ৫০% এস্টেটের কাছে হস্তান্তর করতে হত। ঋণ পরিশোধ করলে নিজস্ব জমিতে চাষ করার অধিকার ফেরত পেত।[২৭]

গোসাবাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সর্বপ্রথম যে সমস্যাটি সর্বসমক্ষে এসেছিল সেটি হল পানীয় জলের সমস্যা আর এই সমস্যার সমাধানে হ্যামিল্টন সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপগুলি পূর্বে বর্নিত হয়েছে। এরপর যে সমস্যাটি এখানে আগত বসবাসকারীদের কপালে চিন্তার রেখা এঁকে দিয়েছিল সেটি হল নোনা জল-হাওয়া ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশের হাত থেকে

নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার বিরুদ্ধে গিয়ে শরীরকে টিকিয়ে রাখা। এইজন্য প্রয়োজন পড়েছিল একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের যিনি সব কিছুর বিরুদ্ধে গিয়ে প্রজাদের বাঁচিয়ে রাখার পরামর্শ দেবেন। স্যার ড্যানিয়েল কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের পূর্বে গোসাবার মানুষের জন্য চিকিৎসক এবং ঔষধের কোনো প্রকার ব্যবস্থা ছিল না। কোনো প্রকার শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চিকিৎসকের কাছে যেতে হত, এমনকি চিকিৎসকের পরামর্শ মত পাশ্ববর্তী এলাকা থেকেই ঔষধের ব্যবস্থা করতে হত। ফলে এই সময়ে চিকিৎসার খরচও ছিল খুব বেশি। যদি কোনো চিকিৎসকে রোগীর বাড়ি গিয়ে দেখে আসতে হত তাহলে তার খরচ ছিল আরও বেশি। মানুষের কাছে শারীরিক সমস্যা ছিল মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি। এইসব সমস্যা নিরসনে ১৯১০ সালে হ্যামিল্টন সাহেব বহু অর্থ ব্যয়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ঔষধালয় নির্মাণ করেছিলেন এবং সাফল্যের সাথে সেগুলিকে চালানোর ব্যবস্থাও করেছিলেন।[২৮] চিকিৎসা কার্য যথাযথ ভাবে পরিচালনার জন্য একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার ও একজন প্রশিক্ষিত কম্পাউন্ডার নিযুক্ত করেছিলেন। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের জন্য ছিল এক ব্যবস্থা। সবাই সমান ভাবে এই পরিষেবা গ্রহণ করতে পারত। কোনো প্রকার ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে ডাক্তার প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে ব্যবস্থা পত্র (Prescription) লিখে দিতেন, সেই ব্যবস্থা পত্র নিয়ে চিকিৎসালয়ে এলে কম্পাউন্ডার ঔষধ দিতেন। এইসব সুবিধা লাভের জন্য রোগীকে কোনো প্রকার অর্থ ব্যয় করতে হত না। ডাক্তার তাঁর পরিশ্রমের জন্য বেতন স্বরূপ এস্টেটের তরফ থেকে সাড়ে ১০ বিঘা চাষের জমি পেয়েছিলেন। একই সময় চিকিৎসকের পাশাপাশি একজন অভিজ্ঞ নার্সকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রথম দিকে এইসব কিছুর ব্যয়ভার বহন করেছিলেন স্যার ড্যানিয়েল নিজেই। কারণ প্রথম দিকে গোসাবা এস্টেট থেকে এমন কিছু অর্থ উপার্জিত হত না, যা দিয়ে সমস্ত খরচ চালানো সম্ভব ছিল।[২৯] তিনি ১৪৩ নং লট রাঙ্গাবেলিয়াতে এই-সময় একটি দাতব্য হ্যোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩০]

অপরিমেয় লোক হিতৈষণার সংকল্পে সংকল্পবদ্ধ হ্যামিল্টন মানব মঙ্গল ব্রত পালনে আরও একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন সেটি হল সমবায় ভাবনা। ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তকদের মধ্যে স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন অন্যতম। ভারতবর্ষে সেই সময় সমবায় আন্দোলন নিয়ে চিন্তাভাবনার শৈশবাবস্থা। বস্তুত স্যার 'ফ্রেডরিক নিকলসন'[৩১] নামে মাদ্রাজের এক অসামরিক ব্যক্তি সর্বপ্রথম ঋণদান সমিতি স্থাপনের কথা বলেছিলেন। তাঁর দেখানো পথ ধরে ভারত সরকার ১৯০১ সালে কৃষি ব্যাংক স্থাপনের বিষয়ে একটি কমিটি নিয়োগ করেছিল। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯০৪ সালে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল 'সমবায় ঋণদান সমিতি আইন' পাশ করেছিল। এই আইন অনুযায়ী ১৯০৪ সালের ২৪শে মার্চ থেকে ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এবং শহর ও গ্রাম এলাকায় ঋণদান সমিতি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।[৩২]

সমবায় নীতির উপর আস্থাশীল হ্যামিল্টন এই দেশের লোকেদের মধ্যে গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সমবায় নীতির ঐক্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণার পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করেছিলেন। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম 'ছাত্ররা' যাতে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে সে বিষয়ে তিনি বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলজের ছাত্রদের মধ্যে সমবায় সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখার প্রতিযোগিতা করেছিলেন এবং সেখানে জয়ী ছাত্রদেরকে পুরস্কার দানের ব্যবস্থাও করেছিলেন। এছাড়া যাতে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে সমবায় সমিতি গড়ে উঠতে পারে সে জন্য সরকারকে বিভিন্ন রকম পরামর্শও দিতে থাকেন। তিনি বাংলায় সমবায় সমিতির উন্নতিকল্পে তৎকালীন বাংলা সরকারকে ২০০০০ টাকা দান করেছিলেন।[৩৩] তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভারতের অর্থনীতির উন্নতি সমবায়েই নিহিত ছিল। তবে তাঁর নিজের এস্টেট গোসাবায় সমবায় আন্দোলন কিভাবে গড়ে উঠবে এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। তিনি চিন্তা করতে শুরু

করেছিলেন এবং উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, গোসাবাবাসী নিজেরাই যদি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে না পারে তাহলে তাদেরকে সমবায়ের মধ্যে আনা উচিত হবে না। তাই তিনি গোসাবাবাসীর মধ্যে সমবায়ের ধারণা প্রসারের পথের সন্ধানে নেমে পড়েছিলেন। তিনি চাইছিলেন গোসাবায় সমবায়ের সূচনা হোক স্বাভাবিকভাবে। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে প্রয়োজন থেকে সমবায়ের উদ্ভব হয়।

১৯১২ সালে যখন হ্যামিল্টন বিলাত থেকে গোসাবাতে আসেন তখন তাঁর এস্টেটের ম্যানেজার সুধাংশু বাবুর কাছে অর্জুন মন্ডল নামে একজন প্রজার কথা শুনেছিলেন। যিনি মহাজন কর্তৃক সর্বস্ব হারিয়েছিলেন। এই গল্প তাকে উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছিল যে, বহু প্রজা বা চাষি মহাজনের ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে আছে এবং তাদেরকে মহাজন কর্তৃক বিভিন্নভাবে হয়রানি হতে হচ্ছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন চাষি-বাসি এই মানুষগুলির উন্নতি তখনই সম্ভব হবে যখন তারা মহাজনের ঋণের ফাঁস থেকে মুক্ত হতে পারবে। স্যার ড্যানিয়েল অনুভব করেছিলেন যে, এই মহাজনদের বিরুদ্ধে যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা যায় তাহলে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। কৃষকদের মধ্যে সমবায়ের ধারণার জন্ম দেওয়া অসম্ভব হবে। এই চিন্তাভাবনা থেকে তিনি মহাজন ও ঋণগ্রস্ত চাষিদের একসঙ্গে বসিয়ে একদিন বিকালে তাদের মধ্যে আপসের মাধ্যমে মীমাংসার ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩৪] স্যার ড্যানিয়েল ব্যক্তিগতভাবে তাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। টাকা পেয়ে মহাজনরাও বন্ধকী দলিল ফেরৎ দিয়েছিলেন। কৃষকদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে যে পরিমাণ টাকা তিনি ব্যয় করেছিলেন, হিসাব করে দেখা গেল মূল জমির দামের থেকেও দ্বিগুণ টাকা তিনি বেশি খরচ করেছেন।[৩৫] গোসাবার জমিদারিতে আর যাতে মহাজনী অত্যাচার না হয় সেজন্য গোসাবা থেকে মহাজনদের ব্যবসা গুটিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বলেছিলেন। প্রজাদের বলেছিলেন ভবিষ্যতে তারা যেন

মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ না করে। প্রয়োজন হলে এস্টেট থেকে চাষ খরচ বা অন্যান্য খরচ বাবদ সাড়ে বারো শতাংশ হারে সুদ দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ হিসাবে নিতে পারবেন।[৩৬]

এরপর স্যার ড্যানিয়েল ১৯১৬ সালে যখন তিন বছরের জন্য ভারতে এসেছিলেন তখন থেকে গোসাবা সমবায় আন্দোলন ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছিল। তাঁর প্রজাদের মধ্যে সমবায় সম্পর্কে ধারণা প্রদানের পর নিজেদেরকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য একটি সমবায় ঋণদান সমিতি (Cooperative credit society) গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৩৭] গোসাবার সমবায় আন্দোলনে ইতিবাচকভাবে সামিল হয়েছিলেন সমবায় বিভাগের ইন্সপেক্টর মিস্টার অক্ষয় কুমার মিত্র। অক্ষয় কুমার মিত্রের তত্ত্বাবধানে ১৯১৫ সালে গোসাবা এবং আরামপুর গ্রামের ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে প্রথম সমবায় ব্যাংক 'গোসাবা ব্যাংক' (Gosaba Bank) স্থাপিত হয়েছিল।[৩৮] আর এই সমবায় ব্যাংকের প্রথম মূলধন দাতা হিসাবে স্যার ড্যানিয়েল ব্যাংককে ৫০০ টাকা প্রদান করেছিলেন। তবে এর পরিবর্তে তিনি বাৎসরিক ৯. ৩/৮% সুদ ধার্য করেছিলেন। তিনি একথাও বলেন যে প্রজাদের যদি আরও বেশি ঋণের প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত সুদে ভবিষ্যতেও মূলধন দেবেন।[৩৯] শুরুতে সমবায়ের প্রতি গোসাবার প্রজাদের তেমন কোনো উৎসাহ ছিল না। সমবায় সম্পর্কে তেমন কোনো জনমতও গড়ে ওঠেনি। সমবায়ের মূল সত্য ও সার্থকতার সন্ধান জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়নি। গোসাবার জনগণ তখনও বুঝতে পারেনি পৃথিবীতে তাদের মত অসহায় কৃষকদের দুঃখমোচনে যেসব পদ্ধতি বা উপায় আবিষ্কার হচ্ছে বা হয়েছে তার মধ্যে সমবায় প্রণালী ও সমবায় প্রচেষ্টা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এইসব বিষয়ে প্রজাদের সচেতন করার জন্য সমবায় সংগঠনের ইন্সপেক্টর হিসাবে শ্রী অক্ষয় কুমার মিত্রের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন শ্রী নরেন্দ্র নাথ বসু। তার পাশাপাশি এস্টেটের ম্যানেজার শ্রী সুধাংশু ভূষণ মজুমদার ও সহকারি রেজিস্ট্রার শ্রী প্রিয়কান্ত রায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তারা সকলকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে,

সমবায় আর কিছুই নয় সঙ্গবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রচেষ্টা। নিজেদের পরস্পরের সমান অর্থনৈতিক স্বার্থকে ঐক্যবদ্ধ করা। এসবের ফলে গ্রামে গ্রামে সমবায় ব্যাংক গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। তবে এর সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল না। কারণ অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছিল যে, ড্যানিয়েল সাহেব তাঁর প্রজাদের বকেয়া ঋণ পরিশোধের জন্য এবং বর্তমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য এস্টেট থেকে সহজ শর্তে অর্থ সাহায্য দিচ্ছে, ফলে কৃষকরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পছন্দ করছে না। তৎকালীন সমবায় পরিদর্শকদের পরামর্শ অনুযায়ী এস্টেট অর্থ সাহায্য বা ঋণ প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ দশটি গ্রামের কৃষকরা খুব অল্পসময়ের মধ্যে তাদের নিজ নিজ সমবায় ঋণদান সমিতি (Cooperative Credit Societies) সংগঠিত করেছিল।[৪০] এই ঘটনা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে কৃষকরা এস্টেট দ্বারা পরিচালিত হত এবং পরিস্থিতি দ্বারা বাধ্য না হলে সমবায় আন্দোলন শুরু করার উদ্যোগ নিত না। এরপর ১৯২৪ সালে এইসব ঋণদান সমিতিগুলিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে গোসাবায় প্রথম 'সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৪১] গ্রামে গ্রামে তার শাখাও গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল কৃষি কাজের জন্য গ্রামের কৃষকদের ঋণ পেতে যেন কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়।

হ্যামিল্টন সাহেব জানতেন যে বাংলার কৃষকরা নিজেদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা করে নিজেরাই নিজেদেরই সর্বনাশ করছিল। তাই আইনজীবী, পুলিশ এবং আইন-আদালতের হাতে কৃষকদের অর্থ নিষ্কাশন রোধে তিনি ১৯১৬ সালে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এস্টেটের কোনো কৃষক কোনো প্রকার বিরোধকে আদালত বা থানা পর্যন্ত নিয়ে যাবে না।[৪২] তবে এইসব বিচার বিবেচনা করার জন্য গ্রামের ব্যাংককে কেন্দ্র করে গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে উঠেছিল। কোনো প্রকার সমস্যা বা বিপত্তি উৎপন্ন হলে গ্রামের লোক নিয়ে গঠিত পঞ্চায়েত তার সমাধান করে দিত। এই গ্রাম্য ব্যাংকের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভার ছিল গ্রামের লোকেদের উপর। ব্যাংক থেকে ঋণ

পাওয়ার অগ্রাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রেও মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করত এই পঞ্চায়েত।[৪৩] সমবায় ব্যবস্থা বিকাশে স্যার হ্যামিল্টনের মূল উদ্দেশ্য ছিল গোসাবাবাসীদের প্রতিটি দিক থেকে স্বনির্ভর করে তোলা। স্যার ড্যানিয়েল বিশ্বাস করতেন যে, এইসব সমবায় ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থাগুলি গ্রামবাসীদের এই শিক্ষায় শিক্ষিত করবে, যাতে তারা তাদের জীবন পরিচালনার জন্য সরকার বা অন্য কোনো শক্তিশালি গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে।[৪৪]

এইসব কর্মকাণ্ডের ফলে গোসাবার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোক দেখতে এসেছিল কেমন করে শ্বাপদ-সংকুল একটি অঞ্চল সমবায়তীর্থে পরিণত হয়ে উঠেছে। গোসাবার লোকহিতকর এই ব্যবস্থা চাক্ষুষ দেখতে একদিন পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বাসন্তী জমিদারদের অন্যতম অংশীদার ও খ্যাতনামা অ্যাডভোকেট ও দেশকর্মী সনৎকুমার রায় চৌধুরীও গোসাবায় এসেছিলেন এবং হ্যামিল্টনে সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি স্যার ড্যানিয়েলের এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্মযজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন স্যার ড্যানিয়েল যে লোকহিতকর কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন, সেটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অক্লান্তভাবে কাজ করে যাবেন।

এখানেই স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টনের জনহিতকর কর্মগুলির সমাপ্তি ঘটেনি। পূর্বোল্লিখিত এইসব সমবায় সংগঠন ও বিভিন্ন জনকল্যাণকর কাজগুলি গোসাবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রয়োজন বেড়ে চলেছিল। তাই ১৯১৮ সালে স্যার ড্যানিয়েল গোসাবাতে একটি সাপ্তাহিক হাট বসানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। সপ্তাহের শেষে প্রতি শনিবার করে বসত সেই হাট। আশেপাশে তখনও কোনো স্থায়ী দোকান না থাকায় সপ্তাহ অন্তে এই হাট-ই ছিল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনার একমাত্র বাজার। এই অসুবিধাকে কাজে লাগিয়ে যেসব ব্যবসায়ী

এখানে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করতে আসত তারা বিভিন্ন উপায়ে ওজনে ঠকানো, দাম বেশি নেওয়া ও ভেজাল জিনিস প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের ঠকাতে শুরু করেছিল। গোসাবাবাসীদের এইসব অসুবিধা দূর করতে এবং ওজনে, দামে ও খাঁটি জিনিসপত্র সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে সুধাংশু বাবুর প্রস্তাব অনুসারে স্যার ড্যানিয়েল ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 'গোসাবা সমবায় ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৪৫] গোসাবার প্রত্যেকটি নাগরিক এই সমবায় ভাণ্ডারের সদস্য ছিল এবং প্রতিটি সদস্য তাদের মোট বাৎসরিক ক্রয়ের উপর ছাড় পেত।

গোসাবার অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে স্যার হ্যামিল্টন প্রায় প্রতিটি গ্রামে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার সর্বাধিক বিস্তার ঘটাতে এবং সর্বশ্রেণির লোক যাতে লেখাপড়া শিখে প্রকৃত মানুষ হতে পারে সেজন্য প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এইসব নৈশ বিদ্যালয়গুলিকেও অবৈতনিক করা হয়েছিল। কেরোসিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের খরচ এস্টেটের তহবিল থেকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৪৬] শিক্ষকদের জীবনযাত্রা যাতে ভালোভাবে নির্বাহ হয় এবং তাদের যাতে কোনো প্রকার অভাব না হয় সেজন্য প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটস্থ তিন বিঘা জমি শিক্ষকদের দান করা হয়েছিল। তবে এইসব জমিগুলি শিক্ষার্থীদের কৃষি প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে হত। এখানে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ শিখতে পারত। এছাড়া প্রতিটি শিক্ষককে স্বতন্ত্রভাবে ১০ বিঘা জমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হয়েছিল। বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার কাজ যাতে ভালোভাবে তত্ত্বাবধান করা হয় সেজন্য কলিকাতার সেন্ট মার্গারেট বিদ্যালয়ের পরিদর্শক মিস হোয়াইটকে নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৯২০ সালে তিনি অবসর নিলে মিস্টার ম্যাকেঞ্জি বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৪৭] এভাবে ১৯২২ সালের মধ্যে তিনি এস্টেটের ১০০০০ মানুষের জন্য বিনামূল্যে পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে ২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২০টি নৈশ

বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। আর এই স্কুলগুলো চালানোর জন্য প্রজাদের কাছ থেকে এক আনা উপকর চালু করেছিলেন। এছাড়া ১৯২৩ সালে গোসাবাতে একটি নতুন মিডল ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ছেলে অরিন্দম নাথ প্রথম হ্যামিল্টন এস্টেট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন, যেটি পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদে বর্ণিত হয়েছে।[৪৮]

গতানুগতিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের পাশাপাশি বুনিয়াদি শিক্ষার যে বীজ তিনি গোসাবাবাসীর জন্য বপন করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেটি সর্বভারতীয় আদর্শ রূপে গৃহীত হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে প্রজাদের আহার্য এবং স্বাস্থ্য সমস্যা কিছুটা হলেও সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু পরিধেয় বস্ত্রের সমস্যা বা সংকট তখনও রয়ে গিয়েছিল। তাই এই সংকট মোচনে স্যার ড্যানিয়েল ১৯২১ সালে ভারতীয় ও ইংরেজি উভয় ধরনের তাঁত বুননের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। বহু অর্থ ব্যয় করে বিলাত থেকে হের্টারসিলুম ও ঢাকা থেকে চিত্তরঞ্জন লুম এনে বসিয়ে ছিলেন। বয়ন শিল্পে শিক্ষাদানের জন্য শ্রীরামপুর উইভিং স্কুল থেকে পাশ করা ছাত্রদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে বয়ন শিল্পকে স্কুলের পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ফলে এমন একদল কর্মঠ মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল যারা অবসর সময়ে তাঁত চালিয়ে বস্ত্র তৈরী করতে পারবে আবার চাষের সময় চাষও করবে।[৪৯] প্রজাদের মধ্যে এই তাঁত শিল্পের প্রসার ঘটানোর জন্য ১৯২৮ সাল থেকে স্যার ড্যানিয়েল সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় তিন বছরের মধ্যে গ্রামবাসীদের ৩০টি তাঁত বুননের মেশিনে কাজ করানো গিয়েছিল। এই বিষয়ে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, গোসাবার লোকেরা ধান চাষ করে যেমন ঘরের চালের খড় জোগান দেয় ঠিক তেমনি ভাবে বাড়ির সামনের জমিতে তুলো চাষ করে, সেই তুলো দিয়ে কাপড় বুনে কাপড়ের চাহিদা পূরণ করবে।[৫০]

এই-সময়কালের মধ্যে স্যার ড্যানিয়েলের বিষয়ে আরও একটি কথা উল্লেখ প্রয়োজন। ১৯২০ সালে গোসাবার অন্তর্গত রাঙাবেলিয়া পত্তন কালে কলেরা মহামারী আকার ধারণ করেছিল। কেউ কাউকে সেবা করার মত ছিল না। চারিদিকে আতঙ্কের কালোছায়া। মৃত্যুভয়ে সবাই পালাতে শুরু করেছিল। এই-সময় হ্যামিল্টন এস্টেটের চিকিৎসক ছিলেন কেবলমাত্র একজন সাহেব ডাক্তার। তিনিও ভয়ে রোগী দেখবার সাহস পাচ্ছিলেন না। ডাক্তারখানা থেকে শুধুমাত্র ঔষধ দিয়েই তাঁর দায়িত্ব পালন করছিলেন। এইসব মর্মান্তিক ঘটনা সুধাংশু বাবুর মুখে শুনে হ্যামিল্টন সাহেব আর ঘরে থাকতে পারেননি। তিনি সুধাংশু বাবুকে নিয়ে কলেরা রোগীদের ঘরে ঘরে গিয়েছিলেন। নিজের হাতে তাদের সেবা করেছিলেন এবং কলকাতা থেকে প্রচুর পরিমাণ প্রতিষেধক ঔষধ আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই চরম দুঃসময়ে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে চাষি প্রজাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন। পূর্বে যে দাতব্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয় খোলা হয়েছিল এই-সময় সেখানে একজন পাশ করা ডাক্তার ও দু'জন অভিজ্ঞ কম্পাউন্ডার নিয়োগ করেছিলেন। এইসব ডাক্তার ও কম্পাউন্ডারকে উচ্চ হারে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৩৪ সালে এন. বি. চক্রবর্তী নামে একজন ডাক্তারকে মাসিক ১২৫ টাকা বেতন এবং ৫ টাকা ঘোড়ার খরচ চালানোর জন্য দেওয়া হত।[৫১] এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন স্যার ড্যানিয়েল ১৯২৪ সালে তাঁর এস্টেটে একটি স্বাস্থ্য কমিটি গঠন করে সমগ্র এস্টেটকে ১২টি বিভাগে ভাগ করেছিলেন। তত্ত্বাবধানের জন্য যার প্রতিটিতে ছিল একজন করে কমিশনার।[৫২] সম্ভবত এস্টেটের সকল মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিকে সমান ভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এটি করা হয়েছিল। তবে স্বাস্থ্য কমিটির সদস্য রূপে প্রথম দিকে কমিটিতে কোনো কৃষক প্রতিনিধি ছিল না। ডাক্তারকে মাঝেমধ্যে রোগীর বাড়িতে গিয়ে পরিষেবা দিতে হত। ১৯২৭ সালে স্যার ড্যানিয়েল এস্টেটের নিরক্ষর মহিলাদের মাতৃত্বকালীন অসুবিধা, শিশুর

সুস্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষাদান এবং প্রসবের সময় সাহায্য করার জন্য একজন প্রশিক্ষিত ধাত্রী নিয়োগ করেছিলেন।[৫৩]

স্যার ড্যানিয়েল নিজে যেমন সৎ চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন, তেমনি তাঁর এস্টেটের কৃষকদের চরিত্রের সার্বিক উন্নতির কথা ভাবতেন। তিনি তাঁর এস্টেটের কোনো প্রজার মধ্যে যদি কোনো প্রকার দুর্বল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতেন তাহলে প্রথমে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করতেন। পরবর্তীতে তাতেও যদি কাজ না হত তাহলে তাকে এস্টেট ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। তাঁর এস্টেটে তামাক সেবন ব্যতীত মদ, আফিম ও গাঁজার মত নেশা নিষিদ্ধ ছিল। ১৯১৭ সালে তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট গোসাবা বাজারে মদের দোকান খোলার চেষ্টা করলে স্যার হ্যামিল্টন তার বিরোধিতা করেছিলেন। এরপর আবগারি বিভাগ তাঁর এস্টেটের নিকটবর্তী ১৫০ নং লটে মদের দোকান খোলে। কিন্তু সেটিরও বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। ১৯২০ সালে বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড রোনাল্ডশ (Lord Ronaldshay) গোসাবা এস্টেট পরিদর্শনে এসে হ্যামিল্টনের গৃহীত পদক্ষেপগুলি দেখে এতটাই সন্তুষ্ট হয়ে ছিলেন যে, তাঁর আদেশে ১৫০ নং লট থেকে মদের দোকান সরিয়ে দূরবর্তী মসজিদবাড়ী অঞ্চলে বসানো হয়েছিল। এভাবে হ্যামিল্টন তাঁর এস্টেটের প্রত্যেকটি অধিবাসীকে মদ বর্জিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করেছিলেন।[৫৪]

জঙ্গল পরিষ্কার, বাঁধ নির্মাণ করে নোনা জল আটকে বসতি স্থাপন ও চাষের জমি তৈরী করার পরেও গোসাবাবাসীর খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ১৯১৯ সালে স্যার ড্যানিয়েল সবজি-ফল ও বিশেষ ধরনের ধান উৎপাদনের জন্য আদর্শ খামার (মডেল ফার্ম) তৈরী করেছিলেন। প্রথম দিকে গোসাবাতে চাষের জন্য উন্নত মানের বীজ পাওয়া যেত না। ফলে বেশি মাত্রায় ফসল ফলানো সম্ভব হত না। স্যার ড্যানিয়েল তাঁর জমিদারির প্রজারা যাতে অধিক ফসল ফলাতে সক্ষম হয়, ভালো মানের বীজ সংগ্রহ করতে পারে এবং কাজের

অভিজ্ঞতা পেতে পারে সেজন্য ১৯১৯ সালে গ্রামের প্রতিটি স্কুল সংলগ্ন জমিতে একটি আদর্শ কৃষি খামার স্থাপন করেছিলেন।[৫৫] তাঁর অনুরোধে সরকার একজন অভিজ্ঞ কৃষিবিদ নিযুক্ত করেছিলেন। অধিক শস্য ফলন কিভাবে সম্ভব সে বিষয়ে সর্বপ্রকার গবেষণা শুরু হয়েছিল। এইসব কাজের যাবতীয় ব্যয়ভার ড্যানিয়েল তাঁর জমিদারি থেকে বহন করেছিলেন। দীর্ঘ সাত থেকে আট বছরের পরিশ্রমের সাফল্য হিসাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল উৎকৃষ্ট পাটনাই ধান উৎপাদনের পদ্ধতি। গোসাবার নামে নাম দেওয়া হয়েছিল গোসাবা ২৩ নম্বর পাটনাই। এটি বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এটি ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছিল। কারণ আগে একজন কৃষক প্রতি বিঘা জমিতে ৬ মণ ধান উৎপাদন করতে সক্ষম হত। সেখানে গোসাবা ২৩ নাম্বার পাটনাই চাষে ১০ মণ ধান উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল।[৫৬] স্যার ড্যানিয়েল অধিক শস্য ফলন এই আন্দোলনটিকে প্রচার করার জন্য প্রতিবছর গোসাবাতে অধিক ধান উৎপাদনের একটি প্রতিযোগিতা চালু করেছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি চাষিদের হাতে ১০০০ টাকা মূল্যের একটি পুরস্কার তুলে দিতেন। সেরা চাষিদের জন্য এই পুরস্কারের অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল ২০০০ টাকা। এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি ফলন এর রেকর্ড ছিল প্রতি বিঘাতে ১৭ মন ৩৮ সের পাটনাই উৎপাদন।[৫৭]

সহজ ঋণের সুবিধা ও অধিক ফলন যুক্ত বীজের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কৃষকরা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার হাল ফেরাতে পারছিল না। কৃষকরা তাদের উদ্বৃত্ত পণ্য উৎপাদন থেকে লাভবান হতে পারছিল না। কারণ পর্যবেক্ষন করে দেখা গিয়েছিল কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রতারণাকারী মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। তাই কৃষক আর বাজারের মধ্যে থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের হঠাতে স্যার ড্যানিয়েল ১৯২৩ সালে গোসাবাতে ‘সমবায় ধান বিক্রয় সমিতি’ (Cooperative paddy-sale society) স্থাপন করেছিলেন।[৫৮]

বস্তুতঃ কৃষি সমবায় আন্দোলনের একটি বিশেষ নীতি হল সমবায় প্রথায় বিক্রয় ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই ধান বিক্রয় সমিতি কৃষকদের প্রয়োজনে অগ্রিম ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেছিল। যেটি দাদন (Dandan) নামে পরিচিত ছিল। এর ফলে কৃষক দুই দিক থেকে সুবিধা পেয়েছিল, একদিকে উদ্বৃত্ত ফসল সরাসরি ধান বিক্রয় সমিতিকে দিয়ে মহাজনের শোষণের থেকে রক্ষা পেয়েছিল। অন্যদিকে চাষের বা সংসারের প্রয়োজনে দাদনের মাধ্যমে অগ্রিম অর্থ পেয়ে প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ পেয়েছিল। কৃষকের উৎপাদনের হার বিবেচনা করে যে দাদন তাকে দেওয়া হত সে দাদনের টাকা পরিশোধ করেও কৃষক যথেষ্ট টাকা সঞ্চয় করতে পারত। প্রথমে ধান বিক্রয় সমিতির সংগৃহীত ধান কলিকাতার ধানের আড়তে বিক্রয় করা হত। কিন্তু সেখানেও সমিতির নিজস্ব আড়ত না থাকায় উপযুক্ত ওজন ও মূল্য বিষয়ক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এই সমস্যা সমাধান করার জন্য স্থাপিত হয়েছিল 'কেন্দ্রীয় সমবায় ধান বিক্রয় সমিতি'।[৫৯] এর ফলে তারা আরও লাভবান হয়েছিল এবং লাভের অংশ ধান বিক্রয় সমিতির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। এভাবে কিছুদিন চলার পর স্যার ড্যানিয়েল চিন্তা করে দেখেছিলেন যে, যদি ধান বিক্রয় না করে চাল বিক্রি করা যায় সে ক্ষেত্রে বেশি মুনাফা লাভ হতে পারে এবং আরও বেশি সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান বাড়ানো সম্ভব হবে। তাই তিনি ১৯২৭ সালে সমবায় ধান বিক্রয় সমিতির স্থলে নির্মাণ করেছিলেন 'সমবায় রাইস মিল'।[৬০] বঙ্গের সমবায় সমিতি সমূহের তদানীন্তন রেজিস্ট্রার শ্রী যামিনী ভূষণ মিত্রের স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই চাল কলের নাম দেওয়া হয়েছিল যামিনী রাইস মিল।[৬১] এটি তৈরীর জন্য এস্টেট প্রাথমিকভাবে কিছু মূলধন এবং করমুক্ত সাড়ে সাত বিঘা জমি সমবায় রাইস মিলকে দিয়েছিল। এছাড়া রাইস মিল শেয়ার থেকেও অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল। যে-কোনো কৃষক ১০ টাকার বিনিময়ে রাইস মিলের শেয়ার ক্রয় করতে পারতেন।[৬২] রাইস মিলের বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি আরও একটি বিষয় এখানে বলা প্রয়োজন তা'হল স্যার ড্যানিয়েল এবং

এস্টেট কতৃপক্ষ 'কোঅপারেটিভ স্টোরের' মাধ্যমে গোসাবাবাসীকে খাঁটি সরিষার তেল প্রদানের জন্য রাইস মিলের সঙ্গে ঘানি তৈরীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাইস মিল পরিচালাকবর্গ ঘানি প্রস্তুতের জন্য অর্থ খরচ নিরর্থক হবে ভেবে দ্বিধাগ্রস্থ হলে হ্যামিল্টন সাহেব কোনো প্রকার সুদ ছাড়াই ঋণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, এমনকি লাভ হলে তারপর টাকা নেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[৬৩] যাইহোক, এইসব চাল-কল এবং ঘানি গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সমবায় আন্দোলন এক নতুন গতি পেয়েছিল। চাল-কলকে কেন্দ্র করে সমগ্র গোসাবা এস্টেটের ঋণদান এবং সংগ্রহের ব্যবস্থাটি কেমন ভাবে পরিচালিত হত তা একবার বর্ণনা করে নেওয়া প্রয়োজন। এখানে কৃষি ঋণ দেওয়ার সময় থেকেই লক্ষ্য রাখা হত কৃষকগণ যেন কোনোভাবে সেটি অপচয় না করে। প্রতিটি ফসল কাটার মরসুমের আগে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তার সদস্যদের কার কত টাকা দেনা আছে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করত। এরপর সেই তালিকাটিকে গোসাবা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকে পাঠানো হত। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ তালিকা সমবায় রাইস মিলকে প্রেরণ করত। অন্যদিকে এস্টেট থেকেও সমিতির প্রত্যেকটি সদস্যের এবং প্রজাদের কার কত টাকা খাজনা বাকি আছে তার একটি তালিকা তৈরী করে সমবায় রাইস মিলকে পাঠাত। অতঃপর শস্য কেটে সংগ্রহ করা শেষ হলে সংগৃহীত শস্য বিক্রয়ের জন্য চাল-কল বা রাইস মিলের নিকট জড় করা হত। সমবায় রাইস মিল সমিতি ধান দাতাকে চলতি বাজার দর নির্ধারণ করে একটি রশিদ দিয়ে দিত। এরপর ধান বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গেলে চাল-কল এস্টেটের এবং ব্যাংকের পাওনা কেটে নিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ সমিতির সদস্য এবং প্রজাদের কাছে প্রেরণ করত বা তারা নিজেরাই প্রয়োজন মত সংগ্রহ করে নিত।[৬৪]

এইভাবে স্যার ড্যানিয়েল সমগ্র এস্টেট জুড়ে যেসব সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, তাদের প্রত্যেকটিকে একে অন্যের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁদের কাজ সুনিপুণ দক্ষতায় সম্পন্ন করত। কোনো প্রকার জটিলতার লক্ষণ সেখানে ছিল না। সমবায়

প্রথার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত প্রজাকে একটি সমবায় প্রকল্পের অধীনে আনা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল নগদ অর্থের বব্যহার প্রচলন করে কৃষক প্রজাদের বেহিসেবী ব্যয়ে রাশ টানা। সমসাময়িক একটি সরকারি প্রতিবেদন থেকে জমির মালিক ও কৃষক সমাজের লেনদেনের প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ দ্বারা উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

'As soon as paddy is harvested, members generally deposit their entire saleable produce with the sale society obtain a "hatchitta" (note of hand) for the money value of the crop calculated at the current market price. The society receives a list of dues of every member to his primary society through the Central Bank and a list of rent due to the landlord. The sale Society proceeds to set off those dues against the deposit of grain and obtains the receipts for the payment made to the landlord on behalf of the member. These receipts are ultimately handed over to the members and the amount involved debited in "hatchitta" while the rural society gives him credit for the amount on the advice of the Central Bank. It is interesting to note that there is generally a surplus after necessary adjustment which the members can drew upon at his will.'[৬৫] হ্যামিল্টন সাহেব প্রবর্তিত সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন কৃষকের উদ্বৃত্ত উৎপাদন সমাজের যে-কোনো শ্রেণির জরুরি চাহিদা পূরণ করতে পারত। এমনকি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সাহায্য করত। প্রক্রিয়াটি ছিল এইরূপঃ একজন কৃষক তার চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত উৎপাদনগুলিকে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের কাছে জমা দিত। ব্যাংক আবার সেই উদ্বৃত্তগুলিকে তার অধীনস্থ গ্রাম সমিতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অথবা খরা বা দুর্যোগের কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত

হলে যখন সমাজের কিছু অংশের মানুষের ঋণের প্রয়োজন পড়ত তখন সেগুলিকে ঋণ হিসাবে বিনিয়োগ করত। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক অন্যান্য বিভাগের উদ্বৃত্ত থেকে সেই চাহিদা পূরণ করত। সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে স্যার ড্যানিয়েল তাঁর এস্টেটে অর্থ আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে চেক প্রবর্তন করেছিলেন। ফলস্বরূপ কৃষকদের হাতে নগদ অর্থের জোগান কমে গিয়েছিল, যেটি অর্থের অপচয় রোধ এবং ঋণে জর্জরিত হওয়ার হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছিল।[৬৬]

স্যার ড্যানিয়েলের সমবায় প্রকল্পের সংগঠনগুলির কাজ ছিল একে অপরের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বা অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা প্রদান করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, রাইস মিল থেকে ধান ভাঙ্গানোর পর সেই চাল বিক্রয়ের জন্য কলকাতায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সমবায় ধান বিক্রয় সমিতির কাছে পাঠানো হত। এরপর ধান বিক্রয় সমিতি এবং গোসাবা রাইস মিল অথবা যামিনি রাইস মিল উভয়েই চাল বিক্রি করে যে অর্থ উপার্জন করত তার সবটুকু সঞ্চিত রাখত রাইস মিল একাউন্টে। কেন্দ্রীয় সমবায় ধান বিক্রয় সমিতির চালের প্রয়োজন হলে তারা কলকাতা থেকে গোসাবা রাইস মিল কর্তৃপক্ষের নিকট খালি নৌকা বা বোট পাঠিয়ে দিত। রাইস মিল কর্তৃপক্ষ বোট ভর্তি চাল কলকাতার বাজারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করত।[৬৭] এরফলে পণ্য সরবরাহের পরিবহন মূল্য যেমন কমানো সম্ভব হয়েছিল, তেমন কলকাতার বাজার মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভোগ্যপণ্যগুলি সমগ্র এস্টেটের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এই সুবিধাগুলো ছাড়াও সমবায় ধান বিক্রয় সমিতি ও রাইস মিলের অংশীদার হিসাবে কৃষকও লভ্যাংশের ভাগ পেত।

এভাবে প্রায় সমস্ত গ্রামে সমবায় সমিতি গড়ে তোলার পর স্যার ড্যানিয়েল প্রজাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য ১৯২৯ সালে 'সমবায় ধর্মগোলা' গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। সমবায় ধর্মগোলা ছিল এক কৃষি বীমা পদ্ধতি। খরা, দুর্ভিক্ষের মত অনভিপ্রেত ঘটনা থেকে

প্রজাদের রক্ষা করতে গড়ে তোলা হয়েছিল এটি। প্রতিবছর প্রজারা যে পরিমাণ ধান ধর্মগোলাতে জমা দিত সেই পরিমাণ ধান এস্টেটের তরফ থেকেও জমা দেওয়া হত। এই ধর্মগোলা পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর। পঞ্চায়েতরা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে গ্রামবাসীদের প্রয়োজনে ধান ধার দেওয়া এবং ধান আদায়ের ব্যবস্থা করত। যেসব গ্রামবাসী ধর্মগোলা থেকে সাহায্য হিসাবে ধার নিত মরসুম শেষে ধান সংগ্রহের সময় তাদেরকে ২৫ শতাংশ মুনাফা সমেত ফেরত দিতে হত। এভাবে বছরের পর বছর ধর্মগোলা বিভিন্ন আকস্মিক ঘটনায় কৃষকদের সাহায্য করত। ফলস্বরূপ ধর্মগোলার মুনাফাও বৃদ্ধি পেয়েছিল পাশাপাশি অধিক সংখ্যক লোকের অভাব মোচনের সুযোগও হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে সর্বত্রই যখন অনাহারে মৃত্যু হয়েছিল তখন এইসব ধর্মগোলাগুলি গোসাবার সহস্র অধিবাসীকে রক্ষা করতে পেরেছিল।[৬৮]

পূর্বোল্লিখিত আলোচনায় হ্যামিল্টন সাহেবের সমবায় চিন্তার মাধ্যমে বিভিন্ন জনহিতকর কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু সেটিকে জীবন্ত করে রাখা, প্রচার করা ও প্রয়োগ করার জন্য সমবায়ের আদর্শে বিশ্বাসী একদল যুবকের প্রয়োজন হয়েছিল। এই প্রয়োজন থেকে হ্যামিল্টন সাহেব ১৯৩২ সালে গোসাবাতে গ্রামীণ সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৩৪ সালে এটি 'গ্রামীণ পুনর্গঠন ইন্সটিটিউশন (Rural Reconstruction Institution)' নামে পরিচিত হয়েছিল।[৬৯] এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবকদের স্বনির্ভর করে তোলা।[৭০] রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ড্যানিয়েলের শিক্ষা দর্শনও ছিল রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল গলদ সম্পর্কে সর্বদা অবহিত ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যে শিক্ষা মানুষকে স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ এবং গৃহস্থ জীবনের পক্ষে উপযুক্ত মানসিকতা তৈরী করতে সাহায্য করে না প্রকৃতপক্ষে সে শিক্ষা, দেশে কতগুলি শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি করে। একজন

যুবক যদি নিজের জীবনধারণের জন্য খাদ্য উৎপাদন, পরনের জন্য বস্ত্র তৈরী এবং বসবাসের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করতে পারে। তাহলে সে নিজের জীবনকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে। শিক্ষার এইরূপ নতুন দিশার মাধ্যমেই হ্যামিল্টন স্বনির্ভর গ্রামীণ ভারতবর্ষ তৈরীর স্বপ্ন দেখেছিল। তাই স্বনির্ভরতার জন্য সমবায়ের চিন্তা এবং সেই সমবায়ের চিন্তা প্রসারের জন্য নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হাজার হাজার কর্মী গড়ে তোলার জন্যই লেডি হ্যামিল্টনের হাত দিয়ে ১৯৩২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি 'রুরাল রিকন্সট্রাকশন ইনস্টিটিউশন, শিক্ষা কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। স্বনির্ভর জীবিকা অর্জনের জন্য যেসব বিষয় এখানে পঠন-পাঠন হত তার মধ্যে ছিল কৃষি, গবাদি পশু পালন, বয়ন শিল্প, সমবায়, হিসাব রক্ষণ, অর্থনৈতিক ভূগোল, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি। প্রথম দিকে চর্ম শিল্প সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল বলেও জানা যায়।[৭১] বস্তুত প্রকৌশলী বিদ্যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের জন্য এটি ছিল ভারতের প্রথম প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে একটি অবৈতনিক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় চালু করা হয়েছিল। এই উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে কৃষি ও বয়ন-বিদ্যার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাশাপাশি নানান প্রগতিশীল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল এবং ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৭২] সমসাময়িক অর্থনীতিতে মুদ্রার ঘাটতি অথবা কম মূল্যের নোটের অতিরিক্ত ঘাটতি লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরী করেছিল। হ্যামিল্টন তাঁর জমিদারিতে এই সমস্যা মেটাতে তৎকালীন অর্থ বিভাগের অধিকর্তা স্যার জেমস গ্রীককে নানা যুক্তি প্রদর্শন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছিলেন যে, ভারতের কোটি কোটি কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নতির উপায় হল ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি। তিনি মনে করতেন হার্ড ক্যাশ (Hard Cash) অর্থাৎ স্বর্ণ অথবা রৌপ অপেক্ষা পেপার ক্যাশ (Paper Cash) অনেক ভালো "Such is the difference between hard cash and credit. The one

starves a nation, because there is not enough to go round; and what there is, is in the wrong hand. The hands of the moneylender or the non-producers: the other feeds it, because it can be manufactured so cheaply, and issued in quantity sufficient to employ every man in productive or constructive work."[৭৩] তাই ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে এবং কম মূল্যের মুদ্রা ঘাটতি মেটাতে ১৯৩৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে অনুমতি নিয়ে হ্যামিল্টন সাহেব তাঁর এস্টেটে ১ টাকার নোট প্রচলন করেছিলেন। এটি কেবলমাত্র তাঁর জমিদারির এক্তিয়ারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুত পাশ্চাত্য দেশগুলির জাতীয় ব্যাংকগুলি স্বল্প স্বর্ণমুদ্রার ভিত্তিতে নোট প্রচলন করে জনসাধারণের হস্তে অনেক বেশি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা বিতরণ করেছিল। সেখানে গোসাবা জমিদারিতে ব্যাংকগুলি রৌপ্য মুদ্রার ভিত্তিতে নোট প্রচলন করেছিল। কৃষকরা এই নোট কেবলমাত্র রৌপ্য মুদ্রার সাথে বিনিময় করতে পারত। কৃষকরা ব্যাংক থেকে কাগজের নোট অথবা মুদ্রার বিনিময়ে ঋণ নিতে পারত। এভাবে স্যার ড্যানিয়েল-এর এস্টেটে কাগজের নোটের ব্যবহার ব্যবসা-বাণিজ্যকে সহজ করেছিল এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনতে সক্ষম হয়েছিল।[৭৪]

১৯৩২ সালের মধ্যে স্যার ড্যানিয়েল এবং তাঁর সহযোগী সুধাংশু ভূষণ মজুমদার ও অন্যান্যরা তাদের সমবায় স্বপ্নকে অনেক অংশে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে সাতজেলিয়া দ্বীপের জমি পুনরুদ্ধার পর্ব প্রায় সমাপ্ত হয়েছিল। জমি হাসিলের সম্পূর্ণ খরচ স্যার ড্যানিয়েল নিজেই বহন করেছিলেন। তবে এই দ্বীপের একটি গ্রাম বা প্রতিষ্ঠানের নামও নিজের নামে রাখেননি। সাতজেলিয়া দ্বীপের বেশিরভাগ গ্রামের নামকরণ করা হয়েছিল, গোসাবা এস্টেট তৈরীর সহযোগীদের নামে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, জটিরামপুরের নামকরণ করা হয়েছিল জটিরাম নামক একজন কৃষকের নামে। একইভাবে

সুধাংশু ভূষণ মজুমদার এর নামে সুধাংশু পুর এবং যামিনী ভূষণ মিত্রের নামে মিত্রবাড়ির নামকরণ করা হয়েছিল।[৭৫]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৩২ সালে যারা সাতজেলিয়া দ্বীপে জমি নিতে এসেছিল তাদেরকে বিঘা প্রতি ৮ টাকা সেলামি এবং ৩ টাকা বার্ষিক খাজনা দিতে বলা হয়েছিল। সাধারণত একজন কৃষককে প্রথম দিকে মোট সেলামির ৬ থেকে ৭ শতাংশ নামমাত্র অর্থ দিতে হত। কিন্তু সম্পূর্ণ জমি দখল করার সময় সেলামির পুরো টাকাটাই পরিশোধ করতে হত। টাকা পরিশোধের পর জমি দখলকারীকে একটি পাট্টা প্রদান করা হত। সুন্দরবনের অন্যান্য অংশে সেলামির অর্থপ্রদানের এই বিষয়টিকে মৌখিকভাবে করা হলেও হ্যামিল্টন আবাদে এই বিষয়টিকে লিখিত আকারে সংরক্ষিত করা হত। এস্টেটের ম্যানেজার প্রজাদের বা কৃষকদের অর্থ প্রদানের বিনিময়ে একটি রসিদ প্রদান করতেন। ফলে কাকদ্বীপের মত হ্যামিল্টন আবাদের কৃষকদের, যারা জমি গ্রহণের বিনিময়ে সেলামির অর্থ প্রদান করেছিল তাদেরকে কখনোই চকদার, নায়েব ও ম্যানেজার কর্তৃক প্রতারিত হতে হয়নি।[৭৬]

এভাবে ১৯৪০ সালের মধ্যে সমগ্র হ্যামিল্টন আবাদের মোট গ্রামের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৫টি এবং জনসংখ্যা হয়েছিল ১২০০০ জন। গ্রাম সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ২১টি অর্থাৎ প্রতিটি গ্রাম প্রায় একটি করে সমবায় সমিতির অধীনে ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুটি ছোটো গ্রাম নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ ৩০ বছর আগে যে অঞ্চলে কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, যে অঞ্চল গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল, সেই অঞ্চলে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল, গড়ে উঠেছিল ছোটো-ছোটো গ্রাম।[৭৭] এই সমগ্র আবাদটি কেবলমাত্র জল-জঙ্গল ঘেরা অঞ্চলকে ধানের জমিতে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠেনি। ড্যানিয়েল সাহেব এটিকে একটি আদর্শ গ্রাম, একটি স্বনির্ভর সমাজ এবং সমাজে বসবাসকারী মানুষগুলোকে চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলার অভিপ্রায় নিয়ে এই কাজ শুরু করেছিলেন। এখানে ছিল না

কোনো মহাজন বা ঋণের কারবারি, ছিল না কোনো মাদকাসক্ত ব্যক্তি। সমগ্র কৃষিঋণ পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সমবায় সমিতির অধীনস্থ সমবায় ব্যাংকগুলির উপর। আবার ব্যাংকগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েত কৃষি ঋণ পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি জন্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করত। গোসাবার কৃষকরা মাথাপিছু ৩০ বিঘা করে জমি নিজেদের অধীনে রেখেছিল। এছাড়াও প্রত্যেকটি কৃষকের একটি নিজস্ব বাড়ি, সবজি চাষের জন্য একটি প্লট এবং মাছ চাষের জন্য একটি পুকুর ছিল। প্রতিটি পরিবারের খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তার জন্য সবজি, উন্নত মানের ধান, দুধ ও মাছের পর্যাপ্ত যোগান ছিল। এইসব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য হ্যামিল্টন আবাদের অধিবাসীদের দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী কোনো প্রকার ঋণ গ্রহণ করতে হয়নি।[৭৮] গ্রামগুলির নিজস্ব পঞ্চায়েত গ্রামের কল্যাণকর কার্য পরিচালনা এবং ন্যায় বিচারের আদালত হিসাবে কাজ করত। এছাড়াও জমিদার ও গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করত এই পঞ্চায়েত। দীর্ঘ ৩০ বছরের এই-সময়কালে এমনকি সরকারি জরিপ ও নিষ্পত্তির কাজকর্ম চলাকালীন সময়ে অফিসারদের সামনে কোনোরকম বিবাদের ঘটনা ঘটেনি। প্রজার সাথে প্রজার এবং জমিদারের সাথে প্রজার সংঘটিত বিবাদকে কেন্দ্র করে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। বিবাদের ঘটনা সংঘটিত হলে আদালতে যাওয়ার আগেই পঞ্চায়েত কর্তৃক সেটি নিষ্পত্তি হয়ে যেত।[৭৯] চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পেতে চাষিদের কোনো প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। শস্য উৎপাদনের মরসুমের শুরুতেই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক (সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক) চাষিদের অগ্রিম অর্থ প্রদান করত। ব্যাংকের তহবিল বৃদ্ধির প্রয়োজনে স্যার ড্যানিয়েল নিজে বহুবার অর্থ প্রদান করেছিলেন। জনগণের মধ্যে সমবায়ের চেতনা এতটাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল যে, দোকান থেকে শুরু করে ধান বিক্রি সবক্ষেত্রেই সমগ্র এস্টেট

বিশেষভাবে তৈরী প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করেছিল। সমবায় ভাণ্ডারগুলি জনগণের মালিকাধীন ছিল এবং তাদের সাধারণ চাহিদাগুলিকেও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা হত। এস্টেটে কোনো মদের দোকান ছিল না। একমাত্র মাদক যেটি জনসংখ্যার কিছু অংশকে আসক্ত করেছিল তা'হল তামাক। একসময়ের জলাভূমি গোসাবা স্যাঁতসেতে পরিবেশ মুক্ত এক স্বাস্থ্যকর ভূমি যেখানে কোনো প্রকার মশা বা মশাবাহিত ম্যালেরিয়ার অস্তিত্ব ছিল না। গোসাবাতে বসতি স্থাপনের সূচনাতে যেসব মানুষ সঙ্গে করে কেবলমাত্র লোটা আর ধুতি ছাড়া অন্য কিছুই নিয়ে আসেনি তারা এখন জমির মালিক। তারা দেখেছিল যে, জমি চাষের জন্য প্রদত্ত মজুরি খরচ বাদে যে অর্থ তারা সঞ্চয় করতে পারবে তা দিয়ে জমি দখলের সেলামি অর্থ পরিশোধ করতে তাদের কোনো প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। এমনকি সব খরচ মেটানোর পরেও তাদের হাতে কিছু পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় আকারে থেকে যাবে। এভাবে একজন শ্রমিক প্রজার অধিকার লাভ করতে পারত। একজন প্রজা হিসাবে প্রয়োজনের সময় অর্থ ধার থেকে শুরু করে একে-অপরের সহযোগিতার মূল্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল। স্যার ড্যানিয়েলের অনুপ্রেরণায় এবং সমবায় মন্ত্রের মাধ্যমে গোসাবা অধিবাসী তাদের চরিত্র গঠন করতে পেরেছিল। চাষিবাসি গোসাবাবাসী উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, পূর্ণ এবং সুখী জীবন গঠন তাদের নিজেদের হাতেই।[৮০] স্যার হ্যামিল্টন তাঁর সমবায় আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন বাংলার জল-জঙ্গল ঘেরা দ্বীপ গোসাবাতে এটা ঠিক কিন্তু এর মাধ্যমে শুধুমাত্র বাংলা নয় সমগ্র ভারতীয় জাতির কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন ২৫০ মিলিয়ন মানুষ নিয়ে গঠিত সাত লক্ষ গ্রামই ছিল ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। গ্রামগুলির অবস্থা এতটাই সঙ্গীন ছিল যে, হ্যামিল্টন তাঁর সমবায়ের প্রথম লক্ষ্য হিসাবে গ্রামগুলিতে অর্থায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি গ্রাম তৈরীর যেটি সমবায় সমিতির অধীনে থাকবে এবং এর কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধান

তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকবে এইসব বিষয়ে পারদর্শী বা প্রশিক্ষিত কর্তা-ব্যক্তিদের উপর। সমবায় ছিল সমগ্র ভারতকে দারিদ্রতা থেকে মুক্ত করার একমাত্র পথ। তিনি বিশ্বাস করতেন সাধারণ ভারতবাসীর জীবন-মরণের সমস্যা সমাধান করতে পারে কেবলমাত্র সমবায় নীতি। তিনি মনে করতেন রায়ত-ই ভারতের কৃষি অর্থনীতির মূল ব্যক্তি। কিন্তু তারাই আজ দেউলিয়া। রায়ত দেউলিয়া হওয়ার কারণে ভারতের অর্থনীতির অবস্থাও দেউলিয়া। আর এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারেন একমাত্র রায়তরাই। রায়তরাই পারবেন স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার দরজা খুলতে। স্বাধীনতার দরজা খোলার জন্য যে চাবিটি তার হাতে আছে, সেই হাত আজ মহাজন কর্তৃক শক্তিহীন অবশ। তার কাছে স্বাধীনতার অর্থ প্রথমত অর্থের শিকল থেকে নিজের শরীর এবং আত্মাকে মুক্ত করা, তারপরে দেশের স্বাধীনতা।[৮১] পল্লীর শ্রী-বৃদ্ধি এবং সমবায় আন্দোলনের জোরালো সমর্থক হিসাবে হ্যামিল্টনের উপলব্ধি ছিল "money which regenerate a nation but the labour of men's souls and bodies, the hands and heads, this was the real working capital of all nation."[৮২] তাঁর কাছে টাকার অর্থ ছিল এমন "Money is merely the instrument for switching on the productive power- the real capital which enriches a nation- Man himself." [৮৩]

গোসাবাকে কেন্দ্র করে জল-জঙ্গল ঘেরা দ্বীপগুলিতে যেভাবে একটি কৃষি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল, যেভাবে সমবায়ের মাধ্যমে পল্লী গ্রামগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল, তার সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর মত মহান ব্যক্তিরা। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিদ্বয় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে থাকলেও লোকহিতকর কর্মের আদর্শ তাঁদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। তাঁরা একে অপরের মানবকল্যাণকর কার্য সম্পর্কে

ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই তিন মহান ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র ছিল আলাদা কিন্তু উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি ছিল একই, সমবায়ের মাধ্যমে মানব সেবা।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর গঠনমূলক কর্মসূচির অংশ হিসাবে আদর্শগ্রাম-জীবন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন একজন মানুষের পক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি কেউ একটি আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলতে পারেন তাহলে সেটি কোনো নির্দিষ্ট দেশ নয়, হয়তো সমগ্র বিশ্বের কাছে একটি আদর্শ হয়ে উঠতে পারে। গান্ধীজীর গ্রাম সেবার আদর্শ ছিল বিকেন্দ্রিক স্ব-শাসিত সমাজ 'রামরাজ্য' গঠন। যেখানে প্রজাদের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি হবে শেষ কথা। গান্ধীজীর মত স্যার ড্যানিয়েল সমবায় ব্যাংক-কে কেন্দ্র করে গঠিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গোসাবাতে একটি বিকেন্দ্রিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পঞ্চায়েতগুলি নিজেরাই নিজেদের বিরোধের মীমাংসা করতেন। পঞ্চায়েতগুলি তাদের কর্মধারার মাধ্যমে একটি প্রাণবন্ত সমাজ গড়ে তুলবে এই ছিল হ্যামিল্টনের ইচ্ছা। গ্রামীণ শিল্পের বিকাশের ভাবনাটি গান্ধী এবং হ্যামিল্টনকে একসূত্রে গেঁথে ছিল। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন ফসল বপন এবং কাটার মত কর্মের মাধ্যমে ভারতের অর্ধেক শ্রমিক তাদের শ্রম নষ্ট করছে। তিনি এই নিরর্থক শ্রমকে 'চরকা' এবং তাঁতে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তবে সেটি বোম্বে চাওলের (Bombay Chawl)[৮৪] মত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মাধ্যমে নয় পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর গ্রামীণ পরিবেশে গ্রামীণ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে ঘটাতে চেয়েছিলেন।[৮৫] তবে মহাত্মা গান্ধীর সমবায় ধারণার সঙ্গে হ্যামিল্টনের সমবায় ভাবনার মূলগত একটি পার্থক্য ছিল। সমবায়ের মাধ্যমে ঋণদান ব্যবস্থাকে গান্ধীজী বিপদের অশনি সংকেত হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁর মতে ঋণ, সেটি সমবায় থেকে আসুক বা অন্য কোথাও থেকে তা বহু সংসারকে ছারখার করে দিয়েছে। কিন্তু স্যার ড্যানিয়েলের দৃষ্টিতে ঋণ ছিল ক্রমশ বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষমতার একমাত্র উৎস, মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের উৎস। এর মাধ্যমে ভারত বিজয় ও শান্তি পেতে

পারে।[৮৬] এই সামান্য মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও গান্ধীজী তাঁর একান্ত সচিব শ্রী মহাদেব দেশাইকে হ্যামিল্টন সাহেবের সমবায় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য গোসাবাতে পাঠিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি মহাদেব দেশাই হ্যামিল্টন আবাদ গোসাবাতে এসে পৌঁছান। ঘটনাচক্রে ৭ই ফেব্রুয়ারি হ্যামিল্টন আবাদে নোনাজলের প্রবেশ বন্ধের জন্য ১৩০ মাইল দীর্ঘ বাঁধের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছিল। লেডি মার্গারেট হ্যামিল্টন কর্তৃক সুদীর্ঘ এই বাঁধের শেষ মৃত্তিকা খন্ড এবং স্যার হ্যামিল্টন কর্তৃক জঙ্গল হাসিলের শেষ বৃক্ষছেদনের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। প্রায় এক সপ্তাহ কালব্যাপী হ্যামিল্টন আবাদ ও হ্যামিল্টনের সঙ্গে সময় কাটানোর পর মিস্টার দেশাই উভয়ের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনায় তুলে ধরেছিলেন কিভাবে বিগত ৩০ বছরে সহজে প্লাবিত গোসাবা, জঙ্গল থেকে ২৫টি গ্রাম এবং ১০০০০ লোকের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমৃদ্ধ এস্টেটে পরিণত হয়েছিল। যেটি সমবায় সমিতি, ঔষধালয় এবং স্কুলগুলির একটি নেটওয়ার্ক দ্বারা সংযুক্ত ছিল। সমস্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হত স্থানীয়ভাবে এবং মদ সেবনের কোনো প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন একজন সংস্কারমনা ও জনহিতৈষী জমিদার কেমন করে এমন আদর্শ জমিদারির পত্তন করতে পারে।[৮৭] ১৯৪৪ সালে ন্যাশনাল খ্রিস্টান কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, বার্মা এন্ড সিলন (National Christian Council of Inaia, Burma and Ceylon) সেক্রেটারি রেভারেন্ড জে. জেড. হজ (Reverend J. Z. Hodge) ভারতের গ্রামীণ পুর্নগঠন এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে গোসাবা কো-অপারেটিভ সোসাইটি সম্পর্কে বলেছিলেন “In Gosaba we see a master purpose-‘the manufacture of souls of good quality’- united to a master method. As village came into being, they promptly organized into co-operative societies. ‘In every village a bank and in every village a school’

was the slogan. Gradually co-operation moved beyond banking into a united endeavour to meet the needs of all men, consumer and achievement last? The question is inevitable and while the final word cannot yet be spoken, the experiment is there for all to see."[৮৮] এছাড়া ১৯৪৫ সালে বেঙ্গল উইকলি (Bengal Weekly) পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের জমি পুনর্বাসন এবং গ্রামীণ ভারতের দারিদ্রতা মোচনের মডেল হিসাবেও গোসাবা সমবায়ের ধরণাকে ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছিল।[৮৯]

গান্ধীজীর ন্যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের এই মহান কর্মযজ্ঞের সাক্ষী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সমবায় আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের মতে সমবায় হচ্ছে আত্মনির্ভরতা অর্জনের একমাত্র হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের উপর ভর করে তিনি ১৯২১ সালে গ্রাম পুনর্গঠনের তথা গ্রাম সেবার এক অভাবনীয় ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন শান্তিনিকেতন। এই সূত্র ধরে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে দু'জন একে অপরের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ১৯২৯ সালের ১০ই এবং ১১ই ফেব্রুয়ারি বোলপুরে অনুষ্ঠিত বর্ধমান বিভাগের সমবায় সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ, হ্যামিল্টন সাহেবকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আবার হ্যামিল্টন সাহেবও রবীন্দ্রনাথকে গোসাবায় আসার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন।[৯০] অর্থাৎ এই-সময় থেকে পারস্পরিক যোগাযোগ ও মতাদর্শগত দিক থেকে দু'জন অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। সেই আমন্ত্রণকে উপেক্ষা না করে ১৯৩২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোসাবাতে এসেছিলেন। আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নির্মিত সমবায় সংগঠনগুলির কর্মকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন, বলেছিলেন 'স্বদেশী সমাজে যে স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম--এখানে তার পরিপূর্ণ রূপ দেখে মুগ্ধ হলাম। সমস্ত ভারতবর্ষের আদর্শ হোক গোসাবা'।[৯১] স্যার হ্যামিল্টনের মতাদর্শগত দিকটিও

রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছিলেন। হ্যামিল্টন সম্পর্কে তাঁর অভিব্যক্তি ছিল এইরূপ- 'I have my trust in individuals like yourself who are simple lovers of humanity, whose minds are free from race prejudices'.[৯২]

১৯৩০ সালের একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ হ্যামিল্টন সাহেবকে লিখেছিলেন-

'I have not much faith in politicians when the problem is vast needing a complete vision of the future of a country like India entangled in difficulties that are enormous. These specialists have the habit of isolating politics from the large context of national life and the psychology of the people and of the period. They put all their emphasis upon law and order, something which is external and superficial and ignore the vital needs of the spirit of the nation...'[৯৩] অন্যদিকে স্যার হ্যামিল্টন সমবায় কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় একটি সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবটিকে মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু সরকারি নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে পারেননি। আর হ্যামিল্টনও রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা বোধ করেননি।[৯৪]

হ্যামিল্টন কর্তৃক সৃষ্ট হ্যামিল্টন আবাদের সামগ্রিক এই চিত্র প্রমাণ করে জমিদারিতন্ত্রকে পিতৃতন্ত্রের ছায়ায় রেখে গোসাবার ন্যায় অরণ্যপুরীকে অল্পদিনের মধ্যে এমন এক আদর্শ উপনিবেশে পরিণত করেছিলেন যেখানে ছিল অশিক্ষা থেকে মুক্তির উপায়, রোগ ভোগের চরম ভীতি থেকে বাঁচার ব্যবস্থা, মহাজনি শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি, দারিদ্রতা ও বেকারত্ব নিবারণের এক সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা। এককথায় প্রতিটি দিক থেকে হ্যামিল্টন আবাদ উন্নতির শিখরে বিরাজিত হয়েছিল। এই-সময়-পর্বে স্যার ড্যানিয়েল একদিকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে

গোসাবাবাসীকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তেমনি উন্নত চরিত্র গঠন ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে এক সভ্য, স্বশাসিত সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। সেদিনের প্রত্যেকটি কর্মকান্ড গোসাবাবাসীকে স্বশাসনের ও পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার শিক্ষায় দীক্ষিত করেছিল। কিন্তু সমবায় ভাবনার মাধ্যমে পরিচালিত তাঁর সমস্ত পরিকল্পনার অপমৃত্যু হয়েছিল ১৯৩৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই। হয়তো বা তাঁর বর্তমানেই সেই পরিকাঠামোয় ঘুণ ধরেছিল। তাঁর জীবনের শেষের দিকে উদরতার মহান প্রতিষ্ঠানগুলিকে সামনে রেখে তাঁর জমিদারির একশ্রেণির দায়িত্বশীল কর্মচারী বাঙালি জমিদারির নিষ্ঠুর চরিত্রগুলিকে ক্রমশ ক্রিয়াশীল করে তুলেছিল। এভাবে তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই সুবিধাবাদী কর্মচারী ও তাদের আত্মীয়বর্গের অপকৌশলে গোসাবাবাসীর মন থেকে সমবায়ের ভাবনা ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছিল। কিন্তু শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন একদল যুবক যারা হ্যামিল্টনের সমবায় ভাবনার মাধ্যমে সৃষ্ট স্বায়ত্তশাসন বোধের দ্বারা দীক্ষিত হয়েছিল তারাই পরবর্তীতে সাহেবের সমবায় ধারণার মধ্যে যে কলুষতার জন্ম হয়েছিল তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যা অবশেষে মিশে গিয়েছিল তেভাগা আন্দোলনের ধারার সাথে। আমার পরবর্তী অধ্যায়টিতে সেই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছি।

তথ্যসূত্র :

১. W.W.Hunter, A Statistical Acount of Bengal, vol-1, District of the 24 Parganas and Sundarban (London: Trubner & co., 1875), 92; Nilmani Mukharjee, The Port of Calcutta, A Short History (Calcutta: The Commissioners for the Port of Calcutta, 1968), 9; The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta: Its Progress and Prospect (Calcutta: Published Under the Auspices of the Mutlah Association, 1858), 1-7; The Port of Calcutta and 'The Port of Mutlah,' Considered in Connection by A Railway or A Ship Canal (Calcutta: A Member of the Mutlah Association, 1858), 1 – 17.

২. Alapan Bandyopadhyay, Anup Matilal (ed), The Philosopher,s Stone Speeches and writing of Sir Daniel Hamilton (Gosaba: Gosaba Estate Trust, 2003), 2-11.

৩. কালীপদ ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, নেওয়া হয়েছে সন্তোষ বর্মন সম্পাদিত 'স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও গোসাবা-প্রবন্ধ সংকলন' (কলকাতা: কথা, ২০১২), ১১।

৪. ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ১৩।

৫. ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ১৮।

৬. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগের যৌথ উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভাতে ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন কর্তৃক পাঠকৃত নিবন্ধগুলিকে একত্রিত করে স্যার ডানিয়েল হ্যামিল্টন নিজেই একটি লেকচার সিরিজ বার করেছিলেন "The Co-operative Estate and How to Reach it" (Gosaba: Estate Trust, 1930), 1-41. এছাড়া ১৯২৯ সালের ২৬ ও ২৭শে জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ, ৯, ১০, ও ১১ ফেব্রুয়ারি বীরভূম জেলার বোলপুর, ১৯২৯ সালের ৩১শে জানুয়ারি ও ১৯৩০ সালের ২৩শে জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা এবং ১৯৩০ সালের ১৮ ও ১৯শে জানুয়ারি মুজাফফরপুর, ১৪ই ফেব্রুয়ারি স্কটিশ চার্চ কলেজের বক্তৃতাগুলি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল "New India and How to Get There" (Calcutta, 1931), 1-133; ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ১৮।

৭. A. P. Blair, "Practical co-operation, Sir Daniel Hamilton's Farm in the Sundarbans," Modern Review, (April, 1937) 395.

৮. প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী, আদি গঙ্গার তীরে (কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৮) ১৫৪-১৫৮।

৯. অশ্বিনী কুমার পাল, "গোসাবা যখন মানুষ চৈতন্যে" নেওয়া হয়েছে গোপীনাথ বর্মন সম্পাদিত স্মরণিকা (১৯৭৫)।

১০. S. R. Bhagwat, "Sir Daniel Hamilton's Gosaba As I See And Understand It", 1941, নেওয়া হয়েছে Krishnakanta Sarkar, Peasant Political Action in 24 Parganas with Special Reference to Kakdwip and Gosaba, A Unpublished Ph. D. Thesis, University of Calcutta, 1985, 412.

১১. Sarkar, Peasant Political Action in 24 Parganas, 412.

১২. ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ১৯।

১৩. টিকা: Large Capital Rules 1879

সুন্দরবনের তৎকালীন কমিশনার মিঃ গোমসকে রাজস্ব বোর্ড একটি আইনের খসড়া তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেটি পরবর্তীতে 'Large Capital Rules 1879' নামে পরিচিত হয়। এর শর্তগুলি ছিল এইরূপ-

1. The revenue-free period was reduced from 20 to 10 years.
2. Only one clearance condition was proposed, namely, one-eighth of the area leased by the end of the fifth years.
3. A uniform rate of assessment was abandoned in favour of different rates for different areas, all showing an increase on the former standard.
4. The term of lease was reduced from 99 to 40 years, renewable for periods of 30 years.
5. The maximum area of a grant was to be fixed at 10000 standard bighas, the minimum at 200.

*F.D. Ascoli, A Revenue History of the Sundarbans from 1870 to 1920, (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot., 1921),15-18.

১৪। Anil Chandra Lahiri, Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of 24 Parganas, 1924-33 (Alipore: Bengal Government press, 1936) 116.

১৫। ভট্টাচার্য,মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ১৯।

১৬। ভট্টাচার্য,মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ২০।

১৭। ভট্টাচার্য,মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ২০।

১৮। S. B. Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, Sir Daniel Hamilton's Sundarban Estate (Calcutta: West Bengal co-operative press Ltd, date not mention [n.d]), 2.

১৯। ভট্টাচার্য,মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ২০-২১।

২০। ভট্টাচার্য,মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ২১।

২১। ভট্টাচার্য,মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ২১।

২২। ভট্টাচার্য,মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ২২।

২৩। S. B. Mazumdar (Sudhangshu Bhusan Mazumdar) "Estate Farming in India, Gosaba", Indian Farming voll. III, No. II, (November, 1942), 572.

২৪। West Bengal State Archive, Proceeding of Revenue Department, Land Revenue Branch, File No. 3-L/15(1-2), Progress No., 25-26, February 1909, Letter from F. W. Duke, (Chief Secretary to the Government of Bengal) to the Commissioner of the Presidency Division; ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ২২।

২৫। Mazumdar, "Estate Farming in India, Gosaba", 573.

২৬। Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 10.

২৭। সাক্ষাৎকার গোপীনাথ বর্মন গোসাবা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক-এর সম্পাদক (১৯৫৫) গোসাবা, ২২.১২.১৯৭৬, নেওয়া হয়েছে Sarkar, Peasant Political Action in 24 Parganas, 412.

২৮। Mazumdar, “Estate Farming in India, Gosaba”, 574-577.

২৯। Mazumdar, “Estate Farming in India, Gosaba”, 577.

৩০। Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 9.

৩১। টিকাঃ ফ্রেডরিক নিকলসন

ফ্রেডরিক নিকলসন সমবায় আন্দোলনের জনক। তিনি ভারতীয় ফিশারিজ এর জনক নামে পরিচিত ছিলেন। নিকলসন ১৮৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬৯ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে চাকরি সূত্রে ভারতে আসেন। তিনি কালেক্টর হিসাবে তীরনুভেলি (Tirunelveli), মাদ্রাজ (Madras) এবং কোয়েম্বাটুর (Coimbatore) এ কর্মরত ছিলেন নিকলসন ‘District Manual of Coimbatore’ নামে একটি বই লেখেন।

৩২। অনুপ মতিলাল, “স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন এক স্বপ্নের ফেরিওয়ালা” নেওয়া হয়েছে সন্তোষ বর্মন সম্পাদিত ‘স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও গোসাবা-প্রবন্ধ সংকলন’ (কলকাতা: কথা, ২০১২), ৬৪।

৩৩। Sutapa Chattopadhyay, Colonial Agrarian Policy and Socio-Cultural Change in The Sundarbans- Late Eighteenth to Early Twentieth Century, A Unpublished Ph.D Thesis, University of Calcutta, 1998, 258.

৩৪। Bandyopadhyay & Matilal (ed), The Philosopher,s Stone Speeches, 10.

৩৫। Blair, “Practical co-operation, Sir Daniel Hamilton’s Farm in the sundarbans,”395; Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 6-7.

৩৬। Mazumdar, “Estate Farming in India, Gosaba”, 574; Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 6-7; Krishnakant Sarkar, A Case Study: Co-operative Movement (India) No Unemployment No Starvation No Death, Sundarban Famine 1943, (Kolkata: Imagine Publication, 2008), 8.

৩৭। Sarkar, A Case Study: Co-operative Movement, 9.

৩৮। Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 8

৩৯। Sarkar, A Case Study: Co-operative Movement, 9.

৪০। Sarkar, A Case Study: Co-operative Movement, 9.

৪১। Mazumdar, “Estate Farming in India, Gosaba”,574.

৪২। Sarkar, A Case Study: Co-operative Movement, 9.

৪৩। ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ২৬।

৪৪। গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, "The Co-operative State" Lecture given by Daniel Hamilton to the Student of The Scottish Church College 15th December, 1930.

৪৫। ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ৩১; Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 9.

৪৬। Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 9; Mazumdar, "Estate Farming in India, Gosaba", 547.

৪৭। ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ৩৩; Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 9.

৪৮। Sarkar, A Case Study: Co-operative Movement, 15-16.

৪৯। ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ৩৮।

৫০। Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 16-17.

৫১। "The Acquittance-roll of the Hamilton Estate January, 1934", নেওয়া হয়েছে Sarkar, A Case Study: Co-operative Movement, 10.

৫২। Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 13

৫৩। Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 13

৫৪। Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 11.

৫৫। Mazumdar, "Estate Farming in India, Gosaba", 574-575.

৫৬। Mazumdar, "Estate Farming in India, Gosaba", 575.

৫৭। Mazumdar, "Estate Farming in India, Gosaba", 575-576.

৫৮। Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 12;

৫৯। ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ৩৪।

৬০। Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 13; Sarkar, A Case Study: Co-operative Movement, 13.

৬১। ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ৩৫।

৬২। Sarkar, A Case Study: Co-operative Movement, 13.

৬৩। Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 17.

৬৪। ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ৩৫।

৬৫। Lahiri, Final Report on the Survey and Settlement Operation, 146.

৬৬। Lahiri, Final Report on the Survey and Settlement Operation, 146.

৬৭। Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 21.

৬৮। ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ৩৯।

৬৯। ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ৩৭-৩৮।

৭০। গোপীনাথ বর্মন, "মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও মানস কন্যা গোসাবা" নেওয়া হয়েছে রামনাথ মাইতি সম্পা:, সুন্দরবন সমাচার অষ্টম সংস্কার (গোসাবা: ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৭), ১-৪।

৭১। গোপীনাথ বর্মন, "স্যার ড্যানিয়েলের শিক্ষাদর্শ গোসাবা আর আর আই এর গোড়ার কথা" নেওয়া হয়েছে সন্তোষ বর্মন সম্পাদিত 'স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও গোসাবা-প্রবন্ধ সংকলন' (কলকাতা: কথা, ২০১২), ১২০-১২১।

৭২। ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ৩৭-৩৮।

৭৩। Daniel Hamilton, New India and How to Get There: Man or Mammon- The True Capital and False (Calcutta: 1931), 6.

৭৪। Blair, "Practical co-operation, Sir Daniel Hamilton's Farm in the sundarbans," 397; Debojoyti Das, "Sir Daniel Hamilton's Sentinel Co-operative Society in the Sundarban Delta", Littoral Communities–Bay of Bengal, https://lcbb.macmillan.yale.edu/sir-daniel-hamiltons-sentinel-co-operativesociety-sundarban-delta

৭৫। ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ৩৫।

৭৬। Sarkar, Peasant Political Action in 24 Parganas, 435.

৭৭। Mazumdar, "Estate Farming in India, Gosaba", 573-577.

৭৮। An article was published under the caption “Clive Street Gossip”, An Indian Finance, Friday 18 Feb, 1938, 1-2.

৭৯। Mazumdar, Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, 13.

৮০। An article was published under the caption “Clive Street Gossip”, An Indian Finance, Friday 18 Feb, 1938, 1-2.

৮১। Hamilton, New India and How to Get There, Vi-Vii.

৮২। Hamilton, New India and How to Get There, 16.

৮৩। Hamilton, New India and How to Get There, 16.

৮৪। বোম্বে চাওয়াল (Bombay Chawl) টিকাঃ

পশ্চিম ভারতের দরিদ্র কারখানা শ্রমিকদের নিম্ন মানের আবাসন মারাঠি ভাষায় চাওয়াল(Chawl) নামে পরিচিত। ঔপনিবেশিক আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য কেন্দ্র বোম্বে বর্তমানের মোম্বাইতে দূর-দূরান্ত থেকে আগত মানুষগুলি এখানে বাস করত। অপরিচ্ছন্ন, সঙ্কুচিত ও নিরাপত্তা হীন এই আবাসনগুলির ছোট্ট এক কক্ষ বিশিষ্ট ঘরগুলিতে বাস করত পাঁচেরও বেশি সংখ্যক লোক। online https://en.wikipedia.org/wiki/Chaw.

৮৫। Hamilton, New India and How to Get There, X-Xi.

৮৬। মতিলাল, “স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন এক স্বপ্নের ফেরিওয়ালা” ৭১-৭২।

৮৭। Mahadev Desai “Towards and Ideal Zamindari” Harijan, vol-3, (1935), 36-37(March 15), 52-53(March 29), 61-62(April 5) and 69-70(April 13) Taken from online https://www.gandhiheritageportal.org/journals-by-gandhiji/harijan

৮৮। Sir Daniel Hamilton, “Free India Will Share Common Destiny” The Statesman, Saturday, 18th November 1944.

৮৯। Spectator, “Praise for Gosaba Scheme” The Bengal Weekly, Wednesday, 7th March 1945.

৯০। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (তৃতীয় খন্ড) (কলিকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪০৬), ৪৯৮।

৯১। ভট্টাচার্য, মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন, ৪৬-৪৭।

৯২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হামিল্টন কে লেখা চিঠি, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রভবন, ২০ই জুন ১৯৩০।

৯৩। Krishna Dutta & Andrew Robinson (ed), Selected Letters of Rabindranath Tagore (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 381-382.

৯৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হামিল্টন কে লেখা চিঠি, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রভবন, ২৫ই জুন ১৯৩০।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্যানিং মহকুমার আঞ্চলিক সংগ্রাম: তেভাগা

চতুর্থ অধ্যায়

ক্যানিং মহকুমার আঞ্চলিক সংগ্রাম : তেভাগা

নয়নাভিরাম অসংখ্য লবণাম্বু উদ্ভিদের সুন্দরবন বলতে যে প্রতিচ্ছবি জনমানসে ভেসে ওঠে তা'হল হিমালয় এবং ছোটনাগপুর পর্বতমালার টুকরো টুকরো মাটি, বালি, পাথর, গঙ্গা-ব্রহ্মাপুত্রের জলস্রোতের দ্বারা দক্ষিণের সর্বনিম্ন স্থান বঙ্গোপসাগরের বুক ঘেঁষে অসংখ্য ছোটো-বড়ো দ্বীপভূমিগুলি। প্রতিনিয়ত জোয়ার-ভাটার জলে নিমজ্জিত দ্বীপগুলি এবং এখানে বসবাসকারী মানুষগুলি ক্রমাগত ভাঙা-গড়া চক্রে আবর্তিত। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং বর্হিঃবিশ্বের থেকে আগত ধ্যান ধারণা এখানে বসবাসকারী মানুষগুলির জীবনবোধকে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের পথে চালিত করেছে। কলকাতার পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলি উন্নত ধারণার সাথে পরিচিত হয়েছে তাড়াতাড়ি, তদনু-রূপ বিভিন্ন ছোটো-বড়ো নদী ও খাড়ি দ্বারা পৃথক দ্বীপগুলিতে উন্নয়নের গতি হয়েছে শিথিল। এইরূপ ভৌগোলিক অবস্থানযুক্ত দ্বীপগুলিকে নিয়ে গঠিত ক্যানিং মহকুমার সমৃদ্ধির সূচনা হয়েছিল ১৮৫৩ সালে কলকাতার পরিপূরক বন্দর হিসাবে মাতলা নদীর তীরে পোর্ট ক্যানিং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।[১] এই বন্দর তৈরীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলার পূর্ব দিকের জেলাগুলির উৎপাদিত দ্রব্য এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে কলকাতাতে নিয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে বর্হিঃবিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে রপ্তানি করা। পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ আমদানিকৃত দ্রব্য এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে অন্তর্দেশীয় জেলাগুলিতে সরবরাহ করা। এভাবে মাতলা বন্দর ব্যবহারের ফলে কলকাতা বন্দর অপেক্ষা সরবরাহ মূল্য অনেকাংশে কমে যাবে বলে অনুমান করা হয়েছিল।[২] এইসব ধারণার বশবর্তী হয়ে পোর্টকে কেন্দ্র করে মাতলা জনপদ শহরের রূপ নিতে শুরু করেছিল। অন্যদিকে ১৯০৩ সালে স্কটল্যান্ডবাসি স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন গোসাবা, রাঙাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া এই তিনটি দ্বীপ

নিয়ে শুরু করেছিলেন তাঁর স্বপ্নের এস্টেট হ্যামিল্টনাবাদ।[৩] (পূর্ববর্তী অধ্যায় দুটিতে এই বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করেছি)। স্যার ড্যানিয়েলের হাত ধরে গোসাবাবাসী সমবায়ের ধারণায় দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং সচেতন হয়েছিলেন এক উন্নত জীবনবোধের নীতি দ্বারা। সমবায় আন্দোলনের প্রসার মধ্যবিত্ত যুবসমাজকে একত্রিত করেছিল। সামাজিক উন্নতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে তুলেছিল। এই অঞ্চলের কৃষকদের সংগঠিত করে একটি কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছিল। যার পরিণতির স্বরূপ প্রতিভাত হয়েছিল একটি প্রকাশ্য কৃষক বিদ্রোহ 'তেভাগায়'। আলোচ্য অধ্যায়টির মূল অংশে প্রবেশের পূর্বে যেসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের মাধ্যমে অধ্যায়টি সম্পন্ন হবে সেই প্রশ্নগুলিকে একবার উল্লেখ করে নেওয়া আবশ্যিক। তেভাগা কি? কেমন ভাবে এর প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল? আমার আলোচিত বর্তমানের ক্যানিং মহকুমার কোন কোন অঞ্চল তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল? তেভাগা আন্দোলন এই অঞ্চলের উপর কি প্রভাব ফেলেছিল? কারণ মহকুমার ইতিহাস লিখতে গেলে এই অঞ্চলের আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

যাইহোক তেভাগা নামক রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল নিম্নবিত্ত কৃষকের সামাজিক প্রতিবাদের দ্বারা। তবে ক্রমে একে প্রভাবিত করেছিল আদর্শগতভাবে অনুপ্রাণিত কিছু মধ্যবিত্তের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। যারা কৃষকের মননে জাগ্রত করেছিল শ্রেণিবোধের ধারণা এবং চোখে আঙুল দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল মধ্যস্বত্বভোগী এক শ্রেণির সঙ্গে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই চাষিকে উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছিল যে, চাষের জমির মালিক তারা নয়, আসলে জমির মালিক মধ্যস্বত্বভোগী ভূস্বামী শ্রেণি। যে শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল ভূমিনীতি ১৮৫৩ [৪] এবং ১৮৭৯ [৫] -এর 'লার্জ ক্যাপিটালিস্ট রুলস (বৃহৎ পুঁজিবাদী বিধান)' অনুযায়ী সুন্দরবনের অনাবাদি জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করার সময়ে। ব্রিটিশ কর্তৃক সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থায় প্রবর্তিত এই আইনগুলি এক চরম বৈষম্যের জন্ম দিয়েছিল। ইউরোপীয় সাহেব বা

বাঙালি জমিদার যিনিই সুন্দরবনের জমি ইজারা নিয়ে লটের জমিদার বা লটদার হয়েছিলেন, তারা কখনো জমিকে ভালোবাসেননি। শহর বা কলকাতায় বসবাসকারী এইসব বাবু বিনা শ্রমের অর্থে বাবুয়ানা দেখাতেন, আর এদের হয়ে জমিদারি পরিচালনা করতেন মধ্যস্বত্বভোগী চকদার, গাঁতিদার ও হাওলাদাররা,[৬] যারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল বা দ্বায়বদ্ধ ছিল জমির প্রকৃত মালিক জমিদার বা লটদারদের উপর। আবার এদের অধীনে ছিলেন নায়েব, ম্যানেজার এবং অন্যান্য ব্যক্তি যারা উপরের শ্রেণিগুলির অবর্তমানে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ভোগ করতেন।[৭] অন্যদিকে অনাবাদি জমিকে আবাদ করেছে যারা তাদের উপর চাপানো হয়েছিল খাজনার বোঝা। অর্থাৎ চাষিকে 'Occupancy Right'-এর অধীনে না এনে তাকে দেওয়া হয়েছিল 'Tenancy Right'।[৮] ব্রিটিশ ভূমি ব্যবস্থায় জমিদার বা লটদার কর্তৃক জমির এইরূপ আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে ভাগ করে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা খাজনার বিনিময়ে চাষ করতে দেওয়ার রীতি থেকে উদ্ভব হয়েছিল ভাগচাষি ব্যবস্থার।[৯] প্রসঙ্গক্রমে ভাগচাষি কারা, কিভাবে এর উদ্ভব এবং সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থায় ভাগচাষি চরিত্রটা কেমন তা একবার সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করে নেওয়া যেতে পারে।

ভাগচাষি কি বা কারা ভাগচাষি এই বিষয়টিকে একটি নিদির্ষ্ট সংজ্ঞার অধীনে আনার মধ্যে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সাধারণত ভাগচাষি বলতে কৃষকদের একটি শ্রেণিকে বোঝায়। এঁরা কোনো গোষ্ঠী ছিল না। যে-কোনো চাষি পরিবার যে-কোনো সময় একান্ত ব্যক্তিগতভাবে নিজের সিদ্ধান্তানুসারে ভাগচাষি হতে পারতেন। বাংলায় ভাগচাষ বলতে চাষাবাদের একটি পদ্ধতিকে বোঝায়। যেখানে চাষি শ্রম প্রদান করেন এবং জমির মালিক প্রদান করেন জমি, কখনো কখনো চাষের সামগ্রী।[১০] তবে বেশির ভাগ সময় চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর (লাঙ্গল, বীজ, মই, বলদ, সার, বিষ ইত্যাদি) বেশির ভাগটাই চাষিকে দিতে হত। এখানে প্রশ্ন হল ভাগচাষি এবং মালিকের মধ্যে সম্পদ ভাগের বিষয়টি নিষ্পত্তি হত কি ভাবে? সাধারণত ১

বছর অথবা একটি ধান উৎপাদনের ঋতুর মধ্যে কৃষক সম্পূর্ণ মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে জমিদার ও বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগী অকৃষক মালিকের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ খাজনা বাবদ জমি মালিককে দিতে হত। এদের না ছিল দখলি শর্ত না ছিল মালিকানা শর্ত। অবশ্য ফসলের কিছু অংশের অধিকার তাদের ছিল। এই ধরনের কৃষক বাংলায়, বর্গাদার বা ভাগচাষি বা আধিয়ার নামে পরিচিত ছিল।[১১] তবে চুক্তির শর্ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কৃষক যদি শ্রম, চাষের সরঞ্জাম (বীজ, লাঙ্গল) ইত্যাদি নিজে দেয় সেক্ষেত্রে কৃষক পেত ফসলের অর্ধেক অংশ। অন্য দিকে কৃষক যদি শুধুমাত্র শ্রম প্রদান করে আর বাকি সবকিছু ভূস্বামী সরবরাহ করে সেক্ষেত্রে কৃষক পেত উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের একভাগ অথবা পাঁচ ভাগের একভাগ।[১২] কিন্তু সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল তখনই, যখন মালিক শুধুমাত্র জমি প্রদান করে কৃষককে দিত তিন ভাগের একভাগ অথবা পাঁচ ভাগের একভাগ। ভাগচাষের এই বৈশিষ্ট্য তৎকালীন সময়ে চাষের কাজে নিযুক্ত নগদ শ্রমিকদের (যারা কুড়ি আঁটি ধান কাটার বিনিময়ে এক অথবা দুই আঁটি ধান মজুরি হিসাবে পেত) থেকে ভাগচাষিকে আলাদা করেছিল।[১৩] ভাগচাষি ব্যবস্থার উদ্ভব প্রসঙ্গে আলোচনায় বেশিরভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন ভাগচাষ ব্যবস্থা ভারতের একটি পুরাতন কৃষি ব্যবস্থা। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে এর অস্তিত্ব বর্তমান। তবে তার ধারণা বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে। বেশিরভাগ সময় সেগুলি ছিল জমিদারের সাহায্যার্থে রাজস্ব বর্জিত ভূমি।[১৪] তবে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জমিদারি স্বত্ব গ্রহণ এবং তাদের প্রবর্তিত ভূমি রাজস্ব নীতি পূর্বের তথাকথিত ভাগচাষ ব্যবস্থার ধারণার আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। এই-সময় থেকে গ্রামের জোতদার, মহাজন এবং বাজার ও বণিকের মধ্যে শস্য ব্যবস্থায় মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করা যে-কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি তাদের জমিকে ভাগচাষি ব্যবস্থায় চাষ করতে দিতে থাকেন। এছাড়া ভাগচাষি ব্যবস্থার উদ্ভবে কৃষকদের আর্থিক দুরাবস্থাকে

একটি প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী, তার অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণ করতে দরিদ্র কৃষককে একটি নিদির্ষ্ট চুক্তির মাধ্যমে জমি চাষের ভার অর্পণ করত। তাদের মধ্যে চুক্তি হত ফসলের হিসাবে, কারণ নগদ টাকা অপেক্ষা ফসলের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করলে জমিদার লাভবান হত বেশি।[১৫] অন্যদিকে সমগ্র সুন্দরবন এবং আমার গবেষণা স্থল বর্তমানের ক্যানিং মহকুমার ভূমিব্যবস্থা বা তাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট হওয়া ভাগচাষি ব্যবস্থাটা বাংলার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা একটু আলাদাই ছিল। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে জমিদার ছিল অন্য কোনো দেশীয় ব্যক্তি সেখানে সমগ্র চব্বিশ পরগনা তথা সুন্দরবনের জমিদার ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেই। কোম্পানি রাজস্ব বৃদ্ধির আশায় সুন্দরবনকেও ইজারাদার বা লটদারদের হাতে ইজারা দিয়েছিল। তখন সুন্দরবন ঘন-জঙ্গলে ভরে ছিল এবং জমিদারি এলাকা ও মূল সুন্দরবন এলাকার মধ্যে কোনো সীমারেখা ছিল না। তাই লটদাররা নিজেদের ইচ্ছামত জল-জঙ্গল ঘেরা সুন্দরবনকে নিজেদের আয়ত্বাধীন করে জমি পুনঃরুদ্ধারের কাজ শুরু করেছিল। পরে অবশ্য ১৮৩০ সালে ড্যাম্পিয়ের হজেস সাহেবের জরিপের ভিত্তিতে জঙ্গল সুন্দরবন এবং জমিদারি এলাকাকে আলাদা করা হয়েছিল। জমিদার কোম্পানির থেকে সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশ ইজারা নিয়ে লটদাররা সেগুলিকে চকদার, গাঁতিদারদের কাছে বিলি করেছিল। এই চকদার, গাঁতিদারই নদীবাঁধ এবং জঙ্গল সাফাইয়ের মাধ্যমে সুন্দরবনের এক বৃহৎ অংশকে চাষের এলাকায় পরিণত করেছিল তবে এই সমস্ত কাজ তারা কেউ নিজেদের কায়িক শ্রম ব্যয় করে করেনি। তাদের এই কাজে সাহায্য করেছিল সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আগত বা জমির লোভ দেখিয়ে আনা মানুষগুলি। বিষয়টি প্রথম অধ্যায়ে বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে। জমি পাওয়ার আশায় আগত মানুষগুলি এখানকার বাসিন্দা হয়েছিল কিন্তু জমির অধিকার পায়নি।[১৬] তাই খালি হাতে আসা মানুষগুলি বাধ্য হয়েছিল লটদার, চকদার এবং তাদের নায়েবদের জমির ভাগচাষি হিসাবে কাজ করতে।

এছাড়াও খাসজমি নামে আরও একধরনের জমি ছিল। আংশিক চাষযোগ্য এই জমিগুলিকে লটদাররা নিজেদের অধীনে রেখে দিয়ে পুরোপুরি চাষযোগ্য করার জন্য বার্ষিক তিন টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে চাষের জন্য দিত। এর নাম দেওয়া হয়েছিল ঠিকা-চুক্তি। ঠিকা-চুক্তির আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তা'হল এই প্রথায় কৃষককে বার বার নতুন জমি দেওয়া হত। অর্থাৎ আংশিক চাষযোগ্য কোনো জমি সম্পূর্ণ চাষযোগ্য হলে পূর্ববর্তী কৃষক সেই জমি আর পেতনা। এর ফলে প্রতি বছর পূর্ণ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেত। এভাবেই হ্যামিল্টন এস্টেটের সাতজেলিয়া দ্বীপের বেশিরভাগ জমি চাষযোগ্য হয়েছিল।[১৭] পরবর্তীতে এই ঠিকা-চুক্তি ব্যবস্থা ভাগচাষি ব্যবস্থার রূপ ধারণ করেছিল, কারণ ঠিকা-চুক্তি অপেক্ষা ভাগচাষ অনেক বেশি লাভদায়ক। এতে কৃষকদের থেকে বেশি পরিমাণ ধান পাওয়া যেত, যার বাজার মূল্য অনেক বেশি। ইংরেজ ভূমিরাজস্ব নীতির ফলে সৃষ্ট এই বৃহৎ ভাগচাষি শ্রেণি পরবর্তীতে তাদের এই সামাজিক অসাম্য ও অর্থনৈতিক দুর্বিপাক থেকে বেরিয়ে এসে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। বিংশ শতকের মধ্যভাগে এসে রুখে দাঁড়ানোর সাহস দেখিয়েছিল, তাদের প্রতিপক্ষ লটদার, চকদার ও জোতদার শ্রেণির বিরুদ্ধে। জঙ্গল পরিষ্কারের সময় যেভাবে মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে সংঘর্ষের মাধ্যমে ভূমি উদ্ধার হয়েছিল, সেইভাবে উদ্ধারকৃত জমির অধিকার লাভকে কেন্দ্র করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, যেটি মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর লড়াইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। এভাবেই শুরু হয়েছিল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির বিরুদ্ধে ভাগচাষির তেভাগা সংগ্রাম।

এখন প্রশ্ন হল তেভাগা সংগ্রাম কি? কেনই বা এর সূচনা হয়েছিল? যেহেতু আমার আলোচনার মূল বিষয় বর্তমান ক্যানিং মহকুমার তৎকালীন তেভাগার চরিত্র বর্ণন, তাই সামগ্রিক অর্থে তেভাগা কি এবং এর সূচনার কারণ কি সে বিষয়ে একটু সম্যক পরিচিত হওয়া আবশ্যক। বহুমুখী অত্যাচার ও শোষণে জর্জরিত হতদরিদ্র ভাগচাষি সমাজ তাদের উৎপাদিত

ফসলের প্রথাগত অর্ধেক ভাগ অর্থাৎ আধি-এর পরিবর্তে দুই-তৃতীয়াংশ অধিকারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল, বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেটি তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। তেভাগার দাবির সাথে আরও কিছু দাবি ছিল যথা ১. ভাগচাষিকে বর্গা জমি থেকে উৎখাত করা যাবে না। ২. বর্গা স্বত্বকে 'দখলী স্বত্ব' বলে রেকর্ড করতে হবে। ৩. সবরকমের অতিরিক্ত বা আবওয়াব কর, আইনের মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে। ৪. পতিত জমি ফেলে রাখা দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে, পতিত জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের চাষের জন্য দিতে হবে। ৫. ভূমিহীনদের জন্য সরকার কর্তৃক চাল সরবরাহ করতে হবে। ৬. ধান বা টাকার ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার ৮ ভাগের ১ ভাগ নিতে হবে, এক মন ধানে পাঁচ সেরের বেশি সুদ নেওয়া যাবে না।[১৮] কৃষক সভা কর্তৃক ভাগচাষি ও আধিয়ারদের এই দাবিগুলি তেভাগা আন্দোলনের সূচনা করেছিল। আর ভাগচাষির এই লড়াইকে আরও মজবুত করেছিল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের অংশগ্রহণ। ১৯৪৬-৪৭ সালে ৬০ লক্ষ ভাগচাষির সম্মিলিত এই আন্দোলন ছিল স্বাধীনতার আগে অবিভক্ত বাংলার শেষ বড়ো কৃষক আন্দোলন।[১৯] বাংলার তেভাগা আন্দোলন ছিল হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কৃষক ও গ্রামের গরীব শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ এক সংগ্রাম যেটি শুধুমাত্র ভাগচাষি বা আধিয়ারদের বাড়তি ফসল আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তেভাগা ছিল বড়ো জমির মালিক ও সামন্তবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বৃহত্তর শ্রেণি সংগ্রাম।[২০] সরকারের গোপন নথি থেকে তখনকার ৮৬টি মহকুমার রিপোর্ট দেখে বলা যায়, বাংলার ২৫টি জেলার, কোথাও কম কোথাও বেশি মাত্রায় 'তেভাগা' আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।[২১]

১৯৪৬-৪৭ সালে লক্ষ লক্ষ কৃষকের পুঞ্জীভূত শক্তি স্বরূপ যে তেভাগা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তার দাবিদাওয়া দানা বাঁধতে শুরু করেছিল তারও আগে থেকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী যে মহামন্দার সূচনা হয়েছিল তার প্রভাব

পড়েছিল দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য ওঠা-পড়ার উপর। কৃষি পণ্যের মূল্য যেভাবে হ্রাস পেয়েছিল তাতে চাষিরা চাষের খরচ মেটাতে অপারগ হয়ে পড়েছিল।[২২] মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল-এর দেওয়া একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৯২৮-২৯ সালে ভারতে মোট উৎপন্ন ফসলগুলির দাম ছিল ১০৩৪ কোটি টাকা। ১৯৩৩-৩৪ সালে সেই মূল্য কমে গিয়ে হয়েছিল ৪৭৩ কোটি টাকায়। অর্থাৎ শতকরা ৫৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল।[২৩] এই-সময় জমিদাররা আবার নগদ অর্থে খাজনা আদায়ে জোর দিয়েছিল। কারণ জমিদার সরকারকে যে রাজস্ব দিত তা তাকে নগদ অর্থেই দিতে হত। এমতাবস্থায় জমিদার বা মহাজনের খাজনা অথবা দেনার টাকা পরিশোধ করতে চাষিকে কম মূল্যে হলেও আরও বেশি পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রি করতে হত, যেটি একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষককেও পরনির্ভরশীলতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। দরিদ্র কৃষক যারা আগে থেকেই জমিদার ও মহাজনের উপর নির্ভরশীল ছিল তারা আরও বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। আর ধার নেওয়া অর্থ বা রাজস্ব পরিশোধ করতে না পেরে বহু স্বচ্ছল কৃষক ও ছোটো-ছোটো জমিদারদের জমিস্বত্ব মুষ্টিমেয় ধনী জমিদার-মহাজনের কুক্ষিগত হয়েছিল। এভাবে মাঝারি চাষি ছোটো চাষিতে এবং ছোটো চাষি নিঃস্ব ভূমিহীনে পরিণত হয়েছিল।[২৪] অন্যদিকে প্রজাস্বত্ব আইনে বর্গাদার বা ভাগচাষিদের জমির উপর কোনো অধিকার না থাকায় মহামন্দার সময়েও টিকে থাকা জমিদারদের যে খাস জমি ছিল সেখানে নতুন প্রজা না বসিয়ে বর্গায় বা ভাগচাষি দিয়ে চাষ করাতে বেশি আগ্রহী হয়েছিল। আগে জমিদাররা পুরানো প্রজা উৎখাত করে সেই জমি সেলামি নিয়ে নতুন প্রজাকে বিলি করত। কিন্তু এখন তারা নতুন করে বন্দোবস্ত করার পরিবর্তে নিজ মালিকানায় জমি রেখে বর্গা বা ভাগচাষি মারফৎ চাষ করানোয় জোর দিতে থাকে। কারণ ভাগচাষি ব্যবস্থায় দায়িত্ব কম কিন্তু আয় বেশি। ফলে ভাগচাষের এলাকা ও ভাগচাষির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪০ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টের

ভিত্তিতে ১৯২৮-১৯৪০ এই বারো বছরে হস্তান্তরিত এলাকা এবং ভাগচাষির সংখ্যা বৃদ্ধির স্পষ্ট প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। যেটি সারণী আকারে নিচে দেওয়া হল-[২৫]

মোট যে এলাকা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়েছে	১৯২৮-৪০ এ হস্তান্তরিত কৃষি জমির পরিমাণ	হস্তান্তরিত চাষ করা এলাকার মধ্যে থেকে			
৮৫৪৭০.০৪ (একর)	৫৯২৩.৩৫ (একর)	ক্রেতার পরিবার দ্বারা চাষের এলাকা	বর্গাদার দ্বারা চাষের এলাকা	দিনমজুর দ্বারা চাষের এলাকা	নিম্নস্বত্ব রায়ত দ্বারা চাষের এলাকা
		২২৫২.১১ অথবা ৩৮ শতাংশ	১৮৮২.২৯ অথবা ৩১.৭ শতাংশ	৩৪১.৪০ অথবা ৫.৭ শতাংশ	১৪৪৭.৫৫ অথবা ২৪.৬ শতাংশ

সারণি: ৪.১- ১৯৪০ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশনারের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯২৮-১৯৪০ সাল অবধি হস্তান্তরিত এলাকা এবং ভাগচাষির সংখ্যা।

১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯৩৯-৪০ সালে প্রধানত আংশিক অথবা পুরোপুরি বর্গাদার হিসাবে বসবাসকারীর সংখ্যা ছিল শতকরা ১২.২ জন এবং বর্গা প্রথা বা ভাগচাষি ব্যবস্থায় চাষকরা জমির পরিমাণ ছিল ২১.১ শতাংশ।[২৬] তবে ১৯৩৯ সাল থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪২ সালের ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ (পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত) পূর্বের সব হিসাবকে উলটপালট করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে কৃষিজাত পণ্যের দাম ওঠা-নামা করতে শুরু করেছিল। পাটের দাম কমে গিয়ে চালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে চাল ব্যবসায়ী (ভূস্বামী ব্যবসায়ী) লাভবান হতে থাকে। অন্যদিকে জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে ডিনায়েল

পলিসি (Denial Policy)[২৭] গ্রহণ করলে উপকূলবর্তী এলাকার সমুদ্র ও নদীর উপর নির্ভর মানুষগুলি নিজেদের পেশা হারিয়ে কৃষিকাজে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, যেটি কৃষিক্ষেত্রে সংকট বাড়িয়ে তোলে। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রলয়কারী সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় এবং সাত মাইল দীর্ঘ জলোচ্ছ্বাস বাংলার দক্ষিণ অংশের জেলাগুলি বিশেষ করে মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনার উপর আছড়ে পড়েছিল। শুধুমাত্র মেদিনীপুর জেলার চাষের এলাকা নষ্ট হয়েছিল ৩৬০০ বর্গমাইল এবং সুন্দরবন অঞ্চলের প্রায় ৪০০ বর্গমাইল এলাকাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বন্যার কবলে পড়েছিল ২ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষ।[২৮] এভাবে যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে খাদ্যমজুত, মহা-বিপর্যয়কারী ঘূর্ণিঝড়ের ফলে আমনের উৎপাদন হ্রাস এবং ঔপনিবেশিক সরকারের দীর্ঘকালীন প্রশাসনিক দুর্বলতার ফলস্বরূপ বাংলা দেখেছিল এক বিভীষিকাময় অধ্যায় বা পঞ্চাশের মন্বন্তর। বাংলায় ১৩৫০, ইংরেজী ১৯৪৩ সালের এপ্রিলের এই দুর্ভিক্ষ কেবলমাত্র খাদ্য সরবরাহের ঘাটতি নয় বরং দরিদ্র শ্রেণির হাতে ক্রয়ক্ষমতার অভাবের ফল।[২৯] ঋণগ্রস্থ ও হতাশার শিকার হয়ে বহু লোক তাদের শেষ অবলম্বন অর্থাৎ জমিজমাটুকু বিক্রি করে দিতে শুরু করেছিল। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে ২৫০০ থেকে ৩০০০ বিঘা জমি এক হাত থেকে অন্য হাতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।[৩০] দুর্ভিক্ষ ও তার পরবর্তী বছরে গ্রাম বাংলার ঋণগ্রস্থ পরিবারের শতকরা অনুপাত বা পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায় দুর্ভিক্ষ গ্রাম বাংলার কৃষি সমাজের গঠনকে কতটা পরিবর্তন করেছিল। [৩১]

পরিবারের ধরন	ঋণগ্রস্থ পরিবার ১৯৪৩	ঋনগ্রস্থ পরিবার ১৯৪৪
কৃষক	৪৩.০%	৬৬.০%
কারিগর	২৭.০%	৫৬.০%
নিম্ন মধ্যবিত্ত বিবিধ	১৭.০%	৪৬.০%

সারণি: ৪.২- ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে ঋণগ্রস্ত পরিবারের শতকরা অনুপাত।

এই-সময়কালে বহু কৃষক তাদের জমি হারিয়েছিল এবং সেই জমি ক্রয় বা আত্মসাৎ করেছিল শহরের উচ্চ-বর্গীয় ভদ্রলোক শ্রেণি অর্থাৎ উচ্চ-বর্গীয় হিন্দু সমাজ, কারণ চাকরি ও ইংরেজী শিক্ষালাভের সূত্রে জমি ক্রয় করার মত অর্থনৈতিক ক্ষমতা তাদেরই ছিল, যেটি নিম্নবর্ণের হিন্দু বা মুসলমানদের ছিল না। পরবর্তীতে এরাই হয়েছিল ক্ষুদে জমিদার ও জোতদার।[৩২] জমির সাথে সম্পর্কহীন এই জমিদার-জোতদার শ্রেণি বিনা পরিশ্রমে বেশি মুনাফা লাভের আশায় বর্গাচাষ বা ভাগচাষকেই বেছে নিয়েছিল। এভাবে দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সময়ে বর্গাচাষ বা ভাগচাষ প্রথা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন বর্গাচাষের যে তথ্য দিয়েছিল দুর্ভিক্ষের পর তা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অম্বিকা ঘোষ ১৪টি জেলা নিয়ে এক নমুনা সমীক্ষার মাধ্যমে ১৯৪৪ সালে বর্গা বা ভাগচাষের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন। সেখানে দেখা যায় ১৯৪০-৪৪ সালে মাত্র চার বছরে তাঁর নমুনা সমীক্ষার ১৪টি জেলায় ভাগচাষের পরিমাণ ২০ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৭ শতাংশ। তাঁর মতে ১৯৪৪ সালে ৩৫ শতাংশ কৃষক ভাগচাষি বা বর্গাপ্রথায় জমি চাষবাস করেছে।[৩৩] ভূমিব্যবস্থার এই পরিবর্তিত চিত্রে জমির মালিক জমিদার-জোতদার কেবলমাত্র তার প্রথাগত অর্ধেক ভাগ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত না, ভাগের শস্য হিসাবে সেরা মানের ফসলটাই কুক্ষিগত করত। এছাড়াও জমিদার পক্ষ ভাগচাষি বা ভাড়াটিয়া চাষিদের থেকে সাধ্যমত লুটে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার চাঁদা, অগ্রিম সুদ, সেলামি ও আবওয়াব চাপিয়ে দিয়েছিল।[৩৪] সুন্দরবনের কাকদ্বীপ অঞ্চলে তেভাগার আগে যেসব অবৈধ নজরানা গৃহীত হত তার নাম ও পরিমাণ দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে আশা করা যায়।

নাম	অর্থ	বিঘা প্রতি আনুমানিক হার
দেড়া – বাড়ি	৫০% সুদের হারে জোরপূর্বক ঋণ, একপ্রকার চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ	প্রতি বিঘা দেড়মন
দুনো- বাড়ি	১০০% সুদের হারে ঋণ	দুই মন
কায়ালী	ভাগচাষির শস্যের ওজন করার জন্য ধার্য কর	তিন থেকে পাঁচ সের
খামার চাচানী	ভূস্বামীর খামার প্রস্তুত করার জন্য ধার্য কর	দুই থেকে চার সের
প্রাচীর ঘেরা	খামার বা উঠানের চারপাশ ঘেরার জন্য কর	দুই থেকে পাঁচ সের
নায়েবিয়ানা	জমি মালিকের এজেন্ট দ্বারা হিসাব রাখার জন্য ধার্য কর	তিন থেকে ছয় সের
হিসেবানা দারোয়ানি	ভূস্বামীর দারোয়ানা বা প্রহরীর জন্য ধার্য কর	এক থেকে তিন সের
নজরানা	মাঝে মাঝে ভূস্বামীকে উপহার	এক থেকে চার সের
পার্বনী	গ্রামের উৎসবের জন্য ধার্য কর	এক থেকে তিন সের
সেলামী	ভাড়া জমির বার্ষিক কর	এক থেকে দেড় মন বা চার থেকে সাত সের
শিক্ষা কর		তিন থেকে চার সের
গোলাকমতি	ভূস্বামীর গোলায় রাখা ধানের ওজন হ্রাসের জন্য ধার্য কর	দুই থেকে তিন সের

সারণি: ৪.৩- সুন্দরবনের কাকদ্বীপ অঞ্চলের অবৈধ্য নজরানা ও তার পরিমাণ।

এইসব বাড়তি আবওয়াবের মাধ্যমে ভূস্বামী শ্রেণি ভাগচাষিকে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল। ভাগচাষি তাঁর সমস্ত রক্ত-মাংস দিয়ে দিন-রাত পরিশ্রম করেও জমিদার,

জোতদারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারত না। বাধ্য হত বশ্যতা স্বীকার করে বেগার শ্রম দান করতে। এইসব ঘটনা ভূস্বামী এবং ভাগচাষির সামাজিক বৈষম্যকে প্রকট করেছিল। ভাগচাষি ছাতা, জুতা পরে ভূস্বামীর বাড়ি বা কাছারিতে যেতে পারত না। তাকে বসতে হত ভূস্বামী অপেক্ষা নিচে বা মাটিতে। কখনো কখনো শারীরিক অত্যাচারেরও শিকার হতে হত ভাগচাষিকে।[৩৫] বিবাহের বয়সে পৌঁছানো বর্গাদার বা ভাগচাষির মেয়ের বিয়ে হবে কি, হবে না তা নির্ভর করত জোতদার অথবা জমিদারের ইচ্ছার উপর। জোতদার ইচ্ছা করলে বর্গাদার বা ভাগচাষির মেয়ে বা স্ত্রীকে জোতদারের বাড়িতে পাঠাতে হত। ধান থেকে চাল তৈরীর মত কঠিন পরিশ্রম বিনা পারিশ্রমিকে করার জন্য জমিদারের ইচ্ছানুসারে ভাগচাষির মেয়ে বা স্ত্রীকে জমিদারের বাড়িতে যেতে হত।[৩৬] এভাবে গরীব চাষির পরিবারের মহিলাকে অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি যৌন নির্যাতনেরও শিকার হতে হত। ভাগ এবং চুক্তি নিয়ে অসন্তোষের পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্যময় এইসব আচরণ ভূস্বামী, জোতদার, জমিদারের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের পরিবেশ তৈরী করেছিল। ভাগচাষি কৃষক তাঁর সব যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে ভূমিহীন মজুর চাষিকে সঙ্গে নিয়ে জোতদার বিরোধী এক আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল যেটি বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে তেভাগা আন্দোলন কেবলমাত্র নিজ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা ভাগচাষির ঐক্যবদ্ধতার ফল নয়। অর্থাৎ তেভাগা আন্দোলনের দাবি ভাগচাষির মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। ভাগচাষির যন্ত্রনা আন্দোলনের রূপ নিতই না যদি না এখানে কমিউনিস্ট পার্টির আগমন ঘটত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার তৎকালীন পর্যবেক্ষক বা সভাপতি কৃষ্ণ বিনোদ রায়ের মতে তেভাগা, কৃষকের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফল নয়। এটি ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার দ্বারা সংগঠিত এক আন্দোলন।[৩৭] ভাগচাষির দুঃখ-যন্ত্রনার বর্ণনা এবং প্রচার, ভাগচাষিকে সংঘবদ্ধ

করে মিছিল-মিটিং-এর আয়োজন। এইসবের মাধ্যমে ভাগচাষিকে জমিদার-জোতদারের প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রতিপন্ন করতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৩০-এর দশক ভারতীয় রাজনীতিতে মার্কসবাদী ভাবধারার অনুপ্রবেশ। খেটে খাওয়া মানুষের ভাললাগা-মন্দলাগা, তাদের পাওয়া না পাওয়া সুখ-দুঃখগুলি তখন রাজনীতির আঙ্গিনায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই-সময় ভাগচাষি কৃষকের স্বপ্ন পূরণের কান্ডারি হিসাবে আবির্ভূত, সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী একদল যুবক ভারতীয় জনমানসে কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রবেশ ঘটিয়েছিল। পাশাপাশি রুশ বিপ্লবের সফলতাও ভারতীয় জনমানসকে কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি প্রভাবিত করেছিল।[৩৮] এইসব কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত মানুষগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির মানুষগুলিকে একত্রিত করে একটি সংগঠনের ছত্রছায়ায় আনতে সচেষ্ট হয়েছিল। তাই জেলায় জেলায় শুরু হয়েছিল কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন তৈরীর তৎপরতা। সুন্দরবনও এই প্রভাব থেকে দূরে থাকতে পারেনি। এই-সময় সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলি সুন্দরবনের কৃষকদের দুরাবস্থা নিরসনের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে।[৩৯] তবে তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড়ো সংগঠন কংগ্রেস এই বিষয়ে আগ্রহ দেখাতে চায়নি। তারা সমকালীন সময়ের সবচেয়ে বৃহৎ সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য পৃথক সংগঠন গড়ে উঠুক এটা চাইত না। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে কৃষকদের স্বার্থে যদি কোনো পৃথক আন্দোলন গড়ে তোলা হয় তবে তার শ্রেণিচরিত্রকে চেপে রাখা যাবে না। কৃষকের শ্রেণি চরিত্র সবসময় জমিদার-জোতদারদের স্বার্থ বিরোধী হবেই।[৪০] যেখানে বাংলার এমনকি সর্বভারতীয় কংগ্রেসের চরিত্র ছিল সাধারণত জমিদার ও পুঁজিবাদী শ্রেণির স্বার্থরক্ষা। কংগ্রেসের আঞ্চলিক সংগঠনগুলির পরিচালনার দায়িত্ব ছিল লটদার-জোতদার শ্রেণির উপর। কাজেই গরীব কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের দায়িত্ব এসে পড়েছিল সেইসব রাজনৈতিক দলগুলির উপর যারা কৃষক বিপ্লবের গুরুত্ব ও প্রয়োজন

স্বীকার করেছিল বা অবশ্যম্ভাবী বলে বিশ্বাস করেছিল। এককথায় বামপন্থী দলগুলি বিশেষ করে সি. পি. আই. এম এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তবে কংগ্রেসের মধ্য থেকে বামপন্থী ভাবধারায় প্রভাবিত কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্যরাও এই কাজে অংশগ্রহণ করেছিল।[৪১] এরপর ১৯৩৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পাটি নিষিদ্ধ হলেও এর সদস্যরা বসে থাকেনি। কৃষক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা একটি সর্বভারতীয় সংগঠন তৈরীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৩৬ সালের ১১ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে সর্বভারতীয় কৃষক সভা প্রতিষ্ঠা করেছিল। লক্ষ্ণৌ থেকে আগত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্যরা বাংলার জেলায় জেলায় আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৯৩৭ সালের ২৭-২৮শে মার্চ বাঁকুড়া জেলার পত্রসায়রে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা প্রতিষ্ঠা করেছিল। জেলায় জেলায় শুরু হয়েছিল সংগঠন তৈরীর কাজ। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে সাংগঠনিক কমিটি গঠন করে জমিদার জোতদার বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। কৃষককে উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছিল যে, সেও একজন মানুষ, এই বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তারও আছে।

১৯৩৬-৩৭ সাল থেকেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে সাংগঠনিক কমিটি গঠন করে জমিদার-জোতদার বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল। এই-সময়টিকে তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সমসাময়িক সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটা বড়ো অংশ জেল বন্দী অবস্থায় মার্কসবাদের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিল এবং জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করতে নেতৃত্বের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিল। তারা ফলতা, কাকদ্বীপ, সাগর, হাড়োয়া, ক্যানিং, সন্দেশখালি, মিনাখাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৪২] এইসব তরুণ কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের প্রথম পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল ১৯৩৬ সালে হাড়োয়ার উচিলদা

গ্রামে। 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির' অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল বঙ্কিম মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও মনোরঞ্জন শূর। পরবর্তীতে এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ভূপেন দত্ত, সৌমেন ঠাকুর, নলিনী প্রভা ঘোষ, প্রভাস রায়, হেমন্ত ঘোষাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই-সময় অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন মহল এবং গণমাধ্যমগুলিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি ব্যবস্থার অবসানের বিষয়ে নানা প্রকার গুঞ্জন ধ্বনিত হতে শুরু করেছিল। ১৯৩৬ সালের ১৭ই মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এবং চাষির মধ্যে জমিদার, তালুকদার এবং জোতদারের অবস্থান যদি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা অসম্ভব হয় তাহলে কোটি কোটি গরীব চাষির অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়।[৪৩] অমৃতবাজার পত্রিকা প্রতিবেদন করেছিল এই বলে যে, হিন্দু শাসনে মধ্যস্বত্বভোগীর কোনো স্থান ছিল না। চাষি নিজেই ছিলেন জমির মালিক। এমতাবস্থায় খাসমহল প্রথা নাকি জমিদারি প্রথা এর মধ্যে কোনোটি গরীব চাষির জীবনধারণের জন্য বেশি প্রয়োজন তা পছন্দের অধিকার চাষিরই থাকা উচিত।[৪৪] দৈনিক বসুমতী পত্রিকা কোনো প্রকার রাখঢাক না রেখে সোজাসুজি জমিদারি ব্যবস্থার অক্ষমতা ও অনগ্রগতির প্রশ্নকে সামনে এনে জমিদারি ব্যবস্থার পতন দাবি করেছিল।[৪৫] ১৯৩৬ সালের ৩রা এপ্রিল হিতবাদি পত্রিকা তাদের প্রতিবেদনে লিখেছিল দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা জমিদারি প্রথা মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে বঙ্গীয় পরিষদে আলোচনার মাধ্যমে সেটির বিলুপ্তি দরকার। আমরা রায়তদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সেই সময় আজ অতীত যখন জমিদার তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে বিলাসে মেতে থাকত। বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্টের সংশোধনীতে সেটি দূর করা সম্ভব হয়েছে।[৪৬] বঙ্গ রাজনীতির এইরূপ কৃষক দরদী আবহে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইন সভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই নির্বাচনে এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি বড়ো দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য কিছু স্বতন্ত্র প্রতিনিধির সমর্থনে কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষ থেকে এ. কে. ফজলুল হক প্রথম প্রধানমন্ত্রীর* দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কৃষক প্রজা পার্টির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ বা অবলুপ্তি। এই-সময়কার পত্রপত্রিকাও জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে থাকে এবং সরকারের কৃষক দরদী মনোভাবকে সমর্থন করতে থাকে। ১৯৩৭ সালে ১০ই এপ্রিল আজাদ পত্রিকা প্রতিবেদন করেছিল যে, দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রজাদের প্রতি নিপীড়ন ও অবিচারের স্থায়ী প্রতিকারের সময় এসেছে বা জরুরি হয়ে পড়েছে। এতদিন আইনসভায় জমিদার ও মহাজন শ্রেণির প্রাধান্য থাকায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা এবং জমিদারি ব্যবস্থাকে সমর্থন করত। এমনকি কূটনীতিবিদরাও এটিকে আমলাতন্ত্রের অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করত। যাইহোক এটি একটি সন্তুষ্টির বিষয় হবে যদি বাংলার আইনসভা এই সমস্যা সমাধানে মনোযোগ প্রদান করে।[৪৭] ১৯৩৭ সালের ২৩শে মে অ্যাডভ্যান্স পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় সরকারের ভূমি রাজস্ব বিভাগ রাজস্বের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে প্রভাব পড়েছে সেটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে চলেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে নতুন মন্ত্রিসভা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের মাধ্যমে সরকারের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বা আর্থিক উৎস বৃদ্ধি অপেক্ষা বহু সংখ্যক প্রজার প্রকৃত আকাঙ্খা বা ইচ্ছাকে উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ নেবে।[৪৮] তবে জমিদারি প্রথা অবলুপ্তির এই মহান কার্য্ সম্পাদন করা একা ফজলুল হকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দলের সদস্যরা এর বিরোধিতা করেছিল। এমতাবস্থায় জমিদারি প্রথার বাস্তব

*ব্রিটিশ শাসনে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (Bengal Legisletive Assembly) বা বাংলা প্রদেশের সরকারের প্রধানকে 'প্রধানমন্ত্রী' বলা হত। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী তকমা তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তকমার ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

অবস্থান সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য ফজলুজ হক ১১ সদস্যের একটি কমিশন গঠন করেছিলন। স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড-এর নেতৃত্বে ১৯৩৮ সালের ২রা এপ্রিল গঠিত এই কমিশন ফ্লাউড কমিশন বা ভূমি রাজস্ব কমিশন নামে পরিচিত ছিল। ১৯৪০ সালের ৩রা মার্চ কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করেছিল। রিপোর্টটির মূল সুপারিশ ছিল বর্তমান সময়ের অনুপযোগী জমিদারি ব্যবস্থায় এত ত্রুটি-বিচ্যুতি এসে গিয়েছে যে এটি আর জাতীয় স্বার্থের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাই অবিলম্বে জমিদারি প্রথা বিলোপ করে প্রকৃত চাষিকে রায়ত হিসাবে গণ্য করা উচিত।[৪৯] রাজস্ব কমিশনের এইরূপ রিপোর্ট জমিদারি প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। কৃষক সভার নেতাদের আরও বেশি করে সঙ্ঘবদ্ধ বা সংগঠিত হতে সাহায্য করেছিল। জমিদারি ব্যবস্থার পতনের এই পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা সুন্দরবনে সংগঠন তৈরীর কাজে সামিল হয়েছিল। ঘটনার উপক্রমণিকা প্রস্তুত করেছিল পোর্ট ক্যানিং জমিদারি কোম্পানি। কোম্পানি তার শাসনাধীন অঞ্চল বসিরহাট, সন্দেশখালি, হাড়োয়া এবং ক্যানিং এলাকার বহু কৃষকের বিরুদ্ধে বকেয়া খাজনা পরিশোধে ব্যর্থতার অভিযোগ এনেছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে দেওয়ানী মামলা রজ্জু করে প্রথমে তাদের চাষের জমি থেকে, পরে ধীরে ধীরে বসত ভিটা থেকে উচ্ছেদ করতে শুরু করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল একটাই উচ্ছেদকৃত জমিগুলিকে খাসজমিতে রূপান্তরিত করে ভাগচাষের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি। এই ঘটনার প্রতিবাদ স্বরূপ কৃষক সভা এই অঞ্চলের ভাগচাষিদের সংগঠিত করে জমিদার বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। তবে কৃষক সভার ছত্রছায়ায় কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার কাজ আরও আগে ১৯৩৬ সালে উচিলদহের আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। এরপর কৃষক সভা ১৯৩৭ সালের ২৭ অক্টোবর 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির' বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলিকে সরকারের কাছে তুলে ধরতে প্রায় ১০০০ বাস্তুচ্যুত কৃষককে একত্রিত করে কলকাতাতে জড়ো করেছিল।[৫০] এছাড়া সমসাময়িক সময়ের আরও কয়েকটি ঘটনা যেমন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪২ সালের ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে দরিদ্র কৃষকের করুণ পরিস্থিতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এসবের কারণে সৃষ্ট ভয়াবহ খাদ্য সংকট এবং সুন্দরবন অঞ্চলের প্রলয়কারী বন্যায় জলবাহিত রোগ, খাদ্য ও অন্যান্য পরিষেবার অভাবে শুধু চব্বিশ পরগনাতে ৩ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল।[৫১] তৎকালীন এই পরিস্থিতি কৃষক সভার নেতাদের সমগ্র বাংলা তথা সুন্দরবনের সংগঠন তৈরীর কাজকে সহজ করে দিয়েছিল। ত্রাণ কার্যের সুবিধার জন্য বাংলার কৃষক সমিতি বিভিন্ন গণসংগঠন ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে 'পিপলস রিলিফ কমিটি' গড়ে তুলেছিল।[৫২] এইভাবে দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণ কার্যকে সামনে রেখে কৃষক সমিতি সারা বাংলা তথা সুন্দরবনের প্রায় সব এলাকায় শোষিত কৃষকদের আরও কাছাকাছি আসতে সক্ষম হয়েছিল। নানারকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দুর্গত কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে শোষক শ্রেণির অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করতে দু-একটি করে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করতে শুরু করেছিল।

এভাবে ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে মূল তেভাগার সূচনার পূর্বে ১৯৩৬-৩৭ সাল থেকে কৃষক সভা বিভিন্ন জায়গায় সভা সমিতি ও আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকদের মননে তেভাগার দাবি এবং তেভাগা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে থাকে। এরপর ১৯৪৬ সালের ২১ থেকে ২৪শে মে বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার মৌভাগে অনুষ্ঠিত কৃষকসভার একটি সম্মেলনের মাধ্যমে তেভাগা আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।[৫৩] মৌভাগে অনুষ্ঠিত কৃষক সভার নবমতম সম্মেলনে ভাগচাষি যাতে খুব শীঘ্রই ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ অধিকার পায় অথবা মালিক যদি খরচের অর্ধেক প্রদান করে তাহলে ফসলের অর্ধেক পাবে এই মর্মে আইন প্রণয়ন করা উচিত মনে করে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।[৫৪] এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ১৯৪৬ সালের ২৯-৩০শে সেপ্টেম্বর তাদের কেন্দ্রীয় অফিসে আরও একবার সভার আয়োজন করেছিল এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ফসল কাটার মরসুমে অর্থাৎ

'এই মরসুমেই তেভাগা চাই'।[৫৫] প্রাদেশিক কৃষক সভার এই সিদ্ধান্তকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে জেলা এবং আঞ্চলিক কৃষক সংগঠনগুলি বিশাল মাত্রায় সক্রিয় হয়েছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা কর্তৃক তেভাগার লড়াই, কৃষকের লড়াইয়ের কায়দা ও চাষির লড়াই নামক তিনটি পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে ভাগচাষির সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা করেছিল। এছাড়াও তেভাগা আন্দোলনে কৃষক নেতৃত্ব, সংগঠন ও ভলেন্টিয়ারদের (স্বেচ্ছাসেবক) রাজনৈতিক শিক্ষা ও পথপ্রদর্শক হিসাবেও এই পুস্তিকাগুলি খুবই সহায়ক হয়েছিল। খুব দ্রুত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। তবে ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তেভাগা তার মূল চরিত্র লাভ করেছিল ঐ বছরের নভেম্বরে ফসল তোলার সময়। কৃষক সমিতির হিসাব অনুযায়ী এই-সময় সারা বাংলার ২৬টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলায় খুব দ্রুত আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল এবং প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক এতে অংশগ্রহণ করেছিল।[৫৬] আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা। কারণ এই জেলাগুলিই ছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার মজবুত সংগঠন। পরবর্তীতে মালদহ, যশোহর, খুলনা, পাবনা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী এবং চব্বিশ পরগনা জেলার অংশবিশেষে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। খুব অল্প হলেও হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলাতেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।[৫৭] চব্বিশ পরগনার দক্ষিণাংশে তেভাগা আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল কাকদ্বীপ, ক্যানিং, সন্দেশখালি, ভাঙ্গর, সোনারপুর এবং আরও অন্যান্য অঞ্চল। এই অঞ্চলগুলির মধ্য থেকে কাকদ্বীপ ছিল অন্যতম। আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র উত্তরবঙ্গ হলেও কাকদ্বীপ দেখিয়েছিল কৃষক জঙ্গিবাদের সবচেয়ে ভয়ানক মূর্তি। অদম্য প্রাণশক্তি আর কঠিন সংকল্পের মিশ্রণে পরিচালিত এইরূপ কৃষক সংগ্রাম বাংলার মানুষ আগে কখনো দেখেনি।[৫৮] কাকদ্বীপের তেভাগার দাবি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক

মানুষের আত্মাহুতির দান। এখানকার কৃষকরাই সবচেয়ে বেশি অত্যাচার বা সরকারি দমন নীতির শিকার হয়েছিল।

সমগ্র সুন্দরবনের মধ্যে কাকদ্বীপেই প্রথম জঙ্গি তেভাগার সূচনা হয়েছিল। তারপর তার রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল সুন্দরবনের অন্যান্য প্রান্তে। তবে গোসাবা ছিল স্বতন্ত্র। সমগ্র সুন্দরবন লড়েছিল অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে কিন্তু গোসাবার লড়াই ছিল প্রজা কল্যানকামী জমিদারের বিরুদ্ধে বা একটু স্পষ্টভাবে বললে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। তাই তেভাগার আঁচ গোসাবাকে দগ্ধ করেছিল অনেক পরেই। সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা একটু অন্য ভাবে, স্বতন্ত্র উপায়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তারা। গোসাবাতেই প্রথম কৃষকের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। কারণ স্যার হ্যামিল্টনের সমবায় ধারণার হাত ধরে কৃষকদের মধ্যে গোসাবার কৃষকরাই প্রথম কোনো বিদেশি বা উন্নত ধারণার সাথে পরিচিত হয়েছিল। কৃষকের আত্মচেতনায় জাগ্রত হয়েছিল এমন এক বীজমন্ত্র যেটি বৃক্ষ আকারে ছায়া দিয়েছিল কৃষককেই। কৃষক উপলব্ধি করতে পেরেছিল ঐক্যবদ্ধ কৃষকদের হাত কিনা করতে পারে, জঙ্গলাকীর্ন অঞ্চলকে করতে পারে বসবাসের ঠেক, আবদ্ধ জলাভূমিকে করতে পারে শস্য ক্ষেত। এভাবে হ্যামিল্টন সাহেবের সমবায় আন্দোলন সুন্দরবনের কৃষককে স্বাবলম্বী হওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল মধ্যবিত্ত কিছু যুবক যারা কমিউনিস্ট ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে হ্যামিল্টনাবাদে নিয়ে এসেছিল বিপ্লবের ধারা। হ্যামিল্টন পরবর্তী কলুষতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল হ্যামিল্টনাবাদকে।

জনকল্যানকামী মতাদর্শে গড়ে ওঠা স্যার হ্যামিল্টনের হ্যামিল্টনাবাদ বা গোসাবা এস্টেট শেষদিন অবধি তার জনকল্যান ধর্মকে বজায় রাখতে পারেনি। হ্যামিল্টন সাহেব যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন গোসাবা সমবায় প্রশংসার শিখরে ছিল। হ্যামিল্টন এস্টেটের সমৃদ্ধির জোয়ারে এসেছিল একদিন ভাটার টান। কারণ জীবিত থাকাকালীন এস্টেট তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব

ছিল সাহেবের নিজের কাঁধে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সেই দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর স্ত্রী লেডি মার্গারেট হ্যামিল্টনের উপর। লেডি হ্যামিল্টনকে সাক্ষী রেখে সর্বকার্য পরিচালনা করতেন ম্যানেজার সুধাংশু ভূষণ মজুমদার এবং তাঁর আত্মীয়বর্গ। আর সমস্যার সূত্রপাত এখান থেকেই। তবে হ্যামিল্টন সাহেব জীবিত থাকাকালীন কোনো প্রকার সমস্যা বা অসন্তোষ হয়নি যে এমন নয়। সমকালীন সময়ের চিঠিপত্র, পরিদর্শক বই এবং পঞ্চায়েতের বিবরণ থেকে গোসাবা সমবায়ের ভিতরে যে ঘুণ ধরেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। এসবের খবর হয় ড্যানিয়েল জানতেন না নতুবা সমসাময়িক কালের দৃষ্টিভঙ্গিতে এসবের কোনো ভুল ছিল না। আসলে সময়ের গতিতে ঘটতে থাকা ঘটনার ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া সম্ভব নয় আর যখন ফল অনুভূত হতে শুরু করে তখন কিছু করার থাকেনা। গবেষণার স্বার্থে হ্যামিল্টন সাহেবের বাসগৃহ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন নথি, চিঠিপত্র এবং পঞ্চায়েত বিবরণী থেকে গোসাবা এস্টেটের ভিতরকার অসন্তোষের একটা ছবি আঁকা যেতে পারে। যেখানে দেখা যায় সমগ্র বাংলার শোষিত কৃষকের মুক্তির মন্ত্র স্বরূপ তেভাগা সংগ্রামের প্রায় এক দশক পূর্ব থেকেই এস্টেটের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিদ্রোহের পরিবেশ প্রস্তুত করেছিল। ১৯০৩ সালে স্যার ড্যানিয়েল ১৪৩ ও ১৪৯ নং লটের গোসাবা এবং রাঙ্গাবেলিয়া দ্বীপের যে ১৩০০০ একর জমি লিজ নিয়েছিলেন ১৯২০ সালের মধ্যে তার প্রায় অর্ধেক জমি অর্থাৎ ২৬০০০ বিঘা পুনরুদ্ধার ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছিল। ১৯১৯-২০ সালের মধ্যে পুনরুদ্ধারকৃত এইসব জমির সেলামি মূল্য ছিল ৮ টাকা এবং এর খাজনা নির্ধারিত হয়েছিল ২ টাকা। সেলামির অর্থ এবং খাজনা পরিশোধের শর্তাধীনে কৃষককে একটা পাট্টা প্রদান করা হত।[৫৯] হ্যামিল্টন এস্টেটের সর্বশেষ আবাদকৃত অঞ্চল সুন্দরবনের ১৪৮নং দ্বীপ সাতজেলিয়া। সাহেব ১৯০৯ সালে দ্বীপটির জমিদারি স্বত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৩২ সালের শেষের দিকে এর আবাদ ক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন হয়েছিল। এখানে যারা জমি নিতে এসেছিল তাদেরকে বিঘা প্রতি ৮ টাকা সেলামী এবং ৩ টাকা বার্ষিক খাজনা

দিতে বলা হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা এবং বাংলার বাজারে ধানের মূল্য হ্রাসের কারণে একজন কৃষকের পক্ষে এই পরিমাণ সেলামী মূল্য অনেক বেশি মনে হয়েছিল। ফলে সাতজেলিয়া, লাহিড়িপুর, পাখিরালয়ের মত দ্বীপগুলির বহু জমি বেদখলি বা খাস জমি হিসাবে রয়ে গিয়েছিল। সমগ্র সাতজেলিয়েতে এইরকম জমির পরিমাণ ছিল ৪৯.৫ শতাংশ। আংশিকভাবে পুনরুদ্ধারকৃত এইসব খাস জমি সম্পূর্ণরূপে আবাদযোগ্য করতে কৃষকদের সঙ্গে একপ্রকার মৌখিক চুক্তি করা হত। ঠিকাচুক্তি নামে পরিচিত এই চুক্তি অনুসারে কৃষককে বার্ষিক তিন থেকে সাড়ে তিন টাকা হারে ভাড়া দিয়ে জমি চাষ করতে হত। সাতজেলিয়ার বহু কৃষক এই পদ্ধতিতে জমি পেয়েছিল এবং জমি হাসিলের জন্য কঠোর পরিশ্রমও করেছিল। কিন্তু জমি আবাদযোগ্য হওয়ার পর তাদেরকে প্রজাস্বত্ব প্রদান করা হয়নি।[৬০] অর্থাৎ প্রায় সমস্ত জমিই ছিল হ্যামিল্টন এস্টেটের অধীন। তবে চাষাবাদের ধরন ছিল আলাদা। হ্যামিল্টন এস্টেটের সমগ্র চাষের জমিগুলি মূলত তিনটি উপায়ে চাষাবাদ হত। প্রথমত, ৩ থেকে ৪ বছরের মধ্যে সেলামীর অর্থ পরিশোধ করতে সমর্থ হবে এই শর্তে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু পরিমাণ সেলামীর বিনিময়ে কৃষক জমি নিতে পারত। উক্ত সময়ের মধ্যে সেলামীর সেই অর্থ দিতে না পারলেও তাদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত না। বরং সেলামীর বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য চাষিকে আরও ৬ থেকে ৭ বছর সময় দেওয়া হত। এমনকি জমিস্বত্ব বিক্রির অধিকারও চাষির ছিল। এই সমস্ত জমির দলিলকে বলা হত 'আমলনামা'।[৬১] অর্থাৎ এই ধরনের জমির ক্ষেত্রে চাষি কিছুটা স্বাধীন ছিল। দ্বিতীয়ত, খাস তালুকের জমি, এখানে খাস মানে ভেস্ট নয়। নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে চাষিরা সরাসরি এস্টেটের কাছ থেকে চাষের জন্য জমি নিতে পারত। এর মধ্যে যারা খাজনার অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হত সেই সমস্ত ঋণগ্রস্ত চাষির জমি এস্টেট নিজের দখলে নিয়ে এসে খাসজমিতে পরিণত করত। জমিদারের ট্রাক্টর ও গরু-মোষের লাঙ্গল দিয়ে এই জমিগুলি চাষ করা হত। এইসব জমির পাশেই ছিল সরকারি খামার

যেখানে ধান তোলার ব্যবস্থা ছিল। তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জমির ধরনটি ছিল সাহেবের নিজের জমি। গোসাবা এবং রাঙ্গাবেলিয়া অপেক্ষা সাতজেলিয়াতে এই জমির পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। মূলত সাতজেলিয়া দ্বীপের সেলামী মূল্য বেশি হওয়ায় বহু জমি বেদখলী পড়েছিল। এইসব জমির পুরোটাই ছিল এস্টেটের নিজের দখলে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এই দুই ধরনের জমি চাষিরা চাষ করতে পারত ৫০:৫০ ভাগে। সার, বীজ, শ্রম সব দিত চাষি, ভাগের সময় তার জুটতো শুধুই আধা-আধি। জমির ফসল তোলা হত এস্টেটের খামারগুলিতে তারপর সেখান থেকে ভাগ করে নিয়ে যেত চাষি। এই-সময় সুধাংশু ভূষণ মজুমদার সাহেবকে বোঝালেন যে এক জমি বারবার একই চাষিকে দিয়ে চাষ করালে জমিতে চাষির স্বত্ব বর্তাবে। এই থেকে রক্ষা পেতে চাষিদের চাষের জমি রদবদল করে দেওয়া জরুরি। ম্যানেজারের কথায় বিশ্বাস করে সাহেব তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। কারণ সাহেবের দেশে মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব না থাকায় ভাগচাষ প্রথা সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। হ্যামিল্টন এস্টেটে সমস্যার সূত্রপাত এখান থেকেই। ছোটো-বড়ো অসংখ্য খাল এবং কোথাও উঁচু কোথাও নিচু এইরূপ নতুন আবাদ এলাকার সব জায়গায় চাষ করা সম্ভব নয়। তাই জলা ভূমি এবং খুব উঁচু জমি বাদ দিয়ে ধান চাষের যোগ্য জমি পেতে গেলে জমিদারের কর্মীদের উৎকোচ দিতে হত। যারা উৎকোচ দিতে সক্ষম হত তারাই পেত ভালো জমি আর যারা উৎকোচ দিতে অক্ষম ছিল তাদের দেওয়া হত চাষের অযোগ্য জমি, কোথাও কোথাও আবার পরিমাণে কম। এই সুযোগটাই গ্রহণ করেছিলেন সৌমেন ঠাকুর। তৎকালীন সময়ের ‘পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি’ কর্তৃক জমি খাস করে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মশাল জ্বালিয়েছিল যেসব বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতা তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। লোকে ডাকতেন সৌমেন ঠাকুর নামে। তিনি ঠাকুর বাড়ির চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসে সাম্যবাদের আদর্শে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কৃষক কল্যাণের মন্ত্রে দীক্ষিত সৌমেন ঠাকুর ১৯৩৪ সালে ‘কমিউনিস্ট

পার্টি অব ইন্ডিয়ার' অতি বাম চরিত্রের বিরোধিতা করে 'কমিউনিস্ট লীগ অব ইন্ডিয়া, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নতুন পার্টি প্রতিষ্ঠা করে সৌমেন ঠাকুর বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির জন্য কৃষকদের সংগঠিত করতে শুরু করেছিলেন। এরপর ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সঙ্গে মিলিত হয়ে বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনার একটা বৃহৎ অংশ হাড়োয়া, হাসনাবাদ, সন্দেশখালি এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং অঞ্চলের 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির' খাসজমির ধান লুঠ, খাজনা বন্ধের মত আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর এই আন্দোলনের উত্তাপ স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন এস্টেটের মধ্যেও ছড়াতে শুরু করেছিল। তিনিই প্রথম হ্যামিল্টন এস্টেটের খাসজমিতে চাষিদের স্থায়ী স্বত্বের দাবিতে মিটিং-মিছিল শুরু করেছিলেন। ১৯৩৭ সালের শেষের দিকে অসাধারণ বাগ্মী সৌমেন ঠাকুর রাঙ্গাবেলিয়ায় এক জনসভার আয়োজন করেছিলেন। ভিড়ে ঠাসা ঐ জনসভার পর কৃষক অসন্তোষের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এস্টেটের এতদিনের পুঞ্জিত সব জনকল্যাণকর কর্মের সফলতাকে। এস্টেটের কোনায় কোনায় পৌঁছে গিয়েছিল বিদ্রোহের আগুন। ভূমিরাজস্ব কমিশন রিপোর্ট দিয়েছিল, কৃষক সমিতির ইন্ধনে কৃষক খাসজমির ফসল জোর করে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এইরকম উত্তেজনামূলক পরিস্থিতিতে সাহেব, বাংলার লাট লর্ড ব্রেবোর্নকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে লিখেছিলেন, রায়তদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। শীঘ্রই কিছু সেনা পাঠান। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার এইচ গ্রাহাম এলাকা পরিদর্শন করে স্বরাষ্ট্র সচিবকে রিপোর্ট দিয়েছিলেন "১৭ই জানুয়ারি গোসাবায় গিয়ে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন এবং তাঁর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করি। ... বহিরাগতরা স্যার ড্যানিয়েলের ব্যবস্থাপনার একটি ত্রুটির সুযোগ নিয়েছে। সাতজেলিয়া নামে একটি এলাকায় তাকে দিয়ে 'ভাগচাষ' প্রথার প্রবর্তন করানো হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, ওটা নতুন জমি। তিনি ভাগচাষ প্রথার কয়েকজন সম্ভাব্য চাষিকে পরীক্ষা করে দেখছেন। অবশ্য বসিরহাটের এস. ডি. ও. আমাকে জানালেন

চার-পাঁচ বছর আগে ওই জমি চাষিদেরই ছিল। তারপর তা জলে ডুবে যায়। পরে জল সরে জমি জেগে ওঠার পর চাষিরা বকেয়া খাজনা দিয়ে জমি ফেরৎ চায়। কিন্তু এস্টেট কর্তৃপক্ষ জমি ফেরত না দিয়ে তাদেরকে ভাগচাষে দেয়। তাই নিয়ে যত অসন্তোষ। আমি স্যার ড্যানিয়েলকে বললাম, তাঁর ম্যানেজার কাজটা ঠিক করেনি। তাঁকে সুপারিশ করলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করুন। কেননা এই ভাগচাষ প্রথার জন্যই সংঘর্ষের সৃষ্টি হচ্ছে এবং বহিরাগতরা তাঁর জমিদারি ভাগচাষ প্রথার মধ্যে ফেলে দিয়ে এমন এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছে যার ফলে মহকুমার প্রশাসন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হতে চলেছে। এটা খুব পরিস্কার সন্দেশখালি, হাড়োয়া, হাসনাবাদ, ক্যানিং প্রভৃতি এলাকাতেও জমিদাররা আইনের সাহায্য হলেও হঠকারিতার সঙ্গে অসংখ্য জমি খাস করে নিচ্ছেন এবং রায়তদের আধিয়ারে পরিণত করছেন"।[৬২] প্রেসিডেন্সি কমিশনারের রিপোর্টের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায় গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের। ১৯৩৯ সালের ৮-২২শে ফেব্রুয়ারি গোয়েন্দা বিভাগের পাক্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, "কৃষক আন্দোলনকারীদের তৎপরতা বেড়েই চলেছে। ক্যানিং ও সন্দেশখালি থানা এলাকায় তারা বেশ কয়েকটি সভা করেছে। ডায়মন্ডহারবার মহকুমার জয়নগর ও মগরাহাট থানাতেও তাদের কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক খবর থেকে মনে হচ্ছে, এঁরা হিংসাত্মক কার্যকলাপে ঝুঁকছে। ১১ই ফেব্রুয়ারি সৌমেন ঠাকুরের সভাপতিত্বে বড়ো সভা হয়েছে। ১৪ তারিখে জমিদারের খামার থেকে ভাগের ধান রাতারাতি লোপাট হয়ে যায়। ঐদিন তিনটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের নাশকতার ফল বলে মনে করা হচ্ছে"।[৬৩] তখন সাতজেলিয়ার নায়েব ছিল হরিপদ দত্ত। সম্পর্কে তিনি ছিল ম্যানেজার সুধাংশু ভূষণ মজুমদারের শ্যালক। খুবই রাশভারি এবং অত্যাচারী লোক। সরকারি খামারের ধান লুঠের এই ঘটনার কথা জানতে পেরে ১০০ লাঠিয়াল এবং দুটি বন্দুক সহ ঘটনা স্থলে পৌঁছান। তাঁর কাছে খবর ছিল লুঠ করা ধান খামারের পাশে লক্ষণ মণ্ডলের বাড়িতে আছে।

সেখান থেকে লুঠের ধান উদ্ধার করতে নায়েব মশাই লক্ষণ মন্ডল সহ অন্যদের উপর মারধর করতে শুরু করেছিল। শুরু হয়েছিল উভই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ ও সংঘর্ষ। সংঘর্ষের মধ্যে থেকে কারা যেন বন্দুক দুটি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং হরিপদ দত্তের মাথায় সজোরে বাড়ি মেরেছিল। মারামারিতে নায়েবের মাথা ফেটে গিয়েছিল।[৬৪] এইরূপ উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির সমাধান নিরসনে সাহেব, বাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও লাট সাহেবের একান্ত সচিবকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন "আমার সহকারী ম্যানেজার নির্মম ভাবে প্রহৃত। আজ চিকিৎসকের দায়িত্বে তাঁকে অর্ধমৃত অবস্থায় কলকাতায় পাঠানো হল। আশা করি আপনি এই অরাজকতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। দুষ্কৃতীরা দুটি বন্দুকও লুঠ করেছে"। এরপর সাহেব তৎকালীন চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক কে. এ. এল. হিলকে চিঠি লিখেছিলেন, জানিয়েছিলেন পরিস্থিতির কথা "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু বসিরহাট মহকুমার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হচ্ছে এবং এর প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না। গতকাল একজন প্রজা এখানকার খাসজমি দখল করার ভয় দেখায় এবং আজও বে-আইনি কার্যকলাপে জনগণকে সামিল করার উদ্দেশ্যে মিটিং ডাকা হয়েছে। এইমাত্র পার্শ্ববর্তী লটের একজন জমিদার এসে জানালেন যে এখান থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত পুরো মহকুমাতে প্রচন্ড বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। খাদ্যশস্য লুঠপাট শুরু হয়েছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এখনই সেনা পাঠান"।[৬৫] সাহেবের ইচ্ছানুসারে গোসাবা এস্টেটের শান্তি রক্ষার্থে শুরু হয়েছিল পুলিশ মোতায়েন। প্রশাসনের তরফ থেকে সমগ্র এস্টেট জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। গোসাবাবাসী প্রথম পরিচিত হয়েছিল ১৪৪ ধারার সাথে। ৪/৫ জনের বেশি একত্রিত হওয়া বে-আইনি। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই ধরে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়েছিল। এভাবে পুলিশের উপস্থিতিতে আন্দোলন তার গতি হারাতে শুরু করে। একই সময়ে বেজে উঠেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা, ভারতরক্ষা আইনে

সৌমেন ঠাকুরকে গ্রেফতার করা হলে গোসাবাবাসীর জমিদার বিরোধী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। শুর হয়েছিল ভালোভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। কারণ সারা বিশ্বের ন্যায় দ্বীপভূমি গোসাবা এস্টেটেও দেখেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিদারুন সংকট এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অকাল। সমসাময়িক সময়ে গোসাবাবাসী সাক্ষী হয়েছিল আরও এক মর্মান্তিক ঘটনার। ১৯৩৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর নিজ বাসভূমিতে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের মৃত্যু সমগ্র এস্টেটকে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল।

সাহেবের মৃত্যুতে জন্ম হয়েছিল এক নতুন গোসাবার। গোসাবার স্বর্ণযুগের সমাপ্তি আর কালো অধ্যায়ের সূচনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা এবং হ্যামিল্টন সাহেবের মৃত্যু এস্টেটের কর্মচারীদের সুযোগ করে দিয়েছিল নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার। শাসন-শৈথিল্যের সুযোগ নিয়ে যে যার আখের গোছাতে শুরু করেছিল। ম্যানেজার সুধাংশু ভূষণ মজুমদার এবং তাঁর আত্মীয়বর্গ এস্টেটের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। জমিদারের নায়েব, আমলা, গোমস্তাদের শোষণের মাত্রা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা হার মানিয়েছিল পার্শ্ববর্তী জমিদারকেও। সকল প্রজাকে জমিদারের প্রতি আনুগত্য আদায় করাতে দমন-পীড়ন, জমি কেড়ে নিয়ে জমিদারি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, চাকরি থেকে বরখাস্ত, উৎকোচ নেওয়া ইত্যাদি পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাঙ্গাবেলিয়া লটের রাজাপুর গ্রামের শ্রী রূকো মোল্লার এমনি এক দরখাস্তের হদিশ পাওয়া যায় এস্টেটের কাগজ পত্রের মধ্য থেকে।[৬৬] এইরূপ শোষণের হাত থেকে রেহাই পেল না একসময়কার জনকল্যাণকামী এস্টেটের তিন মূল স্তম্ভ ধর্মগোলা, রাইসমিল এবং সমবায় ঋণদান সমিতি।

খরা, দুর্ভিক্ষের মত অনভিপ্রেত ঘটনা থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে, তাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য হ্যামিল্টন সাহেব ধর্মগোলা নামক এক সমবায় শস্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিবছর চাষিরা তাদের উদ্বৃত্ত ফসলের একটি অংশ ধর্মগোলায় জমা রাখত, আবার প্রয়োজনে

ধার নিত। তবে বছর শেষে ২৫ শতাংশ মুনাফা সমেত সেই ধার ফেরত দিতে হত। এইরূপ জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান সাহেবের মৃত্যুর সাথে সাথে প্রশাসনের আলগা বাঁধনের সুযোগে ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়েছিল। ধর্মগোলায় প্রতিবছর যে পরিমাণ ধান গোলাজাত করা হত বছর শেষে তার পরিমাণ কিছুটা কমে যেত। কারণটা স্বাভাবিক ধান বেশিদিন গোলাজাত করে রাখলে শুকিয়ে তার ওজন কমে যেত। চাষিদের ভাষায় এটি শুক্তি নামে পরিচিত। তবে ধর্মগোলায় ধান রাখলে শুক্তির পরিমাণ যা হওয়ার তার থেকে অস্বাভাবিক পরিমাণে কম হয়েছিল এমিলিবাড়ি ধর্মগোলায়। চাষি উপলব্ধি করতে পেরেছিল ধর্মগোলার ধর্ম উঠে যাচ্ছে। গোলা ক্রমে ক্রমে খালি হয়ে যাচ্ছে। সুযোগ সন্ধানী অনেকে আবার জমার থেকে বেশি পরিমাণ ধান ধার হিসাবে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু শোধ করছে না। গোসাবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুপারভাইজার সাতজেলিয়া এমিলিবাড়ি সমবায় ব্যাংকের হিসাব দেখে রিপোর্ট দিয়েছিলেন "ধর্মগোলায় শুক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে হইতেছে। ভবিষ্যতে যাহাতে এত শুক্তি না হয় সেজন্য পঞ্চায়েতগণ বিশেষ চেষ্টা করিবে। ধর্মগোলা হইতে ধান্য গরিবের সাহায্যের জন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘকে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহার কোনো সভা হয় নাই। সেক্রেটারি মহাশয় এবিষয়য়ে জানাইলেন যে ওই ধান্য সকলের মত অনুসারে দেওয়া হইয়াছে। ভবিষ্যতে কোনোও ধান্য সভায় পাশ না করিয়া যেন দেওয়া না হয়। সমিতির দু-একজন সভ্যের ধর্মগোলার দেনা সন্দেহজনক মনে হয়"। পরের বছরের রিপোর্ট " অদ্য পর্যন্ত ধর্মগোলার হিসাবে যাহা দৃষ্ট হইল তাহাতে ১৩৪৯ সালে মোট ধান্য আদায় আঠারো বিশ নয় কুড়ি দুই পালি হইয়াছিল। উক্ত ধান্য ১৩৫০ সালে দাদনের পর দেখা যায় দুই বিশ এক কুড়ি দুই পালি ধান্য কম। হিসাব রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ধান্য শুক্তি গিয়াছে"।[৬৭] অর্থাৎ যে নিয়মের মধ্যে ধর্মগোলাগুলি চলতো তা আর মানা করা হত না। ধর্মগোলাগুলি নিজেদের খেয়ালে কাজ করছিল।

হ্যামিল্টনাবাদে প্রথম যে দুর্নীতির ঘটনা সর্বসমক্ষে আসে সেটি ছিল সমবায় রাইস মিলের কিছু অসৎ কর্মী কর্তৃক ওজন কারচুপির অভিযোগ। সমবায় রাইস মিলের কাজ ছিল বছর শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত ঋণের তালিকা এবং এস্টেট কর্তৃক প্রেরিত খাজনার তালিকা দেখে চাষিদের থেকে ধানের মাধ্যমে ঋণ ও খাজনার টাকা কেটে রাখা। অভিযোগ উঠেছিল রাইস মিলের কর্মীরা ধান মাপার সময় বাটখারার পিছনে গালা লাগিয়ে ওজন কারচুপি করছে। চাষি দেখলো বাড়ি থেকে মেপে আনা ৪০ সের ধান রাইস মিলে ওজন করলে কমে হচ্ছে ৩৯ সের তার উপর আবার ধলতা (ধুলো) বাবদ প্রতি ৪০ সেরে ১ সের বাদ অর্থাৎ প্রতি ৪০ সের ধানে ২ সের কমে হচ্ছে ৩৮ সের ধান। চাষি উপলব্ধি করতে পারছিল যে তাদের ওজনে ঠকানো হচ্ছে। তবু ঋণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে টু-শব্দটিও করতে পারত না। প্রজাদের চাপা গুঞ্জন গ্রামের যাত্রাভিনেতা গজেন মাইতির কানে পৌঁছায়। বিষয়টি পরখ করতে গিয়ে তিনিও একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতের ভয় না করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাইস মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। জমিদারের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগের ফল হয়েছিল ভিটে মাটি থেকে উৎখাত। তাই গজেন বাবু পার্শ্ববর্তী জমিদারি এলাকা সূর্যবেড়েতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এতকিছুর পরও তিনি থেমে থাকেননি। তাঁর উপর যে অন্যায় হয়েছে সেটি যাতে অন্য কোনো চাষির উপর না হয় সেই ব্যবস্থা নিতে গিয়ে গজেন বাবু বসিরহাট কোর্টে রাইস মিলের বিরুদ্ধে কেস করেছিলেন। মামলায় এস্টেট পরাজিত হয়েছিল। জয়ী গজেন মাইতি পরিচিত হয়েছিলেন চাষিদের নেতা হিসাবে আর তাঁর মামলা পরিচিত হয়েছিল বিখ্যাত 'হন্দর' মামলা নামে।[৬৮] এভাবে আস্তে আস্তে এস্টেটের সর্বপ্রকার কুকর্ম প্রকাশ্যে আসতে থাকে। এরপর কিছু কিছু মানুষ সাহসে ভর করে এস্টেটের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছিল। এতদিন যেসব সংস্থা বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করছিল বলে মনে হয়েছিল, সেই সংস্থার বিরুদ্ধেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। সাহেব জীবিত থাকাকালীন

সমবায় ব্যাংক, সমবায় ঋণদান সমিতি, সমবায় গ্রাম সমিতি প্রভৃতি এস্টেট পরিচালিত সংস্থাগুলির গঠন প্রনালী এবং তাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোনোরূপ প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু স্যার ড্যানিয়েলের মৃত্যুর পর সংস্থাগুলির সীমাহীন শোষণ ছাপিয়ে গিয়েছিল ভাল কর্মের বহরকে। সংস্থাগুলির সূচনা লগ্ন থেকেই এর পরিচালকবর্গ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি। এস্টেটের ম্যানেজার সুধাংশু ভূষণ মজুমদার তাঁর ইচ্ছামত এস্টেটের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত আছে এমন ব্যক্তি, এমনকি নিজের আত্মীয় স্বজনকে সংস্থাগুলির মাথায় বসিয়ে রেখেছিলেন। পরিচালকবর্গ নির্বাচনের জন্য নিয়ম করে প্রত্যেক বছর সংস্থাগুলির বার্ষিক মিটিং অনুষ্ঠিত হত। তবে কারা হবেন সর্বেসর্বা তা আগে থেকেই নির্দিষ্ট থাকত। কোনো রকম ভোটা-ভুটি ছাড়াই তারাই হতেন সর্বময় কর্তা। গ্রাম সমবায় সমিতির সূচনাকাল থেকে ১৯৫৫ সাল অবধি একই সভাপতি আছেন এমন একটি তালিকার উল্লেখ করা হল।[৬৯]

গ্রাম সমিতির নাম	গ্রাম সমিতির সভাপতি	সভাপতিত্বের সময়কাল
সোনাগাঁ	শশী বেরা	সূচনা থেকে ১৯৫৫ সাল
বেগবাগান	চতুর্ভূজ বেরা	,,
উত্তর রাঙ্গাবেলিয়া	দ্বারিকানাথ মন্ডল	,,
দক্ষিণ রাঙ্গাবেলিয়া	অর্জুন মন্ডল	,,
উত্তর ডাঙ্গা	ভীম মিস্ত্রী	,,
জটিরামপুর	জটিরাম কার	,,
পাখিরালয়	রুহীনি বাছাড়	,,
আরামপুর	প্রবোদ সরকার	,,
আরামপুর পূর্বপাড়া	রামকৃষ্ণ প্রধান	,,
পশ্চিম দুলকি	সুরেন্দ্রনাথ মন্ডল	,,

সারণি: ৪.৪- এল খাতের আলির তথ্যের ভিত্তিতে গোসাবা গ্রাম সমবায় সমিতির সূচনাকাল থেকে ১৯৫৫ সাল অবধি সভাপতির তালিকা।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫২ সাল অবধি গোসাবা এস্টেট এমপ্লয়াইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিটির কার্য বিবরণী থেকেও একই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। উক্ত সময়ে কমিটির বার্ষিক সভার সর্বময় কর্তা (সভাপতি) ছিলেন ম্যানেজার সুধাংশু ভূষণ মজুমদার এবং সেক্রেটারি ছিলেন শান্তিময় মজুমদার।[৭০] স্বজনপোষণের এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকও। ব্যাংকগুলির পরিচালন ব্যবস্থাতে কোনো প্রকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি। তাই অন্য সব সমবায় ব্যবস্থার মত এখানেও দুর্নীতির প্রবেশ ঘটেছিল। তৎকালীন সময়ের পঞ্চায়েত সভাগুলির বেশিরভাগ আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ বিতরণ এবং তাকে ঘিরে অন্যান্য সমস্যাগুলি। এটা ঠিক যে সেই প্রথম থেকে এখানে দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশাপাশি কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষও ছিল, যারা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করত না। এমনকি ভালো ফসলের সময় যখন কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় তখনও তাঁরা ঋণের টাকা পরিশোধ করতেন না। ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা থেকে ১৯৪৬ সাল অবধি এই ধরনের বহু ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৭১] সমবায়ের পক্ষে বিব্রতকর অবস্থার একটি স্পষ্ট উদাহরণ ছিল পরিদর্শন বইয়ের একটি রিপোর্ট, যেখানে দেখা যায় ব্যাংকের সচিব নিজেই ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে না পেরে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।[৭২] ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে পঞ্চায়েতের কাছে এমন ধরনের অনুরোধ করতে দেখা গেছে যে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঋণখেলাপিরা গৃহপালিত পশু বিক্রি করে হলেও যেন ঋণের অর্থ পরিশোধ করে।[৭৩] এছাড়াও আরেক ধরনের অসততার নিদর্শন পাওয়া যায় রিপোর্টগুলি থেকে, যেখানে দেখা যায় ঋণ হিসাবে পাওয়া অর্থ অন্য খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে।[৭৪] প্রথম দিকে এইসব ঘটনা এড়ানোর বা এর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।[৭৫] পরবর্তীতে এই ধরনের কাজের জন্য কোনো প্রকার শাস্তির বর্ণনা দেখা যায় না। ঋণ পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সচিব ও চেয়ারম্যানের পক্ষপাতিত্বের ঘটনা ঘটেছে এমন কয়েকটি রিপোর্টের বর্ণনাও

পাওয়া যায়।[৭৬] ফলে সাধারণ প্রজা ঋণ গ্রহণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল অথবা পর্যাপ্ত ঋণ পাচ্ছিলনা।

সমবায় ব্যাংকের মত কলুষতার অন্ধকারে ডুবে ছিল সমবায় সমিতির অন্যান্য শাখাও। 'গোসাবা সমবায় ভান্ডার' যার উদ্ভব হয়েছিল গোসাবাবাসীকে বাজারের অসৎ ব্যবসায়ীর ঠকানোর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। সেই সমবায় ভান্ডারের বিরুদ্ধেই দেখা গিয়েছিল কতশত অভিযোগ। সদস্যরা তাদের মোট বাৎসরিক ক্রয়ের উপর যে ছাড় পেত সেটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বাংলা সরকারের সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট গ্রামগুলিতে কেরোসিন, চিনি এবং বস্ত্রের মত সামগ্রী বিতরণের জন্য ভিলেজ ফুড কমিটি গঠন করেছিল।[৭৭] কিন্তু গোসাবা এস্টেটে এই দায়িত্ব পালন করেছিল গোসাবা সমবায় ভান্ডারগুলি। তারা রেশন কার্ডের মাধ্যমে পণ্য সামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু দুর্নীতির কালোছায়া তাদের এতটাই গ্রাস করেছিল যে, সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রেরিত দ্রব্য সামগ্রী জনসাধারণ অপেক্ষা এস্টেটে কর্মরত কর্মচারী এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন পেয়েছিল বেশি। এসব ঘটনা সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের মাত্রা দ্বিগুণ করেছিল। এছাড়াও সুন্দরবনের অন্যান্য জমিদারদের মত হ্যামিল্টন এস্টেটে নায়েব ও ম্যানেজার 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি গ্রহণ করেছিল। তারা এস্টেটের বিভিন্ন স্থানে খবর সংগ্রহের জন্য এজেন্ট বা তথ্য সরবরাহদাতা রেখেছিল। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কৃষকদের উপর নায়েবরা এমন অত্যাচার করত যে, যদি কখনো নায়েব তাঁর কাছারি বাড়িতে কোনো কৃষককে ডাকত সে ভয়ে একা যেতে পারত না। এমনও হয়েছে কৃষকরা তাদের মাঠের ফসল ফেলে রেখে রাতারাতি চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।[৭৮] সংক্ষেপে বলতে গেলে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের মৃত্যুর পর এস্টেটের কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করেছিল। এসব কিছুর পাশাপাশি আরও একটি ঘটনা কৃষক অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল তা'হল কৃষি মজুরি চুক্তি।

একদিকে হ্যামিল্টন সাহেবের মৃত্যু অন্য দিকে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট অন্যান্য জমিদারের ন্যায় হ্যামিল্টন এস্টেটের ম্যানেজারের বুকে ভীতির সঞ্চার করেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কৃষকদের উপর শোষণ-শাসনের দিন অবসানের পথে। অবস্থার ভয়াবহতা বিচার করে এতদিন ধরে ভোগ করা জমি হারানোর ভয়ে ভীত ম্যানেজার সুধাংশু ভূষণ মজুমদার এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন কৃষি মজুরি চুক্তি অর্থাৎ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চাষাবাদ। আসলে বিষয়টা এমন ছিল না থাকলে কি আর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হত। হ্যামিল্টন এস্টেটের সর্বমোট চাষের এলাকার মধ্য থেকে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার বিঘা জমি রায়তি স্বত্বে বন্দোবস্ত দেওয়ার পর আরও প্রায় ৩০ হাজার বিঘা জমি এস্টেটের খাস জমি হিসাবে রয়ে গিয়েছিল। এযাবৎ কাল এইসব খাস জমিগুলি চাষাবাদ হত ভাগচাষের মাধ্যমে। তবে জমিতে যাতে চাষির স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয় সেজন্য রদবদল করে চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে বর্গাদার আইনের মাধ্যমে জমি যদি চলে যায় এই ভয়ে ভীত হয়ে, এতদিন মৌখিক ভাবে যে ভাগচাষ ব্যবস্থার চল ছিল তার পরিবর্তন ঘটিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল লিখিত চুক্তি। চাষিকে প্রতিবছর জমিদারের কাছারিতে গিয়ে লিখে দিতে হত যে, বিঘা প্রতি ৩ টাকা মজুরির বিনিময়ে জমিদারের জমি চাষাবাদ করে সম্পূর্ণ ফসল জমিদারের খামারে তুলে ঝাড়াই মাড়াই করে দেবে।[৭৯] এইসব ঘটনা কৃষকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার ভয়ে সেসব ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়নি। দিন দিন সেগুলি জমে থাকছিল উপযুক্ত সময় আর প্রতিবাদী চরিত্রের খোঁজে। উপস্থিত হয়েছিল সেই সময়, ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সাফল্য এবং গান্ধীজীর গণআন্দোলনের সাফল্যে জেলবন্দি অনুশীলন সমিতির সদস্য ও হিন্দুস্থান সোশালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মির সদস্যরা উপলব্ধি করেছিল যে, মাঝে মাঝে সন্ত্রাস সৃষ্টি নয় মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের মাধ্যমে সংঘটিত আন্দোলনই প্রকৃত বিপ্লবের পথ। তাই ১৯৪০ সালের ১৯শে

মার্চ ত্রিদিব চৌধুরীর নেতৃত্বে বিহারে জন্ম হয়েছিল বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল।[৮০] একদিকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আর অন্যদিকে জমিদারের শোষণ যন্ত্র থেকে কৃষকের মুক্তি, এই দুটিকে সমগোত্রীয় ভেবে তাদের সংগ্রামী পথ চলা শুরু হয়েছিল। সুন্দরবনের এই অঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষ, কৃষক ও শ্রমিকদের একত্রিত করে তারা জমিদারি বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এমন সময় ১৯৪২ সালের সর্বগ্রাসী ঘূর্ণীঝড় এবং ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এসবের সম্মিলিত ভয়াবহতা পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাংশের বহু পরিবারকে তাদের সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য করেছিল। পরিস্থিতির এই নির্মম পরিহাসে দুবেলা দুমুঠো মোটা ভাত ও মোটা কাপড় সংগ্রহের সন্ধানে ওপার বাংলা থেকে হ্যামিল্টন এস্টেটে যেসব পরিবার এসেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল জ্যোতির্ময় নাথ। যিনি সবার কাছে পরিচিত ছিল অরিন্দম নাথ নামে। বরিশাল বি. এম. কলেজের ছাত্র অরিন্দম নাথ কলেজ জীবনে ছিলেন আর. এস. পি দলের সদস্য, নাম করা ছাত্র নেতা। গোসাবাতে এসেই খুব অল্প দিনের মধ্যেই তিনি নিজের আসল পরিচয়ের জানান দিতে শুরু করেছিলেন। তাঁর সাথে পরিচয় হয়েছিল বিখ্যাত হন্দর মামলা খ্যাত গজেন মাইতি, সেবক চরন দাস, অচিন্ত্য প্রধান, বিনোদ মন্ডল, রাজেন মন্ডল প্রমুখ ব্যক্তি বর্গের। এইসব মানুষগুলির একত্রিত হওয়া এবং একে অপরের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার কারণও ছিল একটাই তা'হল দিনে দিনে জমতে থাকা দুর্নীতির কবল থেকে গোসাবাবাসীর মুক্তির সন্ধান। ইতিমধ্যে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের এক বিকালে অরিন্দম নাথ যোগাযোগ করেছিলেন কলকাতায় আর. এস. পি-র সদর দপ্তরে। আর. এস. পি নেতাদের জানালেন স্যার হ্যামিল্টনের সমবায়ে শোষণ ও অত্যাচার চলছে। এস্টেটের জমিদার, আমলা-গোমস্তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে স্থানীয় জনগণ। হ্যামিল্টন এস্টেটের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও ভূমিহীনরা পশুর জীবনযাপন করছে। ওই প্রজাদের নিয়ে আমাদের আন্দোলন গড়ে

তুলতে হবে, লড়তে হবে এস্টেটের বিরুদ্ধে।[৮১] অরিন্দম নাথের কথায় কলকাতার আর. এস. পি দলের সদস্যরা গোসাবাতে কর্মসূচী গ্রহণের সম্মতি দিয়েছিল। আর. এস. পি-র আশ্বাস পেয়ে অরিন্দম নাথ গোসাবায় এসে এস্টেট কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে গোপন বৈঠকের মাধ্যমে লোককে বুঝিয়ে সংগঠন তৈরীর কাজ শুরু করেছিলেন। সকলের মনের ব্যথা একই কারণ তারা কোনো না কোনো ভাবে বঞ্চিত, শোষিত। তারা সকলেই প্রতিবাদের সুযোগ খুঁজছিল, বিদ্রোহের অপেক্ষায় দিন গুনছিল। সেই বহু প্রতিক্ষিত সময় ও নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত নেতাকে পেয়ে শুরু হয়েছিল সংগঠন তৈরীর কাজ। অরিন্দম নাথের প্রস্তাব মেনে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জনসঙ্ঘের অনুকরনে সংগঠনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'সুন্দরবন জনসঙ্ঘ'। প্রথম পর্যায়ে 'সুন্দরবন জনসঙ্ঘ' একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে কাজ শুরু করেছিল তবে পরবর্তীতে এটি আর. এস. পি-র সাথে যুক্ত হয়ে যায়। সভায় উপস্থিত সকলের সিদ্ধান্ত অনুসারে সুন্দরবন জনসঙ্ঘের সম্পাদক হয়েছিলেন রাজেন মণ্ডল, অফিস সম্পাদক হয়েছিলেন অচিন্ত্য বিশ্বাস।[৮২] বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সংগঠনের শাখা খুলেছিল দ্বীপগুলির কোণে কোণে। সংগঠনের ছত্রছায়ায় মানুষগুলি তাদের ভয়-ভীতি কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি নায়েব হরিপদ দত্তের মাথায় লাঠির আঘাত লাগার সময় থেকে এস্টেটে ১৪৪ ধারা জারি ছিল। প্রকাশ্যে মিটিং, মিছিল সমাবেশ নিষিদ্ধ। তাই প্রতি দু-মাস অন্তর ১৪৪ ধারার মেয়েদ শেষের এবং নতুন করে শুরুর মধ্যবর্তী সময়টিকে নেতারা সংগঠন বৃদ্ধির ও জনসমাবেশ আহ্বানের সময় হিসাবে বেছে নিয়েছিল। এভাবে আর. এস. পি এবং স্থানীয় নেতারা একে একে গোসাবা, সাতজেলিয়া, আরামপুর প্রভৃতি স্থানে জনসমাবেশ গড়ে তুলেছিল। জমিদারি আমলা, নায়েব ও তাদের আত্মীয় বর্গ কর্তৃক শোষিত বঞ্চিত মানুষগুলি মুখরিত করেছিল সেইসব জনসভাগুলিকে, দলে দলে যোগ দিয়েছিল আর. এস. পি-র পতাকা তলে। এই সুযোগে আর. এস. পি ১৯৪০ সালে এস্টেট যে কৃষি মজুরি চুক্তি চালু করেছিল

তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। তাদের মিটিং মিছিলে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছিল বে-আইনি কৃষি মজুরি মানছি না মানবো না। অবিলম্বে কৃষি মজুরি লেখা বন্ধ করতে হবে। কৃষি মজুরি চুক্তির বিরোধিতা এবং ভাগচাষির অধিকার আদায়ের এই আন্দোলনে গোসাবাবাসীর পাশে এসেছিল তৎকালীন আর. এস. পি-র রাজ্য কমিটির সদস্য রামকৃষ্ণ পাঠক।[৮৩]

এভাবে সুন্দরবন জনসঙ্ঘ এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আর. এস. পি-র ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এস্টেট কর্তৃপক্ষের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। আর. এস. পি এস্টেটের উপর যত চাপ বৃদ্ধি করেছিল এস্টেটও ঠিক ততোটাই জমি কেড়ে নেওয়া, বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ, চাকরি থেকে অপসরণ প্রভৃতি প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তবে এস্টেট কর্তৃপক্ষ সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল ১৯৪৭ সালের বর্গাদার বিলের কারণে। বর্গাদার বিল গোসাবার স্থানীয় নেতা এবং আর. এস. পি-র সদস্যদের কৃষি মজুরি চুক্তির বিরোধিতায় এক নতুন অস্ত্রের যোগান দিয়েছিল। নেতারা মনে করেছিল এই বর্গাদার বিল জমিতে ভাগচাষির বর্গাস্বত্ব প্রদান করবে। তাই তাদের প্রথম দাবি ছিল হ্যামিল্টনাবাদের দীর্ঘদিনের কৃষি মজুরি চুক্তির অবসান ঘটিয়ে এতদিন ধরে যারা তথাকথিত কৃষি মজুরি চুক্তির নামে ভাগচাষি হয়ে এস্টেটের জমি চাষাবাদ করে আসছে তাদেরকে প্রজার মর্যাদা প্রদান করা। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে যখন গোসাবাতে সেটেলমেন্ট অপারেশন শুরু হয়েছিল তখন একদিকে যেমন এস্টেটের কর্মীরা জমির উপর ভাগচাষিদের অধিকার বন্ধ করতে সেটেলমেন্ট অফিসারকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, এস্টেটের খাসজমিতে চাষাবাদকারি চাষি, ভাগচাষি নয় সকলেই কৃষি মজুর। অন্যদিকে আর. এস. পি-র নেতারা বোঝাতে চেয়েছিল যে এস্টেটের খাসজমিতে যেসব চাষি চাষাবাদ করে তারা সকলেই ভাগচাষি। কৃষি মজুর চুক্তির আড়ালে এস্টেট এবং তাদের মধ্যে ৫০/৫০ ভাগে শস্যের বন্টন হত। ১৯৪৮ সালের ২৮শে এপ্রিল স্থানীয় নেতাদের দ্বারা

একটি স্বাক্ষর লিপি কৃষি অধিকর্তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চাষিদের দাবিকে অসঙ্গত মনে করে কৃষি অধিকর্তা তাদেরকে ভাগচাষি হিসাবে গণ্য করেনি। এই ঘটনা আর. এস. পি-র নেতাদের সংগঠনকে আরও মজবুত করতে সাহায্য করেছিল।[৮৪] প্রসঙ্গক্রমে এটা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, যখন এস্টেট কৃষি মজুরি চুক্তির সূচনা করেছিল তখন চাষিরা তা নির্দিধায় মেনে নিয়েছিল। কারণ এস্টেট চাষিদের কাছ থেকে যে খাসজমি চাষ করিয়ে নিত তার বিনিময়ে বিঘা প্রতি তিন টাকা মজুরির একটা রশিদ চাষিদের দিত কিন্তু আদতে অর্ধেক ফসল ও খড় ব্যতিত কোনো প্রকার অর্থ চাষি পেত না। এস্টেটের কর্মীরা রশিদের এস্টেট কপিতে সে সম্পর্কে লিখেও রাখত " অর্ধেক ধান ও খড় বুঝিয়া পাইলাম"[৮৫] তাই চাষিও বুঝতে পারত না সে ভাগচাষি নাকি মজুর। পরবর্তীতে বর্গাদার বিল এবং আর. এস. পি-র সহযোগিতায় তারা ভাগচাষি হওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল। এরপর থেকে কৃষি মজুরি চুক্তিকে কেন্দ্র করে জমিদার বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এস্টেট কর্তৃপক্ষের নানা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেছিল। এস্টেট কর্তৃপক্ষও বসে ছিল না। তারাও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের নাম জোগাড় করে তাদের নামে বসিরহাট আদালতে বহু মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল।[৮৬] প্রত্যেকটি মামলায় অবশ্য জমিদার পক্ষের হার হয়েছিল। এভাবে একের পর এক মামলায় জমিদার পক্ষের পরাজয় প্রতিবাদীদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং আর. এস. পি-র সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। আর. এস. পি দলের নেতৃবৃন্দ কৃষি মজুরি চুক্তির পরিস্থিতি অনুসন্ধানের জন্য এস. ডি. ও এবং ডি. এম অফিসে পিটিশন জমা দিয়েছিল। কিন্তু পক্ষপাত দোষে দুষ্ট পরিদর্শনকারী অফিসার এস্টেটের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বরং এস্টেটের পক্ষাবলম্বন করছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে উপায়হীন হয়ে আর. এস. পি নেতৃবৃন্দ গোসাবাবাসীর অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছিল। অরিন্দম নাথ

এসময় বহু নাটক রচনা করেছিলেন এবং বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশের শেষের দিকে সেসব নাটক মঞ্চস্থ করতে শুরু করেছিল। কৃষি মজুরি চুক্তির বন্ধন ভেঙ্গে ভাগচাষির প্রজাস্বত্ব আদায়ে পত্রপত্রিকা, পিটিশন, নাটক সমাবেশ প্রভৃতির মাধ্যমে এস্টেট এবং আর. এস. পি নেতৃবর্গের মধ্যে চলতে থাকা এই দ্বন্দ্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু কোনো প্রকার সিদ্ধান্তের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলনা। এরই মধ্যে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে হাড়োয়া-সন্দেশখালী বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আর. এস. পি পদপ্রার্থী সেবক চরন দাসের পরাজয় আন্দোলনকে কিছুটা হলেও স্তিমিত করে দিয়েছিল। নেতাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছিল তাদের অসফলতার কারণগুলিকে। তারা আবার নতুন উদ্যমে শুরু করেছিল সবকিছু। এবার অরিন্দম নাথের পরামর্শে আর. এস. পি-র প্রাদেশিক নেতৃবর্গ হ্যামিল্টনাবাদের ভাগচাষিদের সমস্যা সম্পর্কে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দিয়েছিল। আর. এস. পি নেতারা মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, কৃষি মজুরি চুক্তি বর্গাদার আইনের কতটা পরিপন্থী। তাদের বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী চব্বিশ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বি. আর. গুপ্তাকে গোসাবার সমস্যা সমাধানের জন্য খুব দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলেছিলেন। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে জেলা শাসক গোসাবায় গিয়েছিলেন। প্রায় ১০০০০ লোকের উপস্থিতি, সকলের মনে একটাই আশা আজ একটা ফয়সালা হবেই। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বিবাদের মীমাংসায় চাষিদের পক্ষ থেকে এসেছিল আর. এস. পি-র রাজ্য নেতা মাখন পাল, অন্যদিকে জমিদার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল না। মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিয়েছিল জেলাশাসক। মাখন পাল জেলাশাসকের হাতে চাষিদের দাবি সনদ তুলে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এস্টেট কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি মজুরি চুক্তি আসলে ভাগচাষি পদ্ধতির নামান্তর। তিনি জেলাশসকের কাছে সরাসরি তেভাগার দাবি করলেন না। তাঁর দাবি সনদের মূল চাওয়া ছিল প্রথমত, তেভাগা নয়, ভাগচাষি স্বীকার

করে চাষিকে ধান ভাগের রসিদ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, চাষিদের যদি কোনো ঋণ থাকে তাহলে তারা তার অর্ধেক এখন এবং বাকিটা পরে শোধ দিয়ে দেবে।[৮৭] জেলাশাসক সবদিক বিচার করে এস্টেট কর্তৃপক্ষকে কৃষি মজুরি চুক্তির অবসান ঘটিয়ে খাসজমির সমস্ত চাষিকে ভাগচাষির মর্যাদা প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ২৬টি খামারের শস্য ভাগের সময় সরকার, এস্টেট এবং কৃষকদের পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। শেয়ার ভাগের মূলনীতি হবে এস্টেট পাবে ৪৫% এবং কৃষক পাবে ৫৫%। এছড়াও আরও একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, কৃষকের প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ করবে এস্টেট তবে সেখানেও ওই তিন প্রতিনিধির স্বাক্ষর থাকতে হবে।[৮৮] এভাবে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫ সাল, প্রায় দশ বছরের লড়াইয়ের অবসান ঘটিয়ে গোসাবাবাসী পেয়েছিল দীর্ঘদিনের স্বপ্ন লালিত ভাগচাষির মর্যাদা, পূর্ণ হয়েছিল প্রজা স্বত্বের দাবি। ১৯৫৫ সালেই প্রথম গোসাবার চাষিরা জমিতে বর্গা রেকর্ড করাতে পেরেছিল। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কৃষি মজুরি চুক্তির ছন্দ-আবরণ কাটিয়ে গোসাবার ভাগচাষিকে মর্যাদার আসনে বসাতে পেরে আর. এস. পি-ও পেয়েছিল প্রচুর জনপ্রিয়তা। তাইতো ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে হাড়োয়া-সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আর. এস. পি পদপ্রার্থী হারান চন্দ্র মন্ডল বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। এরপর একে একে ধর্মগোলা, সমবায় রাইস মিল, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক প্রভৃতি এস্টেট পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি জমিদারি নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছিল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছিল নতুন নতুন প্রতিনিধি। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্বে এসেছিলেন এল খাতের আলি, রাইস মিলের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন সেবক চরন দাস এবং ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজেন মন্ডল।

১৯৪০-৪৩ সালে যখন সারা বাংলায় কৃষক অসন্তোষের মাত্রা বেড়েই চলেছে, কালো বাজারি আর শোষণে জর্জরিত সাধারণ প্রজাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার উপক্রম ঠিক

তখনই জীবন সংগ্রামে হেরে যেতে যেতে শেষ বারের মত বেঁচে থাকার তাগিদে অত্যাচার ক্লিষ্ট মানুষগুলি মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার, জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। তেভাগার সংগ্রাম নামে পরিচিত এই আন্দোলন সমগ্র বাংলা তথা সুন্দরবনকে যেমন আন্দোলিত করেছিল তেমনি এর আঁচ থেকে রেহায় পাইনি আমার আলোচিত বর্তমানের ক্যানিং মহকুমা। ক্যানিং তখনও আলাদা মহকুমা হয়নি। ক্যানিং মহকুমার অঞ্চলগুলি আলিপুর মহকুমার মধ্যে ছিল। ক্যানিং ছিল আলিপুর মহকুমার অধীন একটি থানা। বাসন্তী এবং গোসাবা তখন আলাদা থানা হয়নি। গোসাবা তখন বসিরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে এইসব অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ক্যানিং মহকুমা। আর এর অন্তর্গত ক্যানিং থানার মঠেরদীঘি, দেউলি, কালিকাতলা, বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা, আমঝাড়া এবং গোসাবা থানার পাঠানখালি অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে তেভাগা আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছিল।[৮৯] গোসাবার ক্ষেত্রে মূল তেভাগার অর্থ ছিল একটু অন্যরকম, যেটি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু ক্যানিং মহকুমার বাকি অংশের মধ্যে সর্ব প্রথম তেভাগার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল ক্যানিং, সন্দেশখালি এবং হাড়োয়া থানার মধ্যবর্তী মঠেরদীঘি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। মঠেরদীঘির জমিদার ছিলেন তারাপদ ঘোষ। অত্যাচারী জমিদারের জমিদারিতে প্রজাপীড়ন মূলক বহু প্রথার চল ছিল। বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে জমিদারকে নজরানা দিতে হত। গলায় কাপড় দিয়ে জমিদারের সামনে মাথা নিচু করে তাকে নজরানা দেওয়ার এই রীতি পুণ্যাহ বা পুণ্যে নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া চৈত্র মাসের মধ্যে জমিদারি খাজনা পরিশোধ করতে না পারলে জুতার বাড়ি থেকে শুরু করে নানা প্রকার অমানবিক অত্যাচারের বলি হতে হত প্রজাকে।[৯০] এইরকম পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ত্রাণ বিতরণের জন্য সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভবানী সেন, মনিকুন্তলা সেন, রাসবিহারী ঘোষ, বঙ্কিম মুখার্জি, নলীনিপ্রভা ঘোষ ও নিত্যানন্দ চৌধুরীর মত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় নেতৃবর্গের আগমন ঘটেছিল মঠেরদীঘি অঞ্চলে। তারা ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, সন্দেশখালির মত

সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা মঠেরদীঘির স্থানীয় নেতা বরুণ পাত্রের সহযোগিতায় ব্রজলাল প্রামাণিকের বাড়িতে একটি মিটিং-এর আয়োজন করেছিল। সুন্দরবনের কৃষক সমিতির সূচনা হয়েছিল এই মিটিং-এর মধ্য থেকেই।[৯১] বরুণ পাত্র ছাড়া মঠেরদীঘির অন্যান্য স্থানীয় নেতারা ছিলেন নকুলেশ্বর প্রামাণিক, শৈলেন্দ্রনাথ পাত্র, নরেন্দ্রনাথ সিনহা, ললিত কুমার সিনহা, পুন্ডরীক প্রামাণিক। এঁরা সকলেই মঠেরদীঘির গগন রায়ের বাড়িতে কৃষক সমিতির অফিস খুলে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ত্রাণ সামগ্রী, খাদ্যবস্ত্র ও ঔষধ বিতরণের পাশাপাশি জমিদার বিরোধী সংগঠনকে মজবুত করার কাজ শুরু করেছিল। এই কৃষক সমিতির সদস্যরা ছিলেন নকুলেশ্বর প্রামাণিক, দ্বারিক নাথ প্রামাণিক, ব্রজনাথ প্রামাণিক, পুণ্ডরীকাক্ষ প্রামাণিক, ভরতচন্দ্র দাস, কেদারচন্দ্র দাস, বিনন্দ কান্ডার প্রমুখ। পুরাতন কৃষক সমিতি ভেঙ্গে গিয়ে তৈরী হয়েছিল নতুন কৃষক সমিতি, যেখানে বাহিরের গ্রাম থেকেও বহু সদস্যকে যুক্ত করা হয়েছিল। এই কমিটির সদস্যরা ছিলেন বরুণ পাত্র (সম্পাদক), রাম কমল মণ্ডল (সহকারি সম্পাদক), আলতাফ মোল্লা ছিলেন সভাপতি, পরবর্তীতে ড. শশিকান্ত মণ্ডল এবং পরমেশ্বর মণ্ডল এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।[৯২] প্রাথমিক পর্যায়ে এইসব নেতারাই মঠেরদীঘির জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক কাজ শুরু করেছিল। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্যানিং থেকে ১২ কি. মি দূরত্বে মঠেরদিঘীর ধান ক্ষেতে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন পোস্টার দিয়ে সাজানো প্যান্ডেল এবং প্রায় ২০০০ হিন্দু-মুসলিমের সমন্বয়ে আয়োজিত এই সম্মেলনে কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে থেকে বহু নেতার আগমন ঘটেছিল। এখানে আগত নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নিত্যানন্দ চৌধুরী, হেমন্ত ঘোষাল, আবদুর রেজ্জাক খান, নলিনী প্রভা ঘোষ, কমলা চ্যাটার্জি এবং দিনাজপুর থেকে এসেছিলেন বিভূতি গুহ।[৯৩] এরপর ফলতা থানার মহিরামপুর, কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনিস্টিটিশন হল, বুধাখালি, কাকদ্বীপ প্রভৃতি জায়গায় একের পর এক কৃষক সমিতির

সম্মেলন আয়োজিত হতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারিত কৃষক প্রজাদেরকে একত্রিত করে ‘কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার’ (সি. পি. আই.) পরিচালনায় পরিচালিত কৃষক সভার সাংগঠনিক শক্তিকে মজবুত করা। পাশাপাশি লটদার, জোতদারদের পেশী শক্তির ভয় দূর করা। জমিদারের অর্থনৈতিক শক্তির প্রতি অসহায় কৃষকদের নির্ভরশীল থাকার প্রবণতা দূর করতে কৃষক সমিতিগুলি আবার নিজেদের মধ্যে ৫ থেকে ৬ জন সদস্য মিলে আরও একটি উপকমিটি বা ইউনিয়ন গঠন করে কৃষকদের বোঝানোর দায়িত্ব নিয়েছিল। এছাড়াও কৃষক সমিতির মধ্য থেকে গঠিত তেভাগা কমিটি গ্রাম্যস্তরের কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।[৯৪] কৃষক সভার সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির এই-সময়পর্বে ১৯৪৫ সালের ৫ই অক্টোবর দুর্ভিক্ষের ত্রাণ হিসাবে খাদ্য এবং বস্ত্র বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে ‘কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার’ (সি. পি. আই.) চব্বিশ পরগনা জেলা শাখার নেতৃত্বে ক্যানিং খেলার মাঠ থেকে একটি বিশাল পদযাত্রার অয়োজন করেছিল। প্রায় ১০০০ স্থানীয় কৃষক ও শ্রমিকদের সম্মিলিত পদযাত্রায় সভাপতিত্ব করেছিলেন খ্যাতনামা কৃষক নেতা মৌলনা আবদুর রেজ্জাক খাঁ। তিনি এখানে আগত প্রত্যেকটি কৃষককে একটাই শপথ নিতে আহব্বান জানিয়েছিলেন যে, যতদিন না পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য পূরণ হবে আমারা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। মিটিং শুরু হয়েছিল নিত্যানন্দ চৌধুরীর ‘উড়িয়ে উর্দ্ধে লাল নিশান’ গানের মাধ্যমে।[৯৫] উক্ত মিটিংয়ের প্রথম বক্তা ছিলেন চব্বিশ পরগনার কৃষক সমিতির সম্পাদক মনোরঞ্জন রায়। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছিল বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের দুর্দশার কথা, যা বিগত দুর্ভিক্ষকালীন ভোগান্তিকে হার মানিয়েছিল। তাঁর মতে এখানে আগত মানুষগুলি সমবেত হয়েছিল দুর্ভোগ যন্ত্রনার থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে এবং তারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য সমবেত হয়েছিল। ক্যানিং-এর তাম্বুলদহ গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী বন্যার সময় না খেয়ে দিন কাটিয়েছে। ঈদের রোজায় তৃষ্ণা মেটানোর জন্য চিনির জল করে খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত চিনি

তারা পায়নি। এমনকি তাদের সন্তানদের জন্য নতুন পোশাকও কিনতে পারেনি। কৃষকরা ঈদ ও পূজা উপলক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্তত একটি ধুতি বা শাড়ি দাবি করেছিল। খাদ্য কমিটির শেষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, গ্রামের প্রতিটি নাগরিক যাতে বস্ত্র পায় তার জন্য ১৮ বেল কাপড় বিতরণ করা হবে। কিন্তু ক্যানিং অঞ্চলের মানুষ কোনো বস্ত্র পায়নি।

শেষ বারের দুর্ভিক্ষ এবং বন্যায় ক্যানিং-এর প্রায় ৮০ শতাংশ কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়ে। এখন তারা সম্পূর্ণভাবে ত্রাণ ও দাতব্য পরিষেবায় দিনযাপন করছে। প্রতি বছর নদীর বাঁধ ভেঙ্গে নদী-সংলগ্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এটা বন্ধের জন্য সরকারকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গত দুর্ভিক্ষে কানিং-এর বহু মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল এবং বহু মহিলা পতিতা হতে বাধ্য হয়েছিল। তাঁতি ও জোলারা সুতোর অভাবে অনাহারে ছিল।

এরপর মনোরঞ্জন রায় এখানকার কৃষক সমিতির কার্যকলাপ এবং এর কাজের ধরন নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে কৃষক সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর মতে কৃষক সমিতি হল কৃষকের অভিযোগগুলিকে সরকারের কাছে তুলে ধরা এবং কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষিত করার একমাত্র হাতিয়ার।[৯৬] পরবর্তী বক্তা ছিলেন নিত্যানন্দ চৌধুরী। তিনি বলেন সরকার যদি জনগনের স্বার্থসিদ্ধি করতে না পারে, তাদের দায়-দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে প্রশাসনিক ক্ষমতা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি এবং কৃষক সমিতির থেকে জনপ্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত। যেসব জেলায় খাদ্য কমিটি সঠিকভাবে কাজ করছেনা তাদের স্থলে জনগনের নির্বাচিত বা পছন্দের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির হাতে সব দায়িত্ব তুলে দেওয়া উচিত।[৯৭] এরপরের বক্তা আবদুল হালিম নিত্যানন্দ চৌধুরীর উত্থাপিত দাবিকে সমর্থন জানান। তিনি বলেন গত দুর্ভিক্ষে চব্বিশ পরগনার প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এছাড়াও তিনি অনন্ত সিং এবং গনেশ ঘোষের মত রাজনৈতিক বন্ধীদের মুক্তির দাবি তুলে ধরেন। তিনি মনে করতেন কালোবাজারি, ঘুষ

ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য তারাই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।[৯৮] সভাপতির ভাষণে মৌলানা আব্দুর রেজ্জাক খাঁ বলেন যে, সেই দিন আর বিশেষ দূরে নেই যেদিন কৃষকরা তাদের নিজস্ব কয়েকজন প্রতিনিধিকে বিধান সভায় পাঠাতে সক্ষম হবে। কৃষকদের প্রধান কর্তব্য হবে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা।[৯৯] এইভাবে মূলত বন্যা ও দুর্ভিক্ষ সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কৃষক সভার বিকাশ এবং তাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের সূচনাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।[১০০] এই-সময় গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠা কৃষক সমিতির সদস্যরা কিছু স্লোগান লিখে সাধারণ কৃষক প্রজাদেরকে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকে। স্লোগানগুলি যেমন,

ক) লাঙ্গল যার জমি তাঁর।

খ) নিজ খামারে ধান তোল।

গ) ভাগচাষির রসিদ চাই।

ঘ) বে-আইনি আবওয়াব বন্ধ কর।

ঙ) লটদারি, জমিনদারি উচ্ছেদ কর।

চ) জান দিব তবু ধান দিব না।

ছ) পাঁচ সেরের বেশি সুদ নেহি।

জ) জমিন থেকে উচ্ছেদ নেহি।

ঝ) তেভাগার দাবি কায়েম কর।

ঞ) চাষির হাতে জমি চাই।

ট) বাস্তু ভিটের অধিকার চাই।

ঠ) জমিদারি জুলুম চলবেনা।

ড) কৃষক সমিতি কি জয়।

ঢ) কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ।

ণ) লাল ঝান্ডা কি জয়।[১০১]

কৃষক সমিতির মধ্য থেকে গঠিত তেভাগা কমিটি এবং উপ-কমিটির সদ্যসরা এইসব স্লোগানগুলির মাধ্যমে জমিদারি জুলুমের বিরুদ্ধে গ্রাম্য কৃষককে গ্রাম্য বৈঠক, মন্ডপ এবং হাট মিটিং-এ সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এভাবে সংগঠন তৈরীর কাজ আপন গতিতে চলতে থাকে। ধীরে ধীরে উপস্থিত হয়েছিল সেই ক্ষণ, ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার আহ্বানে সমগ্র বাংলা জুড়ে শুরু হয়েছিল তেভাগা আন্দোলন। ফসল কাটার সেই মুহূর্তে সমগ্র সুন্দরবনের মধ্যে কাকদ্বীপ, মথুরাপুর, সাগর অঞ্চলের ভাগচাষিরা ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ফসল কেটে নিজেদের খামারে নিয়ে এবং এক-তৃতীয়াংশ জমিদারের জমিতে রেখে দিয়ে প্রথম তেভাগা দাবির সূচনা করেছিল।[১০২] আন্দোলন শুরুর দুই মাস আগে ১৯৪৬ সালের ২৪শে জুন ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, সুন্দরবনের ভাগচাষিদের সমস্যা দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে। তিনি আরও বলেন কাকদ্বীপ থানাতে ভবিষ্যৎ বিপদের বীজ লুকিয়ে আছে। পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে। গ্রাম ও স্থানীয় খাদ্য কমিটি এবং ইউনিয়নগুলির প্রতি অসন্তোষ ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এসবের প্রতিকারে অবিলম্বে এখানকার ভাগচাষিদের আইনগত অবস্থার উন্নতি করা দরকার।[১০৩] ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসেই সমস্ত রিপোর্ট বোর্ড অব রেভেনিউ দপ্তরে পৌঁছে যায়। দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব এস দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, কাকদ্বীপের ভাগচাষিদের অবস্থা অন্যান্য জেলার মতই খুবই কঠিন সমস্যা। তবে কিছু দিন পর যখন শীতকাল আসবে তখন ঠাণ্ডা মাথায় অবস্থাটির বিবেচনা করা যাবে। এখন কোনো প্রকার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দরকার নেই।[১০৪] এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দু-মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সমগ্র বাংলা জুড়ে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়ে

গিয়েছিল। প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী সুনীল চট্টোপাধ্যায় আন্দামান জেল থেকে ফিরে স্বাধীনতা পত্রিকার এক প্রতিবেদনে লিখেছিলেন "গত ৮ই নভেম্বর কাকদ্বীপে পৌঁছে বুধাখালি গ্রামে যাই। সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতির ঝান্ডা উড়ছে খবর পেয়েছি। সুন্দরবনের সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক সেই লাল ঝান্ডার নীচে দাঁড়িয়ে সরকার, জমিদার ও মহাজনের চক্রান্ত ব্যর্থ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। দাবি তুলেছে- জমিদারের খামারে ধান তুলবেনা, দশ আনা চাষির, ছ-আনা জমিদারের, ভাগচাষির স্বত্ব স্বীকার করতে হবে। যেখানে আগেই জমিদারের গোলায় ধান উঠেছে সেখানকার কৃষকরা নিজেদের ভাগের ধানও নেয়নি। জমিদারের ধানও বাইরে যেতে দেয়নি। জমিদাররা বাহিরে থেকে লাঠিয়াল এনেছিলেন, কৃষকদের কথা শুনে তারা ফিরে গিয়েছে- বলেছে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়বেনা। ... ঘুমন্ত সুন্দরবন জেগে উঠেছে।[১০৫] কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের অনুপ্রেরনায় সুন্দরবন অঞ্চলের অন্যান্য এলাকার কৃষকরাও জমিদার জোতদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তেভাগার ডাক দিয়েছিল। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল আলিপুর মহকুমার ক্যানিং থানার মঠেরদীঘি, কালিকাতলা, দেউলি, বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা, আমঝাড়া, গোসাবা তখন বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি থানার মধ্যে। সেখানে চলছে অন্য লড়াই। ক্যানিং থানা হয়ে উঠেছে কৃষক আন্দোলনের নতুন ক্ষেত্র। আন্দোলন পরিচালনার জন্য গ্রাম কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এখানকার কিছু ভাগচাষি তাদের ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ নিতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু বেশিরভাগ জমির মালিক এই ধরনের ঘটনা ঘটার পূর্বেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।[১০৬] তখন ছোটো-বড়ো সব গ্রামে চাষিদের মধ্যে চাঞ্চল্য। মাঠে মাঠে তেভাগা আদায়ের ডাক। যেসব জমির মালিক তেভাগার দাবি মানতে নারাজ ছিল তাদের জমির ফসল কাটার সময় শ'য়ে শ'য়ে ভাগচাষি জড় হয়েছিল। কৃষকরা তাদের চিরাচরিত অস্ত্র দা, লাঠি, কুড়ুল, শাবল প্রভৃতি এবং কৃষক নারী ঝাঁটা, বটি, লঙ্কার গুঁড়ো নিয়ে প্রস্তুত ছিল সবরকম প্রতিরোধের দেওয়াল ভাঙতে। এভাবে চাষিরা তাদের মিলিত শক্তির

সাহায্যে পঞ্চায়েত খামারে (খুব কম জায়গায় নিজেদের খামারে) ধান তুলে ঝাড়াই মাড়াই করে ভাগচাষির দাবি আদায় করে নিয়েছিল। এই-পর্বে ছোটো-ছোটো জমির মালিকরা তেভাগা মেনে নিলেও হাজার দু হাজার বা তারও বেশি জমির মালিক যেমন, শ্রীনাথ দাস, মফিজুদ্দিন জমাদার, ধুতুরদহের বিধু সরকার প্রভৃতি জোতদাররা মাঠের পাকা ধানে বর্গাদারদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পুলিশের দারস্থ হয়েছিলেন। পুলিশ ১৪৪ ধারা ঘোষণা করে তেভাগা কর্মীদের আসামী করে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছিল। জমিদার, জোতদারদের খামার বাড়ি, কাছারি বাড়িতে পুলিশের ক্যাম্প বসানো হয়েছিল।[১০৭] ক্যানিং থানার অন্তর্গত মঠেরদীঘিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন হেমন্ত ঘোষাল। ক্যানিং এবং পার্শ্ববর্তী হাসনাবাদ, সন্দেশখালি, হাড়োয়া প্রভৃতি এলাকায় আন্দোলন পরিচালনায় তিনিই ছিলেন সেনাপতি, বাহিনীতে সেনাধ্যক্ষ ছিলেন হরিধন চক্রবর্তী (সোনারপুর), বরুন পাত্র (মঠেরদীঘি), ফৌজদেল মোল্লা, আলতাফ মোল্লা, রামকমল মন্ডল, প্রবীর মন্ডল (রাজবাড়ী), গুণধর জাগুলিয়া, শরৎ সর্দার, শিরীষ মন্ডল (উচিলদা), যতীন পাত্র, রাম ভূঁইয়া (পাঠানখালি), ললিত সিং, মধু মাহাতো। এই অঞ্চলে আন্দোলন পরিচালনায় সেনাপতি হেমন্ত ঘোষাল কিছু ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কথায় "আমারা যারা জেলায় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করছিলাম, তারা সিদ্ধান্ত করলাম--সেকেন্ড ফ্রন্ট খুলতে হবে। পুলিশ-মিলিটারিকে কয়েকটা বিন্দুতে সীমাবদ্ধ হতে দেওয়া যাবে না, ছোটো ছোটো লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ব্যস্ত, বিব্রত, পর্যুদস্ত করে তুলতে হবে। পুলিশ ইতিমধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শাণিত করেছে। ধরপাকড় চলছে সর্বত্র। তাই আত্মগোপনে থেকে মঠের দিঘীকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করলাম। ঘাঁটি গড়ে উঠল মঠের দীঘি, দীঘির পাড়, লাউখালি, পাথারঘাটা, রাজবাড়ী, বয়েরমারি, বেড়মজুর, জেলেখালি, কানমারি, বিশপুর-বয়লানি, হাটগাছি, সরবেড়িয়া, শাকদা, উচিলদা, বামুনিয়াতে। ... ইতিমধ্যেই মাঠ থেকে ধান উঠে গেছে জমিদার-জোতদারের

খামারে, ... তাই লড়াইয়ের কায়দা পাল্টাতে হলো। প্রথমেই সমস্ত খামারে ধান ঝাড়া বন্ধ করে দেওয়ার শ্লোগান দেওয়া হলো। ফলে খামার থেকে ফসল তুলে গোলাজাত করার ক্ষমতা আর জোতদারের রইল না। এবার গ্রামে গ্রামে প্রচারাভিযান সংঘটিত হলো, বলা হলো, তেভাগার লড়াইতে নামতে গেলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে- পরিবারপিছু একজন যুবক, একটি টাকা ও একটি লাঠি দিতে হবে। অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গেল-২০ দিনের মধ্যে ১২০০ জওয়ান ছেলে, ১২০০ টাকা ও ১২০০ লাঠি সংগৃহীত হলো। আর আমাদের সামনে অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে এল গ্রামের মেয়েরা। পরিবারের শক্ত, সমর্থ পুরুষটিকে লড়াইয়ের ময়দানে পাঠিয়েই তারা ক্ষান্ত হলো না, ঘাঁটি আগলানোর জন্য ২০ দিনের মধ্যেই ১৫০০ জনের সংগঠিত নারী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলল। পুলিশ-মিলিটারির আক্রমণের মুখে গ্রামে গ্রামে সংগঠিত প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলল"।[১০৮] ১৯৪৭ সালে শুরু হল তেভাগার নতুন অধ্যায়। এই-পর্বে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হল নতুন মাত্রা, নতুন স্লোগান 'জমিদারের খোলান ভাঙো' এবং 'জান দেব তবু ধান দেবনা'। অনেক গ্রামে বর্গাদাররা জোতদারের খামারে ধান রেখেছিল কিন্তু যখন 'খোলান ভাঙো' আন্দোলনের সূচনা হল বর্গাদাররা জমিদারের খামার থেকে জমাকৃত ধান নিজের খামারে সরিয়ে আনাই উপযুক্ত মনে করেছিল। 'খোলান ভাঙো' আন্দোলন বাংলার প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে চরমতম রূপ নিয়েছিল দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং চব্বিশ পরগনায়।[১০৯] ক্যানিং ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে 'খোলান ভাঙো' আন্দোলনের ক্ষেত্রে হেমন্ত ঘোষাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল "তেভাগা আদায়ের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ বাড়ি ফিরব না। যা জুটবে সবাই মিলে ভাগ করে খাব। এ লড়াই আমাদের ন্যায় ও সত্যের লড়াই, খামারে গাদা ভেঙে দুভাগ নিয়ে একভাগ জমির মালিকের জন্য রেখে আসব। এ ব্যাপারে কোনোও জাল-জুয়াচুরি বা লুটপাট চলবে না। গ্রামে গ্রামে আমাদের সংগঠিত বাহিনী এই গাদা ভাঙার কাজ করবে। আর এ ব্যাপারে কোনোও অন্যায় হচ্ছে কিনা এ দেখার জন্য আটজনের

তদন্তকারী দল থাকছে।... মাত্র দশ দিনের মধ্যে বিরাট এলাকা জুড়ে একাজ শেষ হয়ে গেল, বিরাট এলাকা জুড়ে প্রায় চল্লিশহাজার কৃষক এই লড়াইতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করল"।[১১০] ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ক্যানিং থানার ফকিরতাকিয়া মোড়ে একটি জনসভার আয়োজন করা হবে। সিদ্ধান্তনুসারে জনসভাও হয়েছিল এবং ঐ সভায় আনুমানিক প্রায় ১০০০ লোক হাজির হয়েছিল। এই সভা থেকে আবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল দাবিদাওয়া একই রেখে পাথরঘাটায় (বর্তমানে রাজারহাট থানার অধীন) ১০০০০ লোকের একটি বৃহৎ জনসভার আয়োজন করা হবে। এই জনসভার প্রধান বক্তা ছিলেন হেমন্ত ঘোষাল, প্রভাস রায়, হরিধন চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উক্ত জনসভার মধ্য থেকে সাতজন সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছিল, নাম দেওয়া হয়েছিল সংগ্রামী কমিটি। কমিটির কাজ ছিল এই অঞ্চলের কৃষকদের স্বার্থ চরিতার্থ করা এবং তেভাগা ও খাদ্য আন্দোলনকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। উক্ত সংগ্রামী কমিটির সদস্যরা ছিলেন আলতাফ মোল্লা (সভাপতি), সম্পাদক বরুণদেব পাত্র, হেমন্ত ঘোষাল, হরিধন চক্রবর্তী, খোসদেল মোল্লা, শশি ডাক্তার এবং রামকমল মন্ডল। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে আড়াইশো কৃষক সমিতির সদস্য, আড়াইশো স্বেচ্ছাসেবী, আড়াইশো লাঠি এবং আড়াইশো টাকা হবে এই লড়াইয়ের মূলধন। যেসব গ্রাম সভা উক্ত মূলধনগুলো জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিল, তাদের গ্রামসভাতেই প্রথম তেভাগার আয়োজন করা হয়েছিল। এভাবে একে একে খামারগুলি চিহ্নিত করে মহাজনের খামারে এক-তৃতীয়াংশ রেখে বাকি দুই-তৃতীয়াংশ যে যার বাড়িতে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল।[১১১] স্লোগানের পর স্লোগান, হাসি-খুশি মুখ আর করতালির সাহায্যে এক হাতে লাল পতাকা অন্য হাতে লাঠি নিয়ে দলে দলে বঞ্চিত কৃষকের দল একের পর এক খামার দখল করতে শুরু করেছিল। একটি খামারের দখল শেষ করে অন্য খামার দখলের জন্য দলে দলে হাজির হয়েছিল দখল শেষ করে ওঠা দলের সদস্যরা। আন্দোলনের ভয়াবহ রূপ তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারকে

শঙ্কিত করে তুলেছিল। আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান চাপে লীগ সরকারের ভূমিরাজস্ব ও কারা মন্ত্রী ফজলুর রহমান ১৯৪৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে এক জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন যে, বর্গাদার উচ্ছেদ প্রতিরোধ এবং বর্গাদার যাতে উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পেতে পারে সে জন্য বাংলা সরকার প্রাদেশিক পরিষদের পরবর্তী বাজেট অধিবেশনে একটি বিল আনতে চলেছে।[১১২] এর কয়েক দিন পর ১৯৪৭ সালের ২২শে জানুয়ারি মুসলিম লীগ সরকার কলকাতা গেজেটে তেভাগার দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে "দ্যা বেঙ্গল বর্গাদারস টেম্পোরারি রেগুলেশন বিল, ১৯৪৭" নামে একটি বিল প্রকাশ করেছিল। সাধারণ ভাবে যেটি 'বর্গাদার বিল' বিল নামে পরিচিত।[১১৩] বর্গাদার বিল তেভাগা আন্দোলনের গতিকে তীব্র থেকে তীব্রতর করেছিল। যারা জমিদারের 'খোলান ভেঙে' নিজেদের খামারে ধান এনেছিল তারা নিজেদের শঙ্কামুক্ত মনে করতে থাকে। যারা আগে থেকেই ধান ঝাড়াই মাড়াই করে প্রথাগত ভাবে জমিদার জোতদারকে আধাভাগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল বাড়তি ধান না পাওয়ার গ্লানি। আর যাদের ধান ঝাড়াই মাড়াইয়ের অপেক্ষায় জমিদার-জোতদারের খামারে গাদাজাত আছে তাদের মধ্যে চঞ্চলতা বেড়েই চলেছে।[১১৪] ভাগচাষির এই চঞ্চলতা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল ১৯৪৭ সালের ৩০শে জানুয়ারি নোয়াখালি জেলার নবগ্রামের সভায় গান্ধীজী কর্তৃক তেভাগা দাবির সমর্থন। ভাগচাষির তেভাগা দাবিকে সমর্থন করে গান্ধীজী বলেছিলেন, "No one could claim ownership of land which belonged to God alone. He further believed that no one who did not till the land had any claim on the produce. Only those who toiled should have share in the output"[১১৫] এইসব ঘটনা কৃষক মননে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তারা ভেবেছিল সরকার তাদের দাবি মেনে নিয়েছে। তাই যেসব অঞ্চলে এতদিন কৃষক সভার প্রবেশ ঘটেনি সেখানেও বর্গাদাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলতে এবং জোতদারদের গোলা থেকে ধান বের করে

আনতে শুরু করেছিল। আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার জমিদার-জোতদারদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। তারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে বর্গাদার ও তেভাগা আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে ধান লুট, বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ এনে সরকারকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছিল। বর্গাদার কর্তৃক জোতদার-জমিদারদের উপর অত্যাচারের খবর বের হতে শুরু করেছিল বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে। ৯ই ফেব্রুয়ারি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, " The Te-Bhaga movement is fast driving the country into a state of absolute chaos. Inhuman torture is going on upon the jote-dars by the Barga-dars. Forcible seizure of paddy from the jote-dars 'Golas' has become a common thing and protest in every case in bringing in fresh troubles. The whole picture has become one of complete disappearance of law and order. Reports are there that jote-dars are being kidnapped and forced into acceptance of the Te-Bhaga arrangement.[১১৬] ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন উপলব্ধি করেছিল যদি বর্গাদার বিল আইনে পরিণত হয় তাহলে গ্রামসমাজ থেকে মধ্যবিত্ত জোতদার শ্রেণি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বাংলার ভদ্রলোক শ্রেণির জীবনযাত্রার মান সাধারণ জমির মালিকের থেকেও নিচে নেমে যাবে।[১১৭] আন্দোলন সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্থ মুসলিম লীগ সরকার কংগ্রেস এবং সমাজের উচ্চ শ্রেণির প্রতিক্রিয়ায় বর্গাদার বিলের খসড়া আইনসভায় এনেও আইনে পরিণত করেনি। বঙ্গীয় আইনসভায় বর্গাদার বিলের উপর কংগ্রেসের এম. এল. এ.-রা ৫৮টি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছিল। ফলে লীগ সরকার বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে বিলটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছিল। পরিবর্ত হিসাবে সরকার আন্দোলনকে স্তিমিত করতে প্রচণ্ড দমন পীড়ন নীতির আশ্রয় নিয়েছিল। আইনভঙ্গকারী ও সরকারি সিদ্ধান্ত বানচালকারীদের উপর

শুরু হয়েছিল বর্বর পুলিশি আক্রমণ। উপস্থিত হয়েছিল সেই সময়, একদিকে রাষ্ট্র যন্ত্রের সর্বাপেক্ষা নির্মম অস্ত্রের প্রয়োগ অন্যদিকে আন্দোলন দমনের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে অবদমিত করে শোষণ যন্ত্রনায় জর্জরিত মানুষগুলির অধিকার আদায়ের লড়াই। সর্বত্র জমিদার-জোতদারের কাছারিতে পুলিশ মোতায়েন, আন্দোলনকারীদের সমাবেশে পুলিশের গুলিবর্ষণ, কৃষক রমণীকে ধর্ষণ প্রভৃতি অমানবিক অত্যাচারের সাক্ষী হয়েছিল বাংলার প্রতিটি জেলা। চারিদেকের এই বর্বর অত্যাচার ও লুটপাটের মধ্যে মন্ত্রী হংসধ্বজ ধাড়া তেভাগার লড়াইকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে ঘোষণা করেছিলেন। অসংখ্য মামলা দায়ের করে নেতাদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল গ্রেফতারি পরোয়ানা। নেতাদের মাথার দাম উঠেছিল ১০০০ টাকা পর্যন্ত।[১১৮] মঠেরদীঘিকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে তেভাগার সংগ্রাম ছড়িয়ে দেওয়ার সেনাপতি হেমন্ত ঘোষালের মাথার দাম ঠিক হয়েছিল ২০০০ টাকা।[১১৯] ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে বিশেষ করে ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করেছিল। এই-সময় পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তায় জোতদাররা কৃষকের গোলা থেকে ধান পুনরায় নিজের গোলায় নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। সারা প্রদেশে চার হাজারের বেশি আন্দোলনকারী নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলনের সাথে জড়িত নেতাদের নামে শত শত মামলা দায়ের করা হয়েছিল। খাঁপুরে, মেটালি, সন্দেশখালি প্রভৃতি অঞ্চলে পুলিশকে গুলি চালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পুলিশকে বলা হয়েছিল যেকোনো উপায়ে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত এই আন্দোলন দমন করতে হবে।[১২০] এই-সময় পুলিশি বর্বরতার চরমতম সাক্ষী ছিল বেড়মজুর। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা মার্চ সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশের নির্দেশে বসিরহাটের সার্কেল ইন্সপেক্টর ৭ই মার্চ সশস্ত্র সেনাবাহিনী সহ বেড়মজুরে পৌঁছায়। ইন্সপেক্টরের নির্দেশ মত সেনাবাহিনী ধান লুঠপাটের মামলায় প্রায় ১৭ জন আসামীকে গ্রেফতার করে বেড়মজুর জমিদারের কাছারিতে রেখেছিল। মূহুর্তের মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল পার্শ্ববর্তী হাটগাছি,

কানমারী, নলকোড়া, রাজবাড়ী, পাথরঘাটা, মঠেরদীঘি, দীঘিরপাড়া, সরবেড়িয়া, বামনিয়া, রামপুর, কালিকাতলা প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে। ৮ই মার্চ উক্ত অঞ্চলগুলি থেকে আগত শত শত মানুষের মিছিল ঘিরে ফেলেছিল বেড়মজুর কাছারি বাড়িটিকে। প্রত্যেকের একটাই দাবি গ্রেফতার কৃতদের মুক্তি। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা আসন্ন প্রায় এমন সময় উন্মত্ত জনতার ক্রোধ প্রতিহত করতে সশস্ত্র পুলিশ আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে বেপরোয়া গুলি চালায়। গুলিতে নিহতের সংখ্যা নিয়ে নানা মহলে নানা মত থাকলেও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হেমন্ত ঘোষালের স্মৃতি থেকে বলা যায় রবিরাম সর্দার, পাগলু সর্দার, রাজবাড়ির চামু বিশাল, বৈরা সর্দার, ছোটো আজগড়ার রতিরাম সর্দার সহ প্রায় ২০ জন কৃষক নিহত হয়েছিল। সেনাপতি হেমন্ত ঘোষাল নিজেও গুলিতে আহত হয়েছিলেন।[১২১] পুলিশ ফাইলের উপর ভিত্তি করে আদ্রিয়েনে কুপার (Adrienne Cooper) মৃতের সংখ্যা নিদির্ষ্ট করেছেন ৭ জন।[১২২] তবে সরকারি হিসাবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে বলা যেতে পারে বেড়মজুরের এই ঘটনায় আহতের চিৎকার আর স্বজন হারানো মানুষের দীর্ঘশ্বাসে বেড়মজুরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। বেড়মজুরে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে ১৯৪৭ সালের ১০ই মার্চ অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল, "কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান দপ্তর থেকে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে সন্দেশখালি থানার বেড়মজুর গ্রামে পুলিশের গুলি চালনার ফলে মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে সাত। নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে তিনজন। পাঁচ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, আঠারো জন আহত। সি. পি. আই-এর পূর্বেকার বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, ৭ই মার্চ এগারো জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মুক্তির দাবিতে বিশাল সংখ্যক মানুষ কাছারি ঘেরাও করে এবং রাত দেড়টা নাগাদ পুলিশ গুলি চালানো শুরু করে"।[১২৩] এই ঘটনার পর সন্ত্রস্ত প্রশাসন আরও বেশি সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করেছিল। এছাড়াও শান্তি বজায় রাখতে বহু কংগ্রেসি স্বেচ্ছাসেবকদের আগমন ঘটেছিল এইসব এলাকায়। শুরু হয়েছিল গণ গ্রেফতারি।[১২৪] চব্বিশ পরগনা জেলা কৃষক

সমিতির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল যে, হাটগাছিয়া, বেড়মজুর, পাঠানখালি, পাথরঘাটা, দেউলি, কুড়াভাঙ্গা, সরবেড়িয়া এবং মঠেরদীঘিতে প্রায় ২০০ সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং তারা গ্রামে গ্রামে তল্লাশি ও গ্রেফতারি করছে।[১২৫] সমগ্র এলাকা জুড়ে ১৪৪ ধারা ঘোষিত হয়েছিল এরই মধ্যে চলছিল কৃষক সমিতির মিটিং, মিছিল। ক্যানিং থানার মঠেরদীঘি এবং কালিকাতলাতে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য মিলিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে ১০৭ ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগ ছিল। ক্যানিং থানার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সরবেড়িয়া পর্যন্ত ২০০০ লোকের একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। মঠেরদীঘিতে সি. পি. আই-এর পৃষ্ঠপোষকতায় একটি ইউনিয়ন অফিস চালু করা হয়েছিল।[১২৬] বর্তমান বাসন্তী থানার অধীন পাঠানখালি (পূর্বে সন্দেশখালি থানার অধীন ছিল) গ্রাম ছিল পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির জমিদারি এলাকাভুক্ত চারিদিকে নদী দিয়ে ঘেরা একটি দ্বীপ। ১৯৪৭ সালের ১৩ই মার্চ পাঠানখালি গ্রামের IX নং ইউনিয়ন থেকে খামার লুটের খবর আসায় একটি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সেখানে পৌঁছায়। এরপর ১৪-১৫ই মার্চের পর থেকে আর কোনো লুটের খবর আসেনি। চব্বিশ পরগনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এফ. ও. বেল মন্তব্য করেছিলেন, "আমি মনে করিনা পুলিশকে নিষ্ক্রিয়তার জন্য মোটামুটিভাবে দায়ী করা যেতে পারে। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জেলা প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ মত স্থানীয় পুলিশ ভাগচাষি ও জোতদারদের মধ্যে একটি সর্ব সম্মত মীমাংসা করার চেষ্টা করছিল। ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত এমনভাবে চলছিল। কিন্তু ৪ঠা মার্চের পর পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট-এর নির্দেশ মত সার্কেল অফিসার খামার লুটের ঘটনাকে অপরাধের আওতায় এনে লুটের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছিল"।[১২৭] ১৯৪৭ সালের ১৩ই মার্চ আলিপুর মহকুমা শাসক কর্তৃক রাজস্ব দপ্তরের (বোর্ড অব রেভেনিউ) অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি ও বাংলা সরকারের এক্স অফিসিও ডেপুটি সেক্রেটারিকে লেখা রিপোর্ট থেকে আলিপুর সদর মহকুমার ক্যানিং থানা এবং

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির তেভাগা আন্দোলনে বর্গাদার ও জমি মালিকের সম্পর্ক বিষয়ে একটি বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। উক্ত রিপোর্টটি নিম্নরূপ, [প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা প্রয়োজন অবিভক্ত বাংলার ২৬টি জেলার ৮৪টি মহকুমা থেকে তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে এমন ধরনের রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল] রিপোর্টটির বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় এমন

গোপনীয়ঃ

সাব-ডিভিশানাল অফিস,

সদর আলিপুর,

মেমো নং- ২৪২,

তারিখ, ১৩-০৩-১৯৪৭।

প্রযত্নে,

অতিরিক্ত সচিব, বোর্ড অফ রেভেনিউ এবং

পদাধিকারী সহ-সচিব, বাংলা সরকার।

প্রসঙ্গঃ সরকারি মেমো নং ১৭৮৮(২)৮৪- এল. আর. তারিখ ০১-০৩-১৯৪৭

বিষয়ঃ তেভাগা আন্দোলন- বর্গাদারদের সঙ্গে মালিকদের সম্পর্ক।

আপনার দেওয়া মেমো দ্বারা উল্লেখিত রিপোর্টটি জমা দেওয়া হয়েছে। উপরে উল্লেখিত মেমোটি যেহেতু দেরিতে পাওয়া হয়েছে তাই রিপোর্টও তাড়াতাড়ি দেওয়া সম্ভব হলনা।

১। ক) ভাগ ছিল আধা-আধি কিন্তু চাষের সব খরচ মেটাতে হত বর্গাদারকে। যেটির পরিমাণ বিঘাপিছু ১০ থেকে ১৫ টাকা।

খ) ভাগ হত অর্ধেক-অর্ধেক

গ) ভাগ হত অর্ধেক-অর্ধেক।

২। ক) প্রথা ছিল ভাগের পূর্বে ফসলগুলিকে ভূস্বামীর খামারে নিয়ে যাওয়া।

খ) বর্গাদার উৎপাদিত শস্য ঝাড়াইয়ের জন্য শ্রমিক সরবরাহ করত।

৩। এই মহকুমাতে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়েছিল এই মাসেই।

৪। ক) এটি শুরু হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে।

খ) কলকাতা থেকে আগত আন্দোলনকারীদের দ্বারা স্থানীয় জনগণ আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন।

গ) আন্দোলন আংশিক সাফল্য লাভ করেছিল। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্যানিং থানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেই একটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাধারণ বিদ্রোহ হয়েছিল

ঘ) কিছু ক্ষেত্রে জমির মালিক বর্গাদারদের সাথে আপসে এসে ফসলের এক-তৃতীয়াংশের দাবি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জমির মালিক তাদের অর্ধেক ভাগের প্রথাটিকে ধরে রেখেছিলেন।

ঙ) আন্দোলন সামান্য অগ্রগতি পেয়েছিল।

চ) উপরের বর্ণনার ভিত্তিতে এটা দেখা যায় যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্গাদার নিজেই ফসলের অর্ধেক ভাগ জমির মালিককে দিতেন।

ছ) বর্তমানে আন্দোলনটি কালিকাপুর ইউনিয়ন এবং ক্যানিং থানার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। সম্ভবত দুই মাসের মধ্যেই আন্দোলনটি সমাপ্ত হয়ে যাবে।

আর. সি/ বি. সি চ্যাটার্জি

মহকুমা শাসক

সদর আলিপুর [১২৮]

এপ্রিল মাসের শুরু থেকে আন্দোলন দমনে পুলিশি তৎপরতা আরও তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। পুলিশের সাথে যুক্ত হয়েছিল জমিদার-জোতদারদের তৈরী বিশেষ বাহিনী। বর্গাদারদের বাড়ি লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, কৃষক রমণীর সম্ভ্রমহানি, ধর্ষণ প্রভৃতি অমানুষিক দমন নীতি। স্বাধীনতা পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, চারিদিকে নদী দিয়ে ঘেরা ১৪০০০ বিঘা জমি সম্বলিত তৎকালীন সন্দেশখালি থানার পাঠানখালি এবং সন্দেশখালি এলাকার সমস্ত বোট পরিষেবা সাত দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে সমগ্র এলাকা সাত দিন ধরে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। এই সুযোগে প্রায় ৫০ জনের মত পুলিশ ও জোতদার বাহিনী আন্দোলনকারীদের বাড়ি ভাঙচুর করে তাদের উপর নির্দয় অত্যাচার করেছিল এবং প্রচুর পরিমাণ ধান লুট করে নিয়েছিল। এছাড়া প্রায় ৬০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল।[১২৯] এই-সময় আন্দোলনের সাথে যুক্ত কৃষক নেতাদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে অবাধ গ্রেফতারের ফলে নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলন একপ্রকার দিশাহীন হয়ে পড়েছিল। মঠেরদীঘিকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার প্রধান কারিগর হেমন্ত ঘোষালের নামে ৫৫টি মামলা দায়ের হয়েছিল এবং ১৯৪৭ সালের মে মাসে মিনাখাঁ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলে নেওয়া প্রয়োজন বেড়মজুরের পুলিশি আক্রমণের পর থেকে এই অঞ্চলের আন্দোলনে ভাটা পড়তে শুরু করেছিল, যেটি হেমন্ত ঘোষাল নিজেই স্বীকার করেছিলেন।[১৩০] তবে সুন্দরবনের অপর প্রান্ত কাকদ্বীপে তখনও আন্দোলন থামেনি। স্বাধীনতার পর বাংলার অন্যান্য অংশে তেভাগা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লেও এই অঞ্চল ভাগচাষির দাবি পূরণের বিদ্রোহ সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেছিল। তবে এর প্রতিদান স্বরূপ অমানুষিক অত্যাচারের সাক্ষীও ছিল কাকদ্বীপ।

যাইহোক আন্দোলন দমন-পীড়নের পাশাপাশি লীগ সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী মিঃ ফজলুর রহমান পূর্ববর্তী বর্গাদার বিলটিকে ধামা চাপা দিয়ে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির জন্য 'বেঙ্গল স্টেট ইকুইজেশন এন্ড টেনান্সি বিল' নামে একটি বিল নিয়ে আসে। বিলটি ১৯৪৭ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে কলকাতা গেজেটের একটি আসধারণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[১৩১] বিলটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটিয়ে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু এবং প্রকৃত চাষির সঙ্গে সরকারের সুষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে ফসলের ফলন বৃদ্ধি করা। এছাড়া চাষের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করে দেশের কৃষি অর্থনীতিকে সুসংবদ্ধ করা।[১৩২] তবে বিলটি আইনসভায় উত্থাপিত হলে নানা তরফ থেকে আপত্তি আসতে শুরু করেছিল। জমিদার-জোতদারদের পক্ষ বিলের জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির উদ্যোগটিকে মেনে নিতে পারেনি। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে জ্যোতি বসু বিলটির সাধারণ নীতিগুলিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন অর্থাৎ জমিদারি প্রথা অবসানের বিষয়টিকে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু অন্যান্য ধারাগুলিকে সমর্থন করেননি। এভাবে বিভিন্ন পক্ষের আপত্তির ফলে বিলটি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয়নি। লীগ সরকার অগত্যা বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়েছিল এবং ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।[১৩৩] কিন্তু রিপোর্ট তৈরীর পূর্বে ৩রা জুন গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটন ভারত বিভাজনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ফলে বিলটি বঙ্গীয় বিধান পরিষদ কর্তৃক আইনে পরিণত হওয়ার আর কোনো প্রশ্নই থাকল না। অর্থাৎ স্বাধীনতার আনন্দ ও ভারতভাগের পরিকল্পনা বর্গাদারের স্বপ্নকে পূর্ণ হতে দেয়নি। দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত ভারত বিভাজনের পরিকল্পনা শুধুমাত্র হিন্দু মুসলিম দুটি জাতিকেই পৃথক করেনি, পৃথক করেছিল এর সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধতাকেও। যেটির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের উপর। তেভাগার ডাক সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত

করেছিল যেসব অঞ্চলগুলিকে তার বেশির ভাগটাই চলে গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানের বাংলাদেশ)। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির হিন্দু জমিদার তাই পূর্ববঙ্গের জমির অধিকার ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে জমিদারি ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আগত জমিদার তার জমিদারি বজায় রাখতে পারেনি, খুব বেশি হলে আভিজাত্য বজায় রেখেছিল। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে তাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছিল মুসলিম গ্রামীণ অভিজাতরা যারা সস্তায় জমির অধিকার কিনতে সক্ষম হয়েছিল।[১৩৪] খন্ডিত বঙ্গের পশ্চিমাংশে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় এসেছিল কংগ্রেস।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতি এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। সমিতির শক্তিপুঞ্জ ভাগ হয়ে গিয়েছিল যার বেশির ভাগটাই চলে গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে। তাই ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে ফসল তোলার মরসুমে যখন বর্গাদাররা তেভাগার দাবি তুলেছিল তখন দ্বিধাগ্রস্ত কৃষক সভা নিশ্চুপ ছিল।[১৩৫] কমিউনিস্ট পার্টি নবগঠিত জাতীয় সরকারকে আইনি পথে প্রতিশ্রুতি পালনের সুযোগ দিতে চেয়েছিল। তাই বর্গাদারদের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির সম্পাদক ভবানী সেনকে বলতে শোনা যায়, we appeal to the peasants that this year they should not carry out direct Struggles as they did last years...this year the national government is power and before resorting to direct resistance against this national government we should offer them another opportunity to fulfil their pledges through legislation ... hence this year the share of the crop should be ascertained through mutual understanding.[১৩৬] কিন্তু কমিউনিস্ট নেতৃত্বের উপরোক্ত আবেদন খারিজ করে দিনাজপুর ও চব্বিশ পরগনা জেলার কিছু কিছু অঞ্চল পার্টি নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রনের বাইরে গিয়ে তেভাগা

আন্দোলনের শেষ প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল। আন্দোলনের গতিকে স্তিমিত হতে দেয়নি। আন্দোলনের এই পর্যায়ে বর্গাদারদের তেভাগা দাবির সাথে মিশে গিয়েছিল জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির দাবি। কৃষক সভা চাইছিল না কোনো প্রকার সহিংস ঘটনা সংঘটিত হউক। অন্যদিকে বর্গাদাররা তাদের তেভাগা ও জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির দাবির সঙ্গে জমি মালিকের খামারে ধান না তোলার আর্জিটাকেও জুড়ে দিয়েছিল। তারা চাইছিল ধান তোলা হউক পঞ্চায়েত খামারে। কয়েকটি জায়গায় বড়ো-বড়ো জমির মালিক কৃষকের দাবি মেনে নিলেও কাকদ্বীপ, লয়ালগঞ্জ, বুধাখালি, রামনগর, দুর্গাপুর, দেউলি, ক্যানিং থানা ও মথুরাপুরের জমির মালিকরা কৃষকদের এই দাবি মেনে নিতে অসম্মত ছিল। তারা নিজেদের লাঠিয়াল বাহিনী এবং পুলিশের সহায়তায় কৃষকদের দাবি বানচাল করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কোথাও কোথাও ভূস্বামী নিজেই শস্য লুট করে ভাগচাষির নামে মিথ্যা মামলা জুড়ে দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে কাকদ্বীপে পুলিশি ক্যাম্প বসিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করে বহু গ্রামবাসীকে আতঙ্কিত ও মহিলাদের শ্লীলতাহানি করেছিল।[১৩৭] কাকদ্বীপ থেকে ক্যানিং এবং সন্দেশখালি সর্বত্র এইধরনের অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক কমিটিগুলি গণ সমাবেশের আয়োজন করে যৌথভাবে ফসল তুলে ভাগচাষির খামারে গাদাজাত করতে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। ভাগচাষিদের এইরূপ সংঘবদ্ধ জমায়েত প্রতিহত করতে জমিদার পক্ষ সরকারের সহায়তায় সভা-সমিতিগুলিকে বেআইনি ঘোষণা করেছিল এবং ফসল কাটা বন্ধ করতে পুলিশের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের ভাগচাষিদের উপর সহিংস আক্রমণ করেছিল। ১৯৪৮-এর শেষ এবং ১৯৪৯-এর শুরুর এই-সময় পুলিশি হিংস্রতার নিদারুণ রূপ দেখেছিল কাকদ্বীপ, লয়ালগঞ্জ, চন্দনপিঁড়ি ও বুধাখালি। পুলিশ ও জমিদার বাহিনীর এই যৌথ আক্রমণ প্রতিহত করে কাকদ্বীপ সমগ্র চব্বিশ পরগনার ভাগচাষির মনে নতুন করে সাহসের জোগান দিয়েছিল। কাকদ্বীপের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত কৃষক কমিটি

সন্দেশখালি এবং ক্যানিং থানার বহু স্থানে জমিদারের কাছারি দখল করে অগ্নিসংযোগ, জমি দখলের চেষ্টা এবং জোতদারের বাড়িতে অতর্কিত হামলা করে ধান-চাল লুঠ করে গরীব মানুষের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিল। বহু দলিল দস্তাবেজ পুড়িয়ে ছাই করেছিল। যাইহোক ভাগচাষির এই আন্দোলন প্রতিরোধ করতে তৎকালীন সরকার কংগ্রেসি সেবাদল ও ভূস্বামী লাঠিয়ালদের সঙ্গে প্রায় ২০০০ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করেছিল। এদের সাফল্যে আন্দোলন কয়েক মাস নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। এরপর ১৯৫০ এর শেষের দিকে আন্দোলনকারীরা নতুন নীতি গ্রহণ করে আক্রমণের অভিমুখ ভূস্বামীদের থেকে সরিয়ে সরকারি এজেন্ট এবং মজুতদারিদের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। এই-সময় পুলিশ ও চাষির মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। ক্যানিং এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে কৃষক এবং পুলিশের মধ্যে খন্ড খন্ড সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছিল। এরপর ১৯৫০ সালে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন পাশ করলে বহু ভাগচাষির আত্মোৎসর্গ কিছুটা হলেও সার্থক হয়েছিল। কারণ এই আইন কৃষক সমাজের একটি মৌলিক শক্তি রূপে বর্গাদারদের স্বীকৃতি দিয়েছিল।[১৩৮] তবে এত দীর্ঘ আন্দোলনের পরেও তেভাগার দাবি আইনগত ভাবে মানা হয়নি।[১৩৯] এরপর ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে ডঃ বিধান চন্দ্র রায় সরকারের মন্ত্রিসভা এস্টেট একুইজেশন অ্যাক্ট অর্থাৎ জমিদার অধিগ্রহণ আইন পাশের মাধ্যমে চিরতরে জমিদারি প্রথার অবসান ঘটিয়েছিল।[১৪০] এতকিছুর পরেও ভাগচাষি ও জোতদারদের অংশ ভাগ হত সেই ৫০:৫০ অংশে এবং জোতদাররা এই আইনের বাইরে থাকায় তখনও পর্যন্ত জমিদারি থেকে উচ্ছেদের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এরপর ১৯৫৫ সালের ভূমি রাজস্ব সংস্কার আইন জোতদারের অংশকে ৪০ শতাংশে হ্রাস করে এনেছিল এবং সর্বপ্রকার অত্যাচার ও অবৈধ আদায় দূর হয়েছিল।

তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস এই গবেষণা পত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। কারণ তেভাগার ডাক সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে যে প্রভাব ফেলেছিল তার আঁচ থেকে বাদ যায়নি ক্যানিং মহকুমাও। এই আন্দোলন ক্যানিং মহকুমার মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা ও আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। তাই ক্যানিং মহকুমার রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে তেভাগার ইতিহাসকে আলোচনার দায়বদ্ধতা থেকে যায়। স্বাধীনতার পরে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি ক্যানিং মহকুমার মানুষের জন্য একটি স্বয়ংসম্পর্ণ রাজনৈতিক বৃত্ত (Autonomous Political Domain) তৈরী করেছিল, যেটি পরবর্তীতে ক্যানিংকে সম্পূর্ণ মহকুমা হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়ক হিসাবে কাজ করেছিল।

তথ্যসূত্র :

১। W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, vol-1, District of the 24 Parganas and Sundarbans (London: Trubner & co., 1875), 92; Nilmani Mukharjee, The Port of Calcutta, A Short History (Calcutta: The Commissioners for the Port of Calcutta, 1968), 9.

২। Paper relating to the formation of Port Canning on the Matla River, extending from 27 may 1853 to 11 march 1865, Calcutta,1865.

৩। Anil Chandra Lahiri, Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of the 24 Parganas, 1924-33 (Alipore: Bengal Government press, 1936), 116; Alapan Bandyopadhyay, Anup Matilal (ed), The Philosopher,s Stone Speeches and writing of Sir Daniel Hamilton (Gosaba: Gosaba Estate Trust, 2003), 2-3.

৪। টীকা The Rules of 1853:

সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থায় ১৮৫৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর আইন প্রণীত হয়। এই আইনে জমি বন্দোবস্ত-এর সর্বোচ্চ মেয়াদ ছিল ৯৯ বছর। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, আবেদনকারীর সংখ্যা অধিক হলে নিলাম করা হবে এবং যে সর্বোচ্চ দাম দেবে তাকে জমি লিজ দেওয়া হবে। এই আইন অনুসারে কুড়ি বছর অবধি কোনো প্রকার খাজনা নেওয়া হত না। প্রথম ২১ বছর থেকে ৩০ বছর অবধি খাজনার পরিমাণ ছিল ১/২ আনা, ৩১-৪০ অবধি হয়েছিল ১ আনা, ৪১-৫০ পর্যন্ত ১ ১//২ আনা এবং ৫১-৯৯ বছর পর্যন্ত জমির খাজনা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২ আনা। ৫ বছরের মধ্যে ৪ ভাগের ১ ভাগ জমি, ১০ বছরের এক চতুর্থাংশ, ২০ বছরে অর্ধেক এবং ৩০ বছরে পুরো জমি পুনরুদ্ধার করে আবাদযোগ্য করতে হবে। তা না হলে ভূমিস্বত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।

Frank David Ascoli, A Revenue History of the Sundarbans from 1870 to 1920 (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot., 1921), 12-14.

৫। টীকা Large Capital Rules 1879:

সুন্দরবনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৫৩ সালের ভূমিসংস্কার আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে ১৮৭৯ সালে তৎকালীন সুন্দরবন কমিশনার মিঃ গোমস Large Capital Rules 1879 পাশ করেন। এর শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপঃ

১ । এই আইনে ভূমি বন্দোবস্তের সর্বোচ্চ মেয়াদ ছিল ৪০ বছর তবে মেয়াদ শেষ হলে আরও ৩০ বছর পর্যন্ত সময়সীমা পূনঃনবীকরণ করা সম্ভব ছিল।

২। এখানে ভূমি রাজস্বের ছাড় ছিল ১০ বছর পর্যন্ত, ১৯৫৩ সালের আইনে যেখানে ছিল ২০ বছর পর্যন্ত।

৩। এই আইনে ইজারাকৃত জমির উর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ১০০০০ বিঘা এবং সর্বোনিম্ন ২০০ বিঘা, তবে স্পেশাল লিজ হিসাবে অনেকে ৪০-৪২ হাজার বিঘা পর্যন্ত ইজারা পেতেন।

৪। পাঁচ বছরের মধ্যে ইজারাকৃত জমির ১/৪ অংশ জমি পুনরুদ্ধার করতে হবে।

৫। বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন রাজস্ব হারের পরিবর্তে একটি নিদির্ষ্ট ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়। যেটি পূর্বের রাজস্ব হার অপেক্ষা বেশি ছিল।

*Ascoli, A Revenue History of the Sundarbans, 15.

৬। টীকাঃ চকদার, গাঁতিদার ও হাওলাদার-

সরকারের ভূমিরাজস্ব বিভাগ থেকে সম্পদশালী যেসব ব্যক্তি হাজার বিঘা জমি ইজারা নিতেন তাদেরকে বলা হয় লাটদার। এরা অধিকাংশই ছিলেন সুন্দরবনের অনুপস্থিত জমি মালিক। এইসব লাটদাররা শহরে বাস করে, আরামকেদারায় বসে, নিলাম বা হ্যন্ডবিল ছেপে জঙ্গল সহ লটের অংশ বিক্রি করে দিতেন। লাটদারদের থেকে বিক্রিত এই জমি যারা কিনতেন তারা চকদার। কিন্তু যারা যৌথভাবে এক একটি লাট বা দ্বীপের বাঁধ বাধার বা জমি পুনঃরুদ্ধারের দায়িত্ব নিতেন, পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে লটের অংশ ক্রয় করতেন তারা গঁতিদার। 'হাওলাদার' শব্দটি আরবি 'হাওয়ালা' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ নির্দিষ্ট শর্তে প্রদত্ত নিষ্কর জমির মালিক।

৭। মৈত্রেয় ঘটক, কাকদ্বীপ ১৯৪৬-৫০, নেওয়া হয়েছে মহাশ্বেতা দেবী (সম্পাদিত), 'বর্তিকা' কাকদ্বীপ তেভাগা আন্দোলন সংখ্যা, ১৯৮৬, ৮-১৪; Partha Chatterjee, Bengal 1920-1947 The land Question, Vol-I (Calcutta: K. P. Bagchi, 1984), 204.

৮। সুপ্রকাশ রায়, কাকদ্বীপ, সোনারপুর, ভাঙ্গড়ের কৃষক সংগ্রাম, ১৯৪৬-৪৮ (কলকাতা: র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব, ১৯৬৯), ৩০; অনুপ মতিলাল, সুন্দরবন: ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস, নেওয়া হয়েছে দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত 'শ্রীখন্ড সুন্দরবন' (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, নভেম্বর ২০০৪), ১২০।

৯। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 338.

১০। Adrienne Cooper, Sharecropping and Sharecropper's Struggles in Bengal 1930-1950 (Calcutta, New Delhi: K. P. Bagchi & Company, First Published-1988), 18.

১১। গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই (দঃ চব্বিশ পরগনা: সেরিবান, ডিসেম্বর ২০০৪), ৮।

১২। Cooper, Sharecropping and Sharecropper's Struggles, 19.

১৩। Hunter, A Statistical Account of Bengal, 154; L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers, 24-Parganans (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot., 1914), 141.

১৪। M. N. Gupta, Land Systems of Bengal (Calcutta: University of Calcutta, 1940), 50; Cooper, Sharecropping and Sharecropper's Struggles, 18-19.

১৫। Karuna Mukharjee, Land Reform, (Calcutta: H. Chatterjee & Co., 1952), 189.

১৬। KrishnaKanta Sarkar, Kakdwip Tebhaga Movement, in A. R. Desai (ed), 'Peasant Struggles in India' (Delhi: Oxford University Press, First Published 1979 and Paper Back Edition Published 1981) 470.

১৭। Krishnakant Sarkar, A Case Study: Co-operative Movement (India) No Unemployment No Starvation No Death, Sundarban Famine 1943 (Kolkata: Imagine Publication, 2008), 8.

১৯। জয়ন্ত ভট্টাচার্য, বাংলার 'তেভাগা' তেভাগার সংগ্রাম' (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, জুলাই ১৯৯৬), ১৮; কুণাল চট্টোপাধ্যায়, তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, আগস্ট ১৯৮৭), ১।

২০। জয়ন্ত ভট্টাচার্য, তেভাগার পঞ্চাশ বছর প্রসঙ্গে, নেওয়া হয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা ১৪০৪ বঙ্গাব্দ',বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৪২-৪৬ (কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০শে মে , ১৯৯৭), ১১০।

২১। West Bengal State Archive, Proceeding of Land and Land Revenue Department, Land Revenue Branch, Government of West Bengal, Fill No- 6m-38/47B, of December/48/15-107, Memo No. 1788 (26- L. R.) Calcutta, 1. 3. 1947.

২২। West Bengal State Archive, Bengal Land Revenue Administration Report, 1930-1931, p.5, Azizul Huque, The Man Behind the Plough, (Calcutta: Gupta, Rahaman And Gupta, 1944), 45.

২৩। মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস (কলকাতা: নবজাতক প্রকাশন, বাংলা ১৫ই আশ্বিন ১৩৭৬, ইংরেজি ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯), ৪৬।

২৪। Cooper, Sharecropping and Sharecropper's Struggles, 37-41; আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, ৪৬-৪৭।

২৫। Government of Bengal, Report of the Land Revenue Commission Bengal, Vol-II (Alipur, Bengal Government Press, 1940), 120-121.

২৬। Government of Bengal, Report of the Land Revenue Commission Bengal, Vol-II, 117-120.

২৭। টীকা: ডিনায়েল পলিসি

১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ সরকার বাংলার সমুদ্র উপকুলবর্তী অঞ্চলগুলিতে জাপানী আক্রমণে ভীত হয়ে এই নীতি গ্রহণ করেছিল। কোনোভাবে জাপানীরা যাতে বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে সেই চেষ্টায় ১০ জন নিয়ে চলতে পারে এমন নৌকা এবং অন্যান্য যানবাহন এমনকি সাইকেলকেও ভেঙ্গে দেওয়া বা ডুবিয়ে রাখার আদেশ দিয়েছিল। সামরিক বাহিনী এবং সরকারের প্রয়োজনে কেনা খাদ্যশস্যও সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সরকারের এই নীতি উপকূলবর্তী অঞ্চলের সমাজ ও অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। খাদ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও কৃষি উদ্বৃত্ত সরবরাহের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। মানুষ ভয়ে ভীত হয়ে স্থানচুত্য হতে শুরু করেছিল। মৎস্য শিকার এবং চাষাবাদ মারাত্নক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এক কথায় মানুষ তার স্বাভাবিক কর্ম সম্পাদন করতে অপারগ হয়ে পড়েছিল।

*Cooper, Sharecropping and Sharecropper's Struggles, 49.

২৮। ভট্টাচার্য, বাংলার 'তেভাগা' তেভাগার সংগ্রাম, ২৪-২৫; Cooper, Sharecropping and Sharecropper's Struggles, 48-50.

২৯। P. Greenough, Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-44 (Oxford and New York, Oxford University Press, 1982), 45.

৩০। Cooper, Sharecropping and Sharecropper's Struggles, 54.

৩১। B. R. Choudhuri, Agrarian Movement in Bengal and Bihar, 1919-1939 in B. R. Nanda (ed) 'Socialism in India' (Delhi: Vikas Publication, 1972), Section II, IV &V.

৩২। J. H. Broomfield, Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth-Century Bengal (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1968), 11-13.

৩৩। ভট্টাচার্য, বাংলার 'তেভাগা' তেভাগার সংগ্রাম, ২৯-৩০।

৩৪। Sarkar, Kakdwip Tebhaga Movement, 471-473; Cooper, Sharecropping and Sharecropper's Struggles, 89-90; Rabindra Nath Mandal, The Tebhaga Movement in Kakdwip (Kolkata: Ratna Prakashan, 2001), 28.

৩৫। Cooper, Sharecropping and Sharecropper's Struggles, 100.

৩৬। রানী দাশগুপ্ত, তেভাগার লড়াইয়ে কৃষক মহিলাদের ভূমিকা, নেওয়া হয়েছে সুমিত চক্রবর্তী সম্পাদিত 'তেভাগার সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ', (কলকাতা: ১৯৭৩), ১০৭।

৩৭। KrishnaKanta Sarkar, Kakdwip Tebhaga Movement, 469.

৩৮। আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, ৫১।

৩৯। Sutapa Chatterjee Sarkar, The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2017) P. 148.

৪০। আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, ৫২।

৪১। R. Palme Dutta & Ben Bradley, Anti-Imperialist Peoples Fornt in India, The Labour Monthly, Vol. 18, March 1936, No.3, PP. 149-160, https://www.marxist.org/archive/dutt/1936/03/xo/htm; আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, ৫২।

৪২। হেমন্ত ঘোষাল, বাড়ি পিছু একজন যুবক, একটি লাঠি, নেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি সম্পাদিত 'তেভাগার লড়াই' (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৪), ১৪।

৪৩। R. N. P., Confidential No-30 of 1936, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of March 1936.

৪৪। R. N. P., Confidential No-30 of 1936, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of March 1936.

৪৫। R. N. P., Confidential No-30 of 1936, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of March 1936.

৪৬। R. N. P., Confidential, No-4 of 1936, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of April, 1936.

৪৭। R. N. P., Confidential, No-4 of 1937, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of April, 1937.

৪৮। R. N. P., Confidential, No-5 of 1937, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of May, 1937.

৪৯। Government of Bengal, Report of the Land Revenue Commission Bengal, Voll- II, 120.

৫০। Bengal Land Revenue Administrative Report 1937-38, P-14, 1938-39, P- 14, 1939-40, P-14, Calcutta, 1939-41; Report of Bengal Land Revenue Commission Bengal, 1949, Voll-4; Sundarban Land Holding Association P-335 and Voll-6, 24 Parganas Bar Association, 290-308.

৫১। Renu Chakravartty, Communist in India's Women's Movement 1940-1950 (New Delhi: Peoples Publication's House, 1980), 45.

৫২। আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, ১১২; ভট্টাচার্য, বাংলার 'তেভাগা' তেভাগার সংগ্রাম, ৭৯; ক্ষিতিরঞ্জন মন্ডল, সুন্দরবনে তেভাগা, সমকালের জিয়ন কাঠি, সেপ্টেম্বর ২০০৭।

৫৩। বিনয় চৌধুরী, কৃষক আন্দোলনের এক অমর অধ্যায় তেভাগা লড়াই, নেওয়া হয়েছে বিনয় কোঙার (সম্পা:), 'তেভাগার সংগ্রাম-ফিরে দেখা' (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা, সেপ্টেম্বর ১৯৪৬), ২১।

৫৪। ভট্টাচার্য, বাংলার 'তেভাগা' তেভাগার সংগ্রাম, ৩৬।

৫৫। আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, ১৪৯-১৫০; Sunil Sen, Peasant Movement in India, Mid Nineteen and Twentieth Century (Calcutta: K.P. Bagchi, 1982) P. 106.

৫৬। মুহম্মাদ আবদুল্লাহ রসুল, তেভাগার লড়াই, নেওয়া হয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা ১৪০৪ বঙ্গাব্দ', বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৪২-৪৬ (কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০শে মে, ১৯৯৭), ২৭; গোলাম কুদ্দুস, বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তেভাগা সংগ্রাম, নেওয়া হয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা ১৪০৪ বঙ্গাব্দ', তদেব, ৬৫।

৫৭। বিনয় কোঙ্গার, তেভাগা ও কৃষক আন্দোলনের প্রবাহ ,নেওয়া হয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা ১৪০৪ বঙ্গাব্দ', তদেব, ৫৪; নরহরি কবিরাজ, তেভাগা আন্দোলন কৃষক সংগ্রামের এক দিক চিহ্ন, তদেব, ৯৩; মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, তেভাগার লড়াই, তদেব, ২৭; আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, ১৫৩-১৫৪; Susanta Das, Marginal Communities in Peasant Movement: The Sharecropper's Struggles for Tebhaga in North Bengal (1946-1947), Proceeding of the Indian History Congress, 2013, Vol. 74(2013), 640. https://www.jstor.org/stable/44158867.

৫৭। Asim Mukhopadhyay, Peasant of the Parganas, in A. R. Desai (ed), Peasant Struggles in India (Delhi: Oxford University Press, First Published 1979 and Paper Back Edition Published 1981), 656.

৫৯। গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, সুন্দরবন লাট নং ১৪৯ হোল্ডিং নং ১২৪, রাঙ্গাবেলিয়া দ্বীপের একটি পাট্টা।

৬০। Sarkar, A Case Study: Co-operative Movement, 21.

৬১। আর. এস. পি. দলের সক্রিয় কর্মী হারান চন্দ্র মন্ডল-এর লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করেছিলেন কৃষ্ণকান্ত সরকার ৩০-১২-১৯৭৬ নেওয়া হয়েছে Sarkar, A Case Study: Co-operative Movement, 6.

৬২। সৌমেন দত্ত, স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবার আখ্যান (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রঃ লিঃ, ২০১০) ১১৩-১৪।

৬৩। Proceeding of Home Political Department, Government of India. Fortnightly Report, Bengal, 2nd half of February 1939, File No. 18.2.1939

৬৪। Proceeding of Home Political Department, Government of India. Fortnightly Report, Bengal, 2nd half of February 1939, File No. 18.2.1939

৬৫। West Bengal State Archive, Proceeding of Home political department, Report on Lawlessness among raiyats at Gosaba Basirhat, 24 Parganas, Fill No. 3r/29, confidential, Government of Bengal, Proceeding 981-989, March 1939.

৬৬। গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সালে শ্রী রূকো মোল্লা কর্তৃক এস্টেটের ম্যানেজার মহোদয়কে প্রদত্ত একটি দরখস্ত।

৬৭। দত্ত, স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবার আখ্যান, ১২১।

৬৮। দত্ত, স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবার আখ্যান, ২১২-২২২; Krishnakanta Sarkar, Peasant Political Action in 24 Parganas with Special Reference to Kakdwip and Gosaba, A Unpublished Ph. D. Thesis, University of Calcutta, 1985, 438-439.

৬৯। স্থানীয় আর. এস. পি. নেতা এল. খাতের আলির লিখিত রিপোর্টটি সংগ্রহ করেছিলেন কৃষ্ণকান্ত সরকার, Sarkar, Peasant Political Action in 24 Parganas, 460.

৭০। গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, সভার কার্যবিবরনী বহি, গোসাবা এস্টেট এমপ্লয়াইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিটির সাধারণ সভার কার্যবিবরণ, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৭১। গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, পরিদর্শক বই, ১৮ই জানুয়ারি, ১৯২০ এবং ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৪৬।

৭২। গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, পরিদর্শক বই, ১৮ই জুলাই, ১৯৪৮ সালের একটি রিপোর্ট।

৭৩। গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, পরিদর্শক বই, ২৩শে মার্চ, ১৯৩১ সালের একটি রিপোর্ট।

৭৪। গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, পঞ্চায়েত রিপোর্ট ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৪ সালের একটি মিটিং।

৭৫। গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, পরিদর্শক বই, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ সালের একটি রিপোর্ট।

৭৬। গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, পরিদর্শক বই, ৫ই জুন, ১৯৪৮ সালের একটি রিপোর্ট।

৭৭। সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, ফুড কমিটি সমূহ এবং গ্রাম্য বরাদ্ধ পরিকল্পনা বা গ্রামাঞ্চলে দ্রব্যসমূহের নিয়ন্ত্রিত বন্টন ব্যবস্থা, ১৯৮৮, ১।

৭৮। Sarkar, Peasant Political Action in 24 Parganas, 464.

৭৯। গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, ৩১শে জুলাই, ১৯৪৬ সালের একটি সেলামি রসিদ।

৮০। Buddhadeva Bhattacharya, Origin of the Revolutionary Socialist Party https://www.marxists.org/archive/bhattacharya/1982/origins-rsp/ch01.htm

৮১। দত্ত, স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবার আখ্যান, ১২৭।

৮২। দত্ত, স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবার আখ্যান, ১২৭।

৮৩। শশাঙ্ক মন্ডল, ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন (কলকাতা: পুনশ্চ, ১৯৯৫), ৮১।

৮৪। গজেন্দ্রনাথ মাইতির ডায়েরি, নেওয়া হয়েছে Sarkar, Peasant Political Action in 24 Parganas, 485.

৮৫। গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৪০ সালের কৃষি মজুরি চুক্তির একটি রশিদ।

৮৬। Sarkar, Peasant Political Action in 24 Parganas, 512-14.

৮৭। দত্ত, স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবার আখ্যান, ১৩৭।

৮৮। Sarkar, Peasant Political Action in 24 Parganas, 542.

৮৯। ভট্টাচার্য, বাংলার 'তেভাগা' তেভাগার সংগ্রাম, ৭৬-৭৭।

৯০। পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং (কলকাতা: লোকসখা প্রকাশন, ২০১৭) ২৭৪-২৭৫।

৯১। সন্তোষ কুমার বর্মণ, বেড়মজুরের তেভাগার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির সন্ধানে (কাকদ্বীপ, চব্বিশ পরগনা: বামা পুস্তকালয়, ১৯৯৯), ১১-১৩।

৯২। বর্মণ, বেড়মজুরের তেভাগার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির সন্ধানে, ১১-১৩।

৯৩। West Bengal State Archive, Government of west Bengal. Abdur Razzak Khan, IB File No. 95/1924.

৯৪। Rabindra Nath Mondal, The Tebhaga Movement in Kakdwip (Kolkata: Ratna Prakashan, 2001), 56.

৯৫। West Bengal State Archive, Government of West Bengal, A. C. Dutta (Report), Summary Report of the meeting held at Canning 24-Parganas on 05.10.1945, Calcutta, 20.10.1945, D. I. B 23.10.1947, IB File No. 90/1947.

৯৬। Ibid.

৯৭। Ibid.

৯৮। Ibid.

৯৯। Ibid.

১০০। চট্টোপাধ্যায়, তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস, ১৫।

১০১। Ashok Majumdar, Peasant Protest in Indian Politics: Tebhaga Movement in Bengal (New Delhi: NIB Publishers, 1993), 116-117.

১০২। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ: জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০), ২৭৭।

১০৩। West Bengal State Archive, Proceeding of Land and Land Revenue Department, Land Revenue Branch, Report of the S. D. O Diamond Harbour, File No. IE2/46 Government of Bengal, July 1946.

১০৪। ibid.

১০৫। স্বাধীনতা, শনিবার, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪৬, প্রথম বর্ষ, ৩০৯ সংখ্যা।

১০৬। কংসারী হালদার, কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলন, নেওয়া হয়েছে সুমিত চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘তেভাগার সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ’, (কলকাতা: ১৯৭৩), ৬৬-৬৭।

১০৭। ভট্টাচার্য, বাংলার ‘তেভাগা’ তেভাগার সংগ্রাম, ৭৭।

১০৮। হেমন্ত ঘোষাল, সময় অসময়ের স্মৃতি (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮), ১৯।

১০৯। গৌরঙ্গ চক্রবর্তী, কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই (বাখরাহাট, চব্বিশ পরগনা: সেরিবান, ডিসেম্বর, ২০০৪), ৭৭-৭৮।

১১০। ঘোষাল, সময় অসময়ের স্মৃতি, ১৯।

১১১। বরুণদেব পাত্র, তেভাগা আন্দোলন (সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট), নেওয়া হয়েছে পুর্নেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং, ৫৫২-৫৫৪।

১১২। Hindusthan Standard, Monday, 6th January, 1947.

১১৩। Calcutta Gazette, Extraordinary Published by Authority, Wednesday, January 22, 1947, Government of Bengal, Legislative Department, Notification No 121L – 21at January, 1947; Hindusthan Standard, Thursday, 23rd January, 1947.

১১৪। জয়ন্ত ভট্টাচার্য, তেভাগার পঞ্চাশ বছর প্রসঙ্গে, ১১২।

১১৫। Hinhusthan Standard, Sunday, 2nd February 1947.

১১৬। Hindusthan Standard, Sunday, 9th February, 1947.

১১৭। Hindusthan Standard, Sunday, 16th Februrary, 1947.

১১৮। ঘোষাল, সময় অসময়ের স্মৃতি, ২৩।

১১৯। স্বাধীনতা, মঙ্গলবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭, দ্বিতীয় বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।

১২০। মনসুর হাবিবুল্লাহ, জমিদারি ব্যবস্থা ধ্বংস হোক (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৪৭), ৫০।

১২১। ঘোষাল, সময় অসময়ের স্মৃতি, ২৩-২৪; ঘোষাল, বাড়ি পিছু একজন যুবক, একটি লাঠি, ১৭; আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, ৩১৯; জয়ন্ত ভট্টাচার্য, চব্বিশ পরগনার তেভাগা-তেভাগা থেকে জমির লড়াই, নেওয়া হয়েছে গোকুল চন্দ্র দাস সম্পাদিত, চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪), ৯৫।

১২২। Cooper, Sharecropping and Sharecropper's Struggles, 195.

১২৩। Amrita Bazar Patrika, Monday, 10th March, 1947, Vol. 79, Issue, 70.

১২৪। Hindusthan Standard, Sunday, 9th March, 1947; Governor of Bengal, Report for the First Forthnight, March, 1947.

১২৫। Hindusthan Standard, Wednesday, 19th March, 1947.

১২৬। Tebhaga Movement, IB File, Government of West Bengal.

১২৭। West Bengal State Archive, Proceeding of Home Political Department, Police Branch, File No. 142/47

১২৮। West Bengal State Archive, Proceeding of Land and Land Revenue Department, Land Revenue Branch, Government of West Bengal, Fill No- 6m-38/47B, of December, Memo No. 242 (confidential), Alipore, 13. 3. 1947.

১২৯। স্বাধীনতা, মঙ্গলবার, ২২শে এপ্রিল, ১৯৪৭, দ্বিতীয় বর্ষ, ১১৮ সংখ্যা।

১৩০। ঘোষাল, বাড়ি পিছু একজন যুবক, একটি লাঠি, ১৬-১৭।

১৩১। Calcutta Gazette, Extraordinary Published by Authority, Tuesday, 15th April, 1947, Notification No- 572L-12th April, 1947, 341-392.

১৩২। Calcutta Gazette, Ibid. 392.

১৩৩। বদরুদ্দিন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক (কলকাতা: চিরায়াত, ১৯৭৮), ১১২।

১৩৪। Hindusthan Standard, 9th May, 1950; 16th July, 1950; Joya Chatterji, The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-1967 (New York: Cambridge University Press, 2007), 13-16.

১৩৫। Dipankar Bhattacharya, Peasant Movement in Bengal and Bihar, 1936-47 (Calcutta: R. B. University Press, 1992), 137.

১৩৬। Cooper, Sharecropping and Sharecropper's Struggles, 218-219.

১৩৭। স্বাধীনতা, 22nd November, 1947; 30th November, 47; 11th December, 47; 16th December, 47; 17th December, 47; Ashim Mukhopadhyay, Peasant of the Parganas, in A.R. Desai (ed), Peasant Struggles in India, (Delhi: Oxford University Press, First Published 1979 and Paper Back Edition Published 1981), 656-658.

১৩৮। মানিক সরকার, সংগ্রাম তেভাগার ও অপারেশন বর্গা, নেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজস্ব পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত 'তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা' (আলিপুর: পশ্চিমবঙ্গ সরকারি মুদ্রণ, জুন ১৯৭৯), ৪০।

১৩৯। Ashok Majumdar, Peasant Protest in Indian Politics: Tebhaga Movement in Bengal, 243.

১৪০। Mukhopadhyay, Peasants of the Parganas, 662-663.

উপসংহার

উপসংহার

জল-কাদা ভরা বন-বাদাড়, বিশাল বিশাল নদী-নালা-খাঁড়ি, জোয়ার-ভাটায় কখনো বা নিমজ্জিত, কখনো বা উত্থিত এমন বহু ছোটো-বড়ো দ্বীপের ভয়ংকর-সুন্দর অঞ্চল সুন্দরবন প্রাকৃতিক সম্পদ আর অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর। তবে সুন্দরবন মানে শুধু বাঘ-কুমীরের গল্প নয়, কাদামাটি আর আবাদি ক্ষেত খামারে বসবাসকারী কৃষিজীবী, জলজীবী, অরণ্যজীবী ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দ্বারা ভাঙ্গা-গড়ার প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে সৃষ্ট স্বয়ংসম্পন্ন জনপদ ও গ্রামগঞ্জ যে-কোনো সমাজতত্ত্ববিদ, পরিবেশবিদ, পুরাকীর্তি প্রেমী ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন বৈচিত্র্যময় ক্ষুদ্র-বৃহৎ কতকগুলি দ্বীপের মাধ্যমে সৃষ্ট বর্তমানের ক্যানিং মহকুমা তার বাদাবনের পরিচয় ত্যাগ করে মহকুমা গঠনের পথে যাত্রা শুরু করেছিল সুদূর অতীতে। যেসব অঞ্চলগুলি নিয়ে আজ ক্যানিং মহকুমা গড়ে উঠেছে সেই অঞ্চলগুলি কখনো নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও ভূমি অবনমন আবার কখনো পর্তুগীজ ও আরাকান জলদস্যুর আক্রমণে জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হয়েছিল।[১] কিন্তু মানুষ সেই সকল প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে আবার গড়ে তুলেছিল বসতি, গড়ে তুলেছিল জনপদ, যেটি ধীরে ধীরে আজ মহকুমার রূপ নিয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধটির মাধ্যমে সে যাত্রাপথের সূচনার ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় ক্ষুদ্র অবদান রাখার চেষ্টা করেছি।

ইংরেজ কর্তৃক চব্বিশ পরগনার জমিদারি লাভের পর বাঘ-হরিণের বিচরণক্ষেত্র মানুষের বসবাসের আবাসস্থলে পরিণত হতে শুরু করেছিল। পরিত্যক্ত শাপদ-সংকুল জঙ্গল পরিষ্কার করে ইংরেজ কর্তৃক মনুষ্য বসতি স্থাপনে ইংরেজদের মূল উদ্দেশ্য সুন্দরবনের সম্পদ শোষণ হলেও আমার আলোচিত অঞ্চলগুলি তখন থেকেই মানুষের কোলাহলে পরিপূর্ণ হতে শুরু করেছিল। এই-সময়পর্বে বহু প্রতিষ্ঠিত জমিদারদের সঙ্গে উঠতি ধনপতি উকিল,

ব্যারিস্টার, পুঁজিপতি মহাজন লট আকারে বিক্রি হওয়া সুন্দরবনের লট ক্রয় করে লটদার হয়েছিলেন। তাদের নায়েব গোমস্তারা লটগুলিকে পরিষ্কার করে কৃষিক্ষেত্র তৈরী করতে চব্বিশ পরগনার পার্শ্ববর্তী জেলা বা রাজ্য থেকে মানুষ আনয়নে সচেষ্ট হয়েছিল। বসতি স্থাপনের এই প্রচেষ্টায় সর্বোচ্চ গতি এসেছিল ১৮৫৩ সালে। ১৮৫৩ সাল, তৎকালীন বড়োলাট ডালহৌসি এবং চেম্বার অব কমার্সের সদস্য কর্তৃক কলিকাতার পরিপূরক বন্দর হিসাবে মাতলার তীরে যখন বন্দর তৈরীর পরিকল্পনা শুরু করেছিল তখন থেকে বাদা-আবাদ মেশানো মাতলা এবং তার আশপাশের অঞ্চলগুলি মানুষের আগমনে সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছিল। মাতলা তথা বর্তমানের ক্যানিং, শহরের রূপ নিয়েছিল। সমগ্র সুন্দরবনের প্রথম শহর হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করেছিল। তবে কালের অমোঘ নিয়মে বন্দর এবং শহর তৈরীর কার্য পরিচালনায় নিয়োজিত তৎকালীন সুন্দরবনের সর্বাপেক্ষা বড়ো জমিদার 'পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এন্ড রিক্লামেশন এন্ড ডগ কোম্পানি' সংক্ষেপে 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি' তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে শহর তৈরীর প্রকল্প সহ সমগ্র অঞ্চলটি পুনরায় অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। ক্যানিং শহরের জনসংখ্যা দ্রুত কমতে শুরু করেছিল, তবে সামগ্রিক অর্থে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে সেসময়ও মানুষের আগমন বেড়েই চলেছিল। এরপর ১৯০৩ সালে স্কটল্যান্ড আবাসি ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির কর্ণধার স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন সমবায়ের আদর্শে সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে গোসাবা, রাঙ্গাবালিয়া ও সাতজেলিয়া এই তিনটি দ্বীপে বসতি স্থাপনের সূচনা করেছিলেন। তিনিও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এমনকি আন্দামানের জেল ফেরত আসামিদের নিয়ে এসেছিলেন জঙ্গল সাফাই করে বসতি স্থাপনের কাজে। এভাবে বর্তমানের মহকুমাধীন সমগ্র অঞ্চল নিম্নবর্গীয় হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ও আদিবাসীদের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি থেকে আগত মানুষগুলিই হয়েছিল অঞ্চলগুলির স্থায়ী বাসিন্দা। তখনো কিন্তু সমগ্র সুন্দরবন তথা আমার আলোচ্য অঞ্চলগুলিতে

আরও অনেক লটদার, জমিদার ছিল তবে হ্যামিল্টনের ন্যায় প্রজাদরদী আদর্শ অন্য কোনো জমিদারের মধ্যে ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুনাফা লাভ। কিন্তু হ্যামিল্টনের ইচ্ছা ছিল সমবায়ের আদর্শে বিশ্বাসী এক উৎকৃষ্ট সমাজ গঠন, যেখানে থাকবে না কোনো মহাজনি শোষণ, থাকবে না বেকারত্ব ও দারিদ্রের চিহ্ন। হ্যামিল্টনের সমবায়ের মূল দর্শন ছিল সমবায়ের মাধ্যমে গোসাবাবাসীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলে এক স্বশাসিত সমাজ গঠন। গোসাবাবাসীও তাঁর আদর্শে দীক্ষিত হয়ে স্বায়ত্তশাসনের মন্ত্রকে আত্মস্থ করেছিল। পরবর্তীতে ১৯৩৯ সালে হ্যামিল্টন সাহেবের মৃত্যুর পর এস্টেট যখন কলুষতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল তখন তাঁরই সৃষ্ট স্বায়ত্তশাসন বোধের আদর্শে দীক্ষিত কিছু যুবক এস্টেটের সবরকম অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এভাবে গোসাবাবাসীদের মধ্যে জাগ্রত সমবায়ের ধারণা ওই অঞ্চলের মানুষের আত্মপরিচয় গঠনে সাহায্য করেছিল, যেটি ১৯৪৬ সালে সমগ্র বাংলা জুড়ে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তার পথকে মসৃণ করতে বা সুগম করতে সাহায্য করেছিল।

১৯৪৬ সালে সমগ্র বাংলা কৃষক বিদ্রোহের যে ভয়াবহ রূপ দেখেছিল তার সূচনা হয়েছিল অনেক আগেই। বহু ঐতিহাসিক ও আন্দোলনকারী তাদের সুদক্ষ লেখনী ও আত্মপরিচয় বিশ্লেষনের মাধ্যমে এই বিষয়টিকে খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন বা করেছিলেন। তাই সমগ্র বাংলার তেভাগার সামগ্রিক চিত্রটিকে মননে রেখে শুধুমাত্র ক্যানিং ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে তেভাগা কি রূপ নিয়েছিল সেই বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। প্রাথমিক পর্বে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় সমগ্র ক্যানিং ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে হ্যামিল্টন সাহেবের জমিদারি ও 'পোর্ট ক্যানিং' কোম্পানির অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল তাতে ঘৃতাহুতির কাজ করেছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্বে সংগঠিত সারা বাংলার কৃষক সংগ্রাম, বিশেষ করে কাকদ্বীপের তেভাগার ডাক। সমগ্র

সুন্দরবনের মধ্যে কাকদ্বীপে যখন জঙ্গি তেভাগার সূচনা হয়েছিল তার রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে। এই-সময় ক্যানিং সংলগ্ন মাঠেরদীঘিকে কেন্দ্র করে হেমন্ত ঘোষালের নেতৃত্বে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল মঠেরদীঘি, কালিকাতলা, দেউলি ও বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা, আমঝাড়া প্রভৃতি অঞ্চল। গোসাবা তখন ছিল বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি থানার মধ্যে। তবে গোসাবার আন্দোলন ছিল একটু অন্যরকম, এখানকার নেতারা লড়েছিল প্রজাকল্যাণকামী জমিদারের ম্যানেজারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। গোসাবা বাদে বর্তমান ক্যানিং মহকুমার যেসব অঞ্চলগুলি তেভাগার আঁচে দগ্ধ হয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিল সি. পি. আই.-এর পরিচালনায় তৈরী কৃষক সভাগুলির হাতে। অন্যদিকে গজেন মাইতি, অরিন্দম নাথ, সেবক চরণ দাস ও আরও অনেকে গোসাবাতে যে বিদ্রোহের সূচনা করেছিল তার পরিচালনার ভার ছিল অন্য একটি বামপন্থী সংগঠন- আর. এস. পি-এর হাতে।

যাইহোক ১৯৪৭ সালের প্রথম লগ্ন, আন্দোলন যেমন চরম আকার ধারণ করেছিল তেমনি পুলিশি সক্রিয়তাও ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। আন্দোলন দমনে পুলিশি তৎপরতার নিদারুণ রূপ বেড়মজুরের ঘটনার দু মাস পরে সমগ্র ক্যানিং ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে আন্দোলন পরিচালনার প্রধান কারিগর হেমন্ত ঘোষাল গ্রেফতার হলে আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার ঘোষণা সমগ্র বাংলার কৃষক আন্দোলনকে স্তিমিত করে দিয়েছিল। আন্দোলন পরিচালনার বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তবে স্বাধীনতার পর ক্যানিং ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের মশাল একেবারে নিভে যায়নি, টিমটিম করে হলেও প্রজ্বলিত ছিল। ১৯৫২ সালের ৩১শে মে এবং ১লা জুন ক্যানিং শহরের নিকটবর্তী কুমারশা গ্রামে প্রাদেশিক কৃষক সভার একাদশতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আব্দুল্লাহ রসুলের সভাপতিত্বে ত্রিশ হাজার লোকের সম্মিলিত এই সমাবেশ নবগঠিত সরকারের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেছিল- (ক) কংগ্রেসি পুলিশের

অমানবিক অত্যাচারে বিগত চার বছরের কৃষক আন্দোলনে যেসব সংগ্রামী নারী ও পুরুষ শহীদ হয়েছিল তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন। (খ) জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল ছোটো-ছোটো জমিদারদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করে জমিদারি প্রথা বিলোপ এবং বড়ো-বড়ো জমিদার ও জোতদারদের থেকে জমি বাজেয়াপ্ত করে বিনামূল্যে খেতমজুর গরিব কৃষক ও অন্যান্য ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা। এছাড়া এইসব দাবিকে সাফল্যমন্ডিত করতে কৃষক ও শ্রমিক উভয়ে মিলে জনমত ও গণ ঐক্য গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। (গ) তৎকালীন জনস্বার্থ বিরোধী সরকারি নীতি, অন্যায় উৎপীড়ন, দুর্নীতি ও নিষ্ঠুর উদাসীনতার কারণে সৃষ্ট খাদ্য সংকট পরিস্থিতির জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন আহব্বান করে সরকারি খাদ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালন করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এছাড়া বর্গাদার সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত আন্দোলনকে মূল কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছিল।[২]

যাইহোক জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগঠিত এইসব আন্দোলন ও সমাবেশ, দাবি বা প্রস্তাব যেখানে যাকিছু যেভাবেই হোক না কেন এর মূল উদ্দেশ্য ছিল একই, মধ্যস্বত্বভোগীর অবসান ঘটিয়ে ভাগচাষির তেভাগার দাবিকে মান্যতা দেওয়া। তাই ১৯৫৩ সালে ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সরকার 'স্টেট ইকুয়েশন অ্যাক্ট' অর্থাৎ জমিদারি অধিগ্রহণ আইন পাশের মাধ্যমে জমিদারি প্রথার অবসান ও ১৯৫৫ সালের ভূমি রাজস্ব সংস্কার আইন করে জমিদারদের অবৈধ আদায় বন্ধ করলে আন্দোলন স্থগিত হয়ে যায়।

সর্বোপরি তেভাগা আন্দোলন ছিল সমগ্র বঙ্গের কৃষক জাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই, তাদের অধিকারের লড়াই। আন্দোলনের সাফল্য ও অসাফল্যের বিষয়ে না গিয়ে এটুকু খুব ভালো করে বোঝা যায় যে, তেভাগা ছিল কৃষকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ

প্রদর্শন, যার আঁচ থেকে বাদ যায়নি বর্তমানের ক্যানিং মহকুমাধীন অঞ্চলগুলি। অর্থাৎ খুব স্পষ্ট করে বলতে গেলে এটা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, তেভাগা আন্দোলন বাদাবন সমৃদ্ধ ক্যানিং মহকুমাধীন অঞ্চলগুলির মানুষদের একটি স্বয়ংসম্পন্ন রাজনৈতিক বৃত্ত (Autonomous Political Domain) তৈরীতে সাহায্য করেছিল। তাদের নিজস্ব দাবি-দাওয়ার বিষয়ে সজাগ করে তুলেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী অন্য অনেক দাবিদাওয়ার মধ্যে অন্যতম ছিল সুন্দরবনকে পৃথক জেলা ঘোষণা করে ক্যানিংকে মহকুমা হিসাবে গঠনের দাবি। তবে এই দাবির প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন ফার্দিনান শিলার। ১৮৬৫ সাল নাগাদ 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির' কর্ণধার ফার্দিনান শিলারই প্রথম সুন্দরবনকে স্বতন্ত্র জেলা করে ক্যানিংকে হেডকোয়ার্টার্স করার প্রস্তাব রেখেছিলেন সরকারের কাছে।[৩] শিলারের এই প্রস্তাব সেই সময় অযৌক্তিক বিবেচিত হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী ক্যানিং মহকুমার রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধি, বিধায়ক ও সংসদরা বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিল। সুন্দরবনের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর সম্বলিত প্রচারপত্রগুলি ক্যানিং মহকুমা গঠনের জন্য জনমত গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। মূলত ১৯৮০-৯০-এর দশকে কলম ভিত্তিক এই আন্দোলনগুলির দৌলতে ১৯৭২ সালে সরকারি স্তরে একটি 'ডেলিয়েশন কমিটি' গঠন করে ক্যানিংয়ে সাব ডিভিশন অফিস চালু করা হয়েছিল এবং একজন অতিরিক্ত মহকুমা শাসক নিযুক্ত হয়েছিল। প্রথম অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ছিলেন বিপ্লব চক্রবর্তী। তবে পৃথক মহকুমা দপ্তর ও প্রথম পূর্ণ মহকুমা শাসক পেতে মহকুমাবাসীদের আরও অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মহকুমা হিসাবে ক্যানিং তার পথ চলা শুরু করেছিল।[৪]

স্বাধীনতা পরবর্তী এইসব ঘটনা বা ইতিহাস যেহেতু আমার গবেষণা নিবন্ধের সময়পর্বের বহির্ভূত তাই এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে এটুকু বলা যায় যে, বর্তমানের

ক্যানিং মহকুমাবাসীদের মহকুমা গঠনের এই আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করেছিল তেভাগা আন্দোলন। অর্থাৎ স্বাধীনতার আগেই বিভিন্ন বাদ-প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মাধ্যমে মহকুমাবাসী তাদের পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি অর্থাৎ রাজনৈতিক আত্মপরিচয় গড়ে তুলেছিল। ইতিমধ্যে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিকতার ও শিক্ষার পরিসর বেড়েছে, তবে সে অন্য গল্প।

১৮৫৩-১৯৪৭ এই-সময়পর্বে অর্থাৎ বন-বাদাড় সমৃদ্ধ ক্যানিং অঞ্চল থেকে আধুনিক ক্যানিং ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের অজানা ইতিহাসকে জানতে বা তার সাথে পরিচিত হতে একজন ইতিহাসের গবেষক হিসাবে আমি যেসব সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছি সেগুলি একবার না বললেই নয়। এটা সত্য যে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে নানারকম প্রতিকূলতার মধ্য থেকে যেতে হয়, বিশেষ করে সরকারি দলিল ও নথিপত্রের অপ্রতুলতাকে মেনে নিয়েই চলতে হয়। আমার গবেষণাপত্রের আলোচ্য সময়কালে ক্যানিং আলাদা কোনো মহকুমা ছিল না। তাই অন্যান্য মহকুমা বা জেলাগুলোর ন্যায় এখানকার মনুষ্য বসতি, জনজাতি ও তাদের আবেদন-নিবেদন, চাওয়া-পাওয়ার যাবতীয় তথ্যের যথাযথ দলিল দস্তাবেজ পাওয়া বা সেগুলিকে সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য। সমসাময়িক প্রথম সারির পত্রপত্রিকাগুলিও ক্যানিং ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলির সংবাদ প্রচার বা প্রকাশে বিশেষ আগ্রহ দেখাত বলে মনে হয়নি। কারণ খুব কম পত্রপত্রিকায় এসব বিষয়ে আলোকপাত করতে দেখা যায়। তাই পত্রপত্রিকাগুলি থেকে সমসাময়িক ঘটনা জানতে পত্রিকাগুলির চব্বিশ পরগনা জেলার খবর থেকে আমার আলোচ্য অঞ্চলগুলির তথ্য সংগ্রহ করেছি। সরকারি দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। শুধুমাত্র পোর্ট ক্যানিং বিষয়ক তথ্যগুলি আলাদা নথি আকারে থাকলেও অন্যান্য তথ্যগুলি চব্বিশ পরগনা জেলা নতুবা আলিপুর সদর মহকুমার দলিল থেকে সংগ্রহ করেছি। গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত দলিলগুলি হ্যামিল্টন বাংলোর লকার থেকে সংগ্রহ

করেছি। তবে উঁইয়ের ঢিবি, আরশোলা ও ব্যাঙের সহিত সংরক্ষিত এই লকারের করুণাত্মক অবস্থা আগামী গবেষককে সহায়ক গ্রন্থ থেকে উৎস সংগ্রহে বাধ্য করবে এটা অবশ্যম্ভাবী।

উপরোক্ত সীমাবদ্ধতাগুলিকে মেনে নিয়ে গবেষণা নিবন্ধের অন্তিম পর্যায়ে এসে এটুকু বলতে পারি অনুসন্ধান ও গবেষণার ভিত্তিতে যে সমস্ত বিষয়ের সঠিক সন্ধান দেওয়া অসম্ভব এবং যা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান তার সমাধানের জন্য গবেষণার আনুমানিক ফলাফলের উপর নির্ভর করে নিজস্ব মত সন্নিবেশ করে যথাসম্ভব আধুনিক ও শেষ গবেষণার ফলাফল সংযোজিত করার চেষ্টা করেছি। তবে ইতিহাস দর্শনে একটি বিষয় খুবই প্রাসঙ্গিক তা'হল ঐতিহাসিক কখনো চিরন্তন সত্য দাবি করতে পারে না। তবে নিখুঁত ইতিহাস স্বকীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক যুক্তি, কুসংস্কার বর্জন ও বাস্তবধর্মী পন্থাকে জটিল সমস্যা সমাধানের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেছি। তাই আশা করতে পারি বর্তমানের ক্যানিং হয়তোবা এখনো অনুন্নত তবে তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ মহকুমার অতীত পরিচয় জানতে বা তার গড়ে ওঠার ইতিহাস জানতে এই গবেষণাপত্রটি আগামী পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদি পর্ব (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ বাংলা ১৩৫৬, দে'জ সংস্করণ বৈশাখ ১৪০০), ৮৫-৮৬।

২। মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস (কলকাতা: নবজাতক প্রকাশন, বাংলা ১৫ই আশ্বিন ১৩৭৬, ইংরেজি ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯), ১৭৯-১৮৩।

৩। L. S. S. O'Malley, Bengal Disrtict Gazetteers, 24-Parganans (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot., 1914), 224.

৪। পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং (কলকাতা: লোকসখা প্রকাশন, ২০১৭), ২৭৮-২৯১।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

*চব্বিশ পরগনা জেলাঃ মহকুমা এবং থানা ভিত্তিক জনসংখ্যা ১৮৭২।

মহকুমা	থানা	আয়তন বর্গমাইল	গ্রাম/নগর সংখ্যা	গৃহের সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইল	গ্রাম ও নগরের সংখ্যা প্রতি বর্গমাইল	গ্রাম ও নগরের জনসংখ্যা	গৃহের সংখ্যা প্রতি বর্গমাইল	প্রতিটি ঘরে লোক সংখ্যা
বারুইপুর	বারুইপুর প্রতাপনগর	.... ১৪৭	২৩২ ১৬৩	১১৩৬২ ৫৫২৯	৬২৬৩৮ ২৯৬৬৩	৬২৯	২.৬৭	২৬৯ ১৮৫	১১৫	৫.৫ ৫.৪
	জয়নগর	৭৩	১৬১	১১০৬৪	৬৮৩৪৪	৯৩৩	২.১৯	৪২৪	১৫১	৬.১
	মাতলা	২২৯	৭৯	৫৮৯৬	৩৫৭৬৫	১৫৬	.৩৪	৪৫৩	২৬	৬.১
মোট		৪৪৯	৬৩২	৩৩৮৫১	১৯৬৪১০	৪৩৭	১.৪১	৩১১	৭৫	৫.৮
বসিরহাট	কালিঙ্গা	১৬৯	১৫৬	২২৪০১	১১৩৬২৯	৬৭২	.৯২	৭২৮	১৩২	৫.১
	বসিরহাট	১০০	১১৬	১৩০৫৭	৭২১৬৭	৭২০	১.১৫	৬২২	১৩০	৫.৫
	হাড়োয়া	৫৫	১২৬	৮৪৩৯	৪২৮৭২	৭৮৫	২.৩০	৩৪০	১৫৫	৫.১
	হাসনাবাদ	২৮	৭৫	৭৭০৬	৩৯৪৭৮	১৪১৪	২.৬৮	৫২৬	২৭৬	৫.১
মোট		৩৫২	৪৭৩	৫১৬০৩	২৬৮১৪৬	৭৬২	১.৩৪	৫৬৭	১৪৭	৫.২

H. Beverley, Report of the Census of Bengal, 1872, Statistical Return, General Statement 1.A, Abstract of the Area and Population of each District in Bengal arranged according to Provinces and Commissioner's Division, (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1872), P-VII.

পরিশিষ্ট-২

১৮৭২ সালের জনগণনার রিপোর্ট অনুসারে ধর্মের ভিত্তিতিতে প্রত্যেকটি থানার জনসংখ্যার তালিকা

মহকুমা	থানা	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	হিন্দু			মুসলিম			বৌদ্ধিস্ট		
					পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
বারুইপুর	বারুইপুর	৬২৬৩৮	৩১৭৫৪	৩০৮৮৪	২২০৩০	২১৮৬০	৪৩৮৯০	৯৫৪০	৮৮৯৬	১৮৪৮৬	..	..	..
	প্রতাপনগর	২৯৬৬৩	১৫৪৪৪	১৪২১৯	৮৫৬৬	৭৬৪২	১৬২০৮	৬৮১৬	৬৫২৩	১৩৩৩৯	..	..	..
	জয়নগর	৬৮৩৪৪	৩৫৬২৫	৩২৭১৮	২৫৩০৪	২৩৭৭৬	৪৯০৮৮	১০৩১২	৮৯৪১	১৯২৫৩	..	..	..
	মাতলা	৩৫৭৬৫	২০৬২২	১৫১৪৩	১৩৬৩১	৯২৯৩	২২৯২৪	৬৭২৩	৫৫৭৫	১২২৯৮	..	..	..
মহকুমা	মোট	১৯৬৪১০	১০৩৪৪৬	৯২৯৬৪	৬৯৫৩১	৬২৫৭১	১৩২১০২	৩৩৪৪১	২৯৯৩৫	৬৩৩৭৬			

খ্রিস্টান			অন্যান্য			
পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১২৪	১১৯	২৪৩	১০	৯	১৯	বারুইপুর
৪		৪	৫৮	৫৪	১১২	প্রতাপনগর
২		২	৮	১	৯	জয়নগর
১৫৮	১৯২	৩৭৭	৮৩	৮৩	১৬৬	মাতলা
৩১৫	৩১১	৬২৬	১৫৯	১৪৭	৩০৬	মহকুমা মোট

মহকুমা	থানা	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	হিন্দু			মুসলিম			বৌদ্ধিস্ট		
					পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
বসিরহাট	কলিঙ্গ	১১৩৬২৯	৫৪৮৮৩	৫৮৭৪৬	২৫০৭২	২৬৩৪৫	৫১৪১৭	২৯৮০৭	৩২৩৮৪	৬২১৯১	..	..	..
	বসিরহাট	৭২১৬৭	৩৬১১২	৩৬০৫৫	১৫৬০৪	১৫৫৩৩	৩১১৩৭	২০৫০৬	২০৫১৭	৪১০২৩	..	..	..
	হাড়োয়া	৪২৮৭২	২২৫৮৯	২০২৮৩	১৩৮৮১	১২৪৭১	২৬৩৫২	৮৬৬৬	৭৭৫৫	১৬৪২১	..	..	..
	হাসনাবাদ	৩৯৪৭৮	২১৬৮০	১৭৭৯৮	১৫১৫১	১২৯৩৬	২৮০৮৭	৬৫০২	৪৮৪৫	১১৩৪৭	..	..	..
মোট		২৬৮১৪৬	১৩৫২৬৪	১৩২৮৮২	৬৯৭০৮	৬৭২৮৫	১৩৬৯৯৩	৬৫৪৮১	৬৫৫০১	১৩০৯৮২	..	..	..

খ্রিস্টান			অন্যান্য			থানা
পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
৪	৬	১০	..	১১	১১	কলিঙ্গ
২	৩	৫	..	২	২	বসিরহাট
৪২	৫৭	৯৯	..	..	..	হাড়োয়া
২৭	১৭	৪৪	..	..	..	হাসনাবাদ
৭৫	৮৩	১৫৮	..	১৩	১৩	মোট

H. Beverley, Report of the Census of Bengal, 1872, General Statement 1. B, Details of the Population Classified According to Religion and Sex (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872), XlVI.

পরিশিষ্ট-৩

১৯৫১ সালে চব্বিশ পরগনা জেলা এবং মহকুমা ও থানা ভিত্তিক জনগণনার তালিকা।

জেলা/ মহকুমা/ থানা	আয়তন	গ্রামের সংখ্যা	নগরের সংখ্যা	গৃহের সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা			জনসংখ্যার ঘনত্ব
					পুরুষ	মহিলা	মোট	
চব্বিশ পরগনা	৫২৯২.৮ ৫৬৩৯.৯	৩৮৪৬	৩৩	৯৪৮৯৪৩	২৪৯৯৬৬০	২১০৯৬৪৯	৪৬০৯৩০৯	৮১৭
সদর মহকুমা	১১০৬.৭	১০৬৮	৯	২৯৩৪১৩	৮১২২৫২	৭০১৬৯৬	১৫১৩৯৪৮	১৩৬৮
ক্যানিং থানা	৩৪৬.১	১৮৪	১	৩৭৭৫৭	৯৯৪৬৫	৮৮৭৫১	১৮৮২১৬	৫৪৪
বসিরহাট মহকুমা	৮১৭.৯	৬৬১	৩	১৩০৭৮৬	৩৭২১০৭	৩৪১৫১২	৭১৩৬৯১	৮৭৩
সন্দেশখালি	২৭৫.৯	১০১	নেই	২৬৬৫৬	৯৩৬৭০	৮২৫৯৬	১৭৬২৬৬	৬৩৯

পরিশিষ্ট-৪

২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্ট অনুসারে চব্বিশ পরগনা এবং ক্যানিং মহকুমার জনসংখ্যার পরিসংখ্যান।

জেলা/ ব্লক	আয়তন	গ্রামের সংখ্যা	শহরের সংখ্যা	জনসংখ্যা			গ্রামের জনসংখ্যা	শহরের জনসংখ্যা	তপসিলি জাতি	তপসিলি উপজাতি	লিঙ্গ অনুপাত
				মোট	পুরুষ	মহিলা					
ক্যানিং ১	১৫০০.০৮	৫৩		৩০৪৭২৪	১৫৫১২৬	১৪৯৫৯৮	১৮১৫০৮	১২৩২১৬	১৪৪৯০৬	৩৭১০	৯৬৪
ক্যানিং ২	২১২২৫.৩৭	৬১		২৫২৫২৩	১২৮৪৩৮	১২৪০৮৫	২৪১৩৩১	১১১৯২	৫২৮৫৯	১৪৯১০	৯৬৬
বাসন্তী	৩৪১৬৮.৮৮	৬৪		৩৩৬৭১৭	১৭১২৭৯	১৬৫৪৩৮	৩৩০০৯২	৬৬২৫	১১৯৬৩১	২০০৬০	৯৬৬
গোসাবা	২৯৬৭২.৬৫	৫০		২৪৬৫৯৮	১২৫৯১০	১২০৬৮৮	২৪৬৫৯৮	০	১৫৪৫৮৪	২৩৩৪৩	৯৫৯
চব্বিশ পরগনা	৪৭৩৭৯০.৭০	১৯৯৬		৮১৬১৯৬১	৪১৭৩৭৭৮	৩৯৮৮১৮৩	৬০৭৪১৮৮	২০৮৭৭৭৩	২৪৬৪০৩২	৯৬৯৭৬	৯৫৬

নির্বাচিত গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জি

নির্বাচিত গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জি

অপ্রকাশিত দলিল (Unpublished Records)

West Bengal State Archive

- Proceeding of Board of Revenue, Lower Provinces, 1851-1858.
- The Presidency Commissioner Sundarbans Record, 1829-1858.
- Proceeding of General Department, Marine Branch, 1859-1885.
- Proceeding of Land and Land Revenue Department, Land Revenue Branch, 1946.
- Proceeding of Revenue Department, 17th April, 1832, Proceeding No-7.
- Proceeding of Revenue Department, Land Revenue Branch, 24th November, 1859, Proceeding No. 44ct, Letter from Presidency Commissionar to Sundarban Commissioner.
- Proceeding of Board of Revenue, Lower Province, Proceeding No 43, 16th June 1862, Letter from Sundarban Commissioner to Presidency Commissioner.
- Proceeding of General Miscellaneous, 1st April 1866, Proceeding No. 41.
- Proceeding of Revenue Department, Land Revenue Branch, File No. 3-L/15(1-2), Progress No., 25-26, February 1909, Letter from F. W. Duke, (Chief Secretary to the Government of Bengal) to the Commissioner of the Presidency Division.

- Proceeding of Land and Land Revenue Department, Land Revenue Branch, Government of West Bengal, Fill No- 6m-38/47B, of December/48/15-107, Memo No. 1788 (26- L. R.) Calcutta, 1. 3. 1947.
- Proceeding of Land and Land Revenue Department, Land Revenue Branch, Government of West Bengal, Fill No- 6m-38/47B, of December, Memo No. 242 (confidential), Alipore, 13. 3. 1947.
- Proceeding of Revenue Department, December 1870, Proceeding No.21, Para-5.
- Proceeding of Revenue Department, June 1871, Proceeding No. 36.
- Proceeding of Revenue Department, June 1871, Proceeding No. 68.
- Proceeding of Revenue Department, August 1871, proceeding No. 10, Para-3.
- Proceeding of Revenue Department, August 1871, Proceeding No.11, Para-10.
- Proceeding of Home Political Department, Government of India. Fortnightly Report, Bengal, 2nd half of February 1939, File No. 18.2.1939,
- Proceeding of Home Political Department, Report on Lawlessness among raiyats at Gosaba Basirhat, 24 Parganas, Fill No. 3r/29, confidential, Government of Bengal, Proceeding 981-989, March 1939.
- Proceeding of Land and Land Revenue Department, Land Revenue Branch, Report of the S. D. O Diamond Harbour, File No. IE2/46 Government of Bengal, July 1946.
- Proceeding of Home Political Department, Police Branch, File No. 142/47.

- R. N. P., Confidential No-30 of 1936, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of March 1936.
- R. N. P., Confidential, No-4 of 1936, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of April, 1936.
- R. N. P., Confidential, No-4 of 1937, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of April, 1937.
- R. N. P., Confidential, No-5 of 1937, Report on Newspapers and Periodicals in Bengal for the Month of May, 1937.
- Proceeding of Home Political Department, Political Branch, 1937-1941.

Hamilton Estate Paper, Hamilton Bungalow, Gosaba

- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, সুন্দরবন লাট নং ১৪৯ হোল্ডিং নং ১২৪, রাঙ্গাবেলিয়া দ্বীপের একটি পাট্টা।
- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, সভার কার্যবিবরনী বহি, গোসাবা এস্টেট এমপ্লয়াইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিটির সাধারণ সভার কার্যবিবরণ, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।
- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সালে শ্রী রূকো মোল্লা কর্তৃক এস্টেটের ম্যানেজার মহোদয়কে প্রদত্ত একটি দরখস্ত।
- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, পরিদর্শক বই, ১৮ই জানুয়ারি, ১৯২০ এবং ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৪৬।
- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, পরিদর্শক বই, ১৮ই জুলাই, ১৯৪৮ সালের একটি রিপোর্ট।
- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, পরিদর্শক বই, ২৩শে মার্চ, ১৯৩১ সালের একটি রিপোর্ট।

- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, পঞ্চায়েত রিপোর্ট ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৪ সালের একটি মিটিং।
- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, পরিদর্শক বই, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ সালের একটি রিপোর্ট।
- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, পরিদর্শক বই, ৫ই জুন, ১৯৪৮ সালের একটি রিপোর্ট।
- গোসাবা এস্টেট সম্পর্কিত নথি, ৩১শে জুলাই, ১৯৪৬ সালের একটি সেলামি রসিদ।

Rabindranath Tagore Paper, Rabindra Bhavan, Santiniketan

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হামিল্টনকে লেখা চিঠি, ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ এবং ২০ই জুন ১৯৩০।
- হ্যামিল্টন সাহেব কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চিঠি, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২।

Official Publication

Settlement Report and other

- Government of Bengal. Report of the Land Revenue Commission Bengal, Vol-II. Alipur: Bengal Government Press, 1940.
- Lahiri, Anil Chandra. Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of 24 Parganas, 1924-33. Alipore: Bengal Government press, 1936.
- Paper relating to the Formation of Port Canning, on the Matla River, extending from 27th May, 1853 to 11th March, 1865. Calcutta, 1865.
- Report of the Committee of the Mutlah Association established in February, 1859 with the object of promoting the progress of the Mutlah as an Auxiliary Port. Calcutta: Savielle & Cranenburgh Printers, 1861.

District Gazetteers

- Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Vol-I. Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1909.
- O'Malley, L. S. S. Bengal District Gazetteers, 24-Parganas. Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot. 1914.

Census

- Beverley, H. Report of the Census of Bengal, 1872, Statistical Return, General Statement 1.A, Abstract of the Area and Population of each District in Bengal arranged according to Provinces and Commissioner's Division. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1872.
- Beverley, H. Report of the Census of Bengal, 1872, General Statement 1. B, Details of the Population Classified According to Religion and Sex. Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1872.
- Bourdillon, J. A. Report on the Census of Bengal, 1881, Appendix-B. Calcutta: The Bengal Secretariat Press, 1883.
- Baines, J. A. Census of India, A General Report, 1891, Chapter III. Delhi: Manas Publication, 1985, First Print London, 1893.
- Gait, E. A. Census of India, 1901, Vol-VIA, Part-II and Vol-VIB, Part-III. Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902.
- Roy, A. K. Census of India, 1901, Vol-VII, Calcutta, Town and Suburbs, Part-I, A Short History of Calcutta. Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902
- O'Malley, L. S. S. Census of India, 1911, Vol-V, Part-II, Table-IX, Part-A. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1913.

- Thompson, W. H. Census of India, 1921, Vol-V, Part-II, Table-II, Part-A. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1923.
- Mitra, A. Census of India, 1951, District Handbook 24 Parganas. Alipore: West Bengal Government Press, 1954.

West Bengal Assembly Proceeding

- West Bengal Assembly Proceeding, 1937 1ST Session to 1942 4th Session.
- West Bengal Assembly Proceeding, 1946 1ST Session to 1948 3rd Session.

Calcutta Gazette

- The Calcutta Gazette, Wednesday, 21st November, 1883, Notification 16th November, 1883, P-1020.
- The Calcutta Gazette, Extraordinary Published by Authority, Wednesday, January 22, 1947, Government of Bengal, Legislative Department, Notification No 121L – 21at January, 1947.
- The Calcutta Gazette, Extraordinary Published by Authority, Tuesday, 15th April, 1947, Notification No- 572L-12th April, 1947, 341-392.

সমসাময়িক প্রকাশিত গ্রন্থ, আর্টিকেল(Articals) এবং প্যেমপ্লেট(Pamphlets)

- Ascoli, Frank David. A Revenue History of the Sundarbans from 1870 to 1920. Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot., 1921.
- Bhattacharya, Buddhadeva. Origin of the Revolutionary Socialist Party. Calcutta: Publicity Concern, 1982. https://www.marxists.org/archive/bhattacharya/1982/origins-rsp/ch01.htma

- Campos, J. J. A. History of the Portuguese in Bengal. Calcutta: Butter Worth & Co. (India) LTD, 1919.
- Desai, Mahadev. "Towards and Ideal Zamindari" Harijan, Vol-3, (1935), 36-37 (March, 15), 52-53 (March, 29), 61-62 (April, 5) and 69-70 (April, 13).

  https://www.gandhiheritageportal.org/journals-by-gandhiji/harijan
- Hunter, W. W. A Statistical Account of Bengal, vol-1, District of the 24 Parganas and Sundarbans. London: Trubner & co., 1875.
- Major Smyth, Ralph. "The Soonderbuns Their Commercial Importance- Statistical and Geographical Report on the 24 Pergunnahs Districts." The Calcutta Review, Vol- 31(December 1858).
- Mazumdar, S. B. (Sudhangshu Bhusan Mazumdar) "Estate Farming in India, Gosaba", Indian Farming voll. III, No. II. November, 1942.
- Mazumdar, S. B. Gosaba Co-operative Commonwealth: A Lecture, Sir Daniel Hamilton's Sundarban Estate. Calcutta: West Bengal co-operative press Ltd, date not mention [n.d].
- Palme Dutta, R. & Ben Bradley, Anti-Imperialist Peoples Fornt in India, The Labour Monthly, Vol. 18, March 1936, No.3, PP. 149-160.

  https://www.marxist.org/archive/dutt/1936/03/xo/htm
- Pargiter, Frederick Eden. A Revenue History of the Sundarbans from 1765 to 1870. Alipore: Bengal Government Press, 1934.
- Pargiter, F. E. "Cameos of Indian Districts- The Sundarbans." The Calcutta Review, Vol-89, Iss-178 (December 1889).

- Sarkar, Jadunath. History of Bengal, Vol. II, Muslim Period, 1200-1757. Dacca: University of Dacca, 1948.
- The Mutlah as an Auxiliary Port to Calcutta: Its Progress and Prospect. Calcutta: Published Under the Auspices of the Mutlah Association, 1858.
- The Port of Calcutta and the Port of Mutlah considered in connection by A Railway or A Ship Canal. Calcutta: Cranenburgh Military Orphan Press, 1858.
- -------"The Gangetic Delta." The Calcutta Review, Vol-32, Iss-63 (March 1859).
- মিত্র, সতীশচন্দ্র। যশোহর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত। কলিকাতা: দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯২২।
- হাবিবুল্লাহ, মনসুর। জমিদারি ব্যবস্থা ধ্বংস হোক। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৪৭।

সহায়ক গ্রন্থ

ইংরেজি

- Banerjee, P. Calcutta and its Hinterland: A Studay of Economic History of India, 1833-1900. Calcutta, Progressive Publishers, 1975.
- Bandyopadhyay, Alapan. Anup Matilal (ed). The Philosopher,s Stone Speeches and writing of Sir Daniel Hamilton. Gosaba: Gosaba Estate Trust, 2003.
- Bhattacharya, Dipankar. Peasant Movement in Bengal and Bihar, 1936-47. Calcutta: R. B. University Press, 1992.

- Broomfield, J. H. Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth-Century Bengal. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1968.
- Chatterjee Sarkar, Sutapa. The Sundarbans Folk Deities, Monstersand Mortals. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2017.
- Chatterji, Joya. The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-1967. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Chakravartty, Renu. Communist in India's Women's Movement 1940-1950. New Delhi: Peoples Publication's House, 1980.
- Chakraborty, Bhaskar. Entrenchment of Colonialism, in Satyesh Chakraborty ed. 'Port of Calcutta 125 Years, 1870-1995'. Kolkata: Calcutta Port Trust, 1995.
- Cooper, Adrienne. Sharecropping and Sharecropper's Struggles in Bengal 1930-1950. Calcutta, New Delhi: K P Bagchi & Company, First Published-1988.
- Choudhuri, B. R. Agrarian Movement in Bengal and Bihar, 1919-1939. in B. R. Nanda (ed) 'Socialism in India'. Delhi: Vikas Publication, 1972.
- Desai, A. R. (ed). Peasant Struggles in India. Delhi: Oxford University Press, First Published 1979 and Paper Back Edition Published 1981.
- De, Rathindra Nath. Sundarban. Calcutta: Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 1991.
- Dutta, Krishna & Andrew Robinson (ed). Selected Letters of Rabindranath Tegore. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

- Eaton, Richard M. The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760. Berkeley, London: University of California press, 1996.
- Greenough, P. Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-44. Oxford and New York, Oxford University Press, 1982.
- Gupta, M. N. Land Systems of Bengal. Calcutta: University of Calcutta, 1940.
- Huque, Azizul. The Man Behind the Plough. Calcutta: Gupta, Rahaman and Gupta, 1944.
- Majumdar, Ashok. Peasant Protest in Indian Politics: Tebhaga Movement in Bengal. New Delhi: NIB Publishers, 1993.
- Mandal, A. K. & R. K. Ghosh. Sundarban: A Socio Bio-ecological Study. Cornell University: Bookland, 1989, Digitized, January, 2009.
- Mondal, Rabindra Nath. The Tebhaga Movement in Kakdwip. Kolkata: Ratna Prakashan, 2001.
- Mukharjee, Nilmani. The Port of Calcutta, A Short History. Calcutta: The Commissioners for the Port of Calcutta, 1968.
- Mukharjee, Karuna. Land Reform. Calcutta: H. Chatterjee & Co., 1952.
- Mukhopadhyay, Ashim. Peasant of the Parganas, in A. R. Desai (ed), Peasant Struggles in India. Delhi: Oxford University Press, First Published 1979 and Paper Back Edition Published 1981.
- Nanda, B. R. (ed). Socialism in India. Delhi: Vikas Publication, 1972.
- Sarkar, Krishnakant. A Case Study: Co-operative Movement (India) No Unemployment No Starvation No Death, Sundarban Famine 1943. Kolkata: Imagine Publication, 2008.

- Sarkar, KrishnaKanta. Kakdwip Tebhaga Movement, in A. R. Desai (ed), 'Peasant Struggles in India'. Delhi: Oxford University Press, First Published 1979 and Paper Back Edition Published 1981.
- Satyesh Chakraborty edited. Port of Calcutta 125 Years, 1870-1995. Kolkata: Calcutta Port Trust, 1995.
- Sen, Sunil. Peasant Movement in India, Mid Nineteen and Twentieth Century. Calcutta: K. P. Bagchi, 1982.
- Sengupta, Aviroop. Tidal Histories Envisioning the Sundarbans, 1860s-1920s, in Kaustubh Mani Sengupta and Tista Das Edited 'Rethinking the Local in Indian History Perspectives from Southern Bengal. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2022.
- Sengupta, Kaustubh Mani and Tista Das edited. Rethinking the Local in Indian History Perspectives from Southern Bengal. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2022.

বাংলা

- উমর, বদরুদ্দিন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক। কলকাতা: চিরায়াত, ১৯৭৮।
- কোঙার, বিনয় (সম্পা:)। তেভাগার সংগ্রাম-ফিরে দেখা। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা, সেপ্টেম্বর ১৯৪৬।
- ঘোষাল, হেমন্ত। সময় অসময়ের স্মৃতি। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।
- ঘোষাল, হেমন্ত। বাড়ি পিছু একজন যুবক, একটি লাঠি, নেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি সম্পাদিত 'তেভাগার লড়াই'। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৪।

- ঘোষ, বিনয়। বাদশাহী আমল। কলিকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:, প্রথম সংস্করণ ৭ই চৈত্র ১৮৭৯শকাব্দ।
- ঘোষ, পূর্ণেন্দু। ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং। কলকাতা: লোকসখা প্রকাশন, ২০১৭।
- চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ। কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই। দঃ চব্বিশ পরগনা: সেরিবান, ডিসেম্বর ২০০৪।
- চক্রবর্তী, সুমিত সম্পাদিত। তেভাগার সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। কলকাতা: ১৯৭৩।
- চট্টোপাধ্যায়, কুণাল। তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, আগস্ট ১৯৮৭।
- চৌধুরী, কমল। চব্বিশ পরগনা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৯।
- চৌধুরী, বিনয়। কৃষক আন্দোলনের এক অমর অধ্যায় তেভাগা লড়াই, নেওয়া হয়েছে বিনয় কোঙার (সম্পা:), 'তেভাগার সংগ্রাম-ফিরে দেখা'। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা, সেপ্টেম্বর ১৯৪৬।
- জানা, দেবপ্রসাদ সম্পাদিত। শ্রীখন্ড সুন্দরবন। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, নভেম্বর ২০০৪।
- দত্ত, সৌমেন। স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবা আখ্যান। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রঃ লিঃ, ২০১০।
- দাস, গোকুল চন্দ্র। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত। কলিকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১।
- দাস, গোকুল চন্দ্র সম্পাদিত। চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪।
- দাশ, শচীন। জল-জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ১৯৯৭।

- দাশগুপ্ত, রানী। তেভাগার লড়াইয়ে কৃষক মহিলাদের ভূমিকা, নেওয়া হয়েছে সুমিত চক্রবর্তী সম্পাদিত 'তেভাগার সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ'। কলকাতা: ১৯৭৩।
- পশ্চিমবঙ্গ রাজস্ব পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত 'তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা'। আলিপুর: পশ্চিমবঙ্গ সরকারি মুদ্রণ, জুন ১৯৭৯।
- বর্মন, সন্তোষ। সম্পাদিত 'স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও গোসাবা-প্রবন্ধ সংকলন'। কলকাতা: কথা, ২০১২।
- বর্মণ, সন্তোষ কুমার। বেড়মজুরের তেভাগার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির সন্ধানে (কাকদ্বীপ, চব্বিশ পরগনা: বামা পুস্তকালয়, ১৯৯৯।
- ভট্টাচার্য, জয়ন্ত। বাংলার 'তেভাগা' সংগ্রাম। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, জুলাই ১৯৯৬।
- ভট্টাচার্য, জয়ন্ত। চব্বিশ পরগনার তেভাগা-তেভাগা থেকে জমির লড়াই। নেওয়া হয়েছে গোকুল চন্দ্র দাস সম্পাদিত, চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪।
- ভট্টাচার্য, কালীপদ। মহাপ্রাণ স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টন। গোসাবা: স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন এস্টেট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯৫৫।
- মন্ডল, শশাঙ্ক। ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন। কলকাতা: পুনশ্চ, ১৯৯৫।
- মন্ডল, স্বপন কুমার। এক ব্যতিক্রমী জমিদারের কথা, নেওয়া হয়েছে সন্তোষ বর্মন সম্পাদিত 'স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও গোসাবা-প্রবন্ধ সংকলন'। কলকাতা: কথা, ২০১২।
- মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (তৃতীয় খন্ড)। কলিকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪০৬।
- মতিলাল, অনুপ। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন এক স্বপ্নের ফেরিওয়ালা, নেওয়া হয়েছে সন্তোষ বর্মন সম্পাদিত 'স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও গোসাবা-প্রবন্ধ সংকলন'। কলিকাতা: কথা, ২০১২।

- মিদ্যা, বিকাশকান্তি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্থান নাম। কলিকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০১০।
- রায়, সুপ্রকাশ। কাকদ্বীপ, সোনারপুর, ভাঙ্গড়ের কৃষক সংগ্রাম, ১৯৪৬-৪৮। কলকাতা: র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব, ১৯৬৯।
- রসুল, মহম্মদ আবদুল্লাহ। কৃষক সভার ইতিহাস। কলকাতা: নবজাতক প্রকাশন, বাংলা ১৫ই আশ্বিন ১৩৭৬, ইংরেজি ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯।
- রায়চৌধুরী, প্রসিত কুমার। আদি গঙ্গার তীরে। কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৮।
- সেন, দীনেশচন্দ্র। বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খন্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৩৫।
- সরকার, মানিক। সংগ্রাম তেভাগার ও অপারেশন বর্গা, নেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজস্ব পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত 'তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা'। আলিপুর: পশ্চিমবঙ্গ সরকারি মুদ্রণ, জুন ১৯৭৯।

অপ্রকাশিত গবেষণা পত্র

- Chattopadhyay, Sutapa. Colonial Agrarian Policy and Socio-Cultural Change in The Sundarbans- Late Eighteenth to Early Twentieth Century. Unpublished Ph. D Thesis, University of Calcutta, 1998.
- Sarkar, Krishnakanta. Presant Political Action in 24-Parganas with Special Reference to Kakdwip and Gosaba. Unpublished Ph. D. Thesis, University of Calcutta, 1985.

Journals, Pamphlets, Articals and Periodicals

- Das, Debojoyti. "Sir Daniel Hamilton's Sentinel Co-operative Society in the Sundarban Delta", Littoral Communities–Bay of Bengal. https://lcbb.macmillan.yale.edu/sir-daniel-hamiltons-sentinel-co-operativesociety-sundarban-delta.

- Das, Susanta. Marginal Communities in Peasant Movement: The Sharecropper's Struggles for Tebhaga in North Bengal (1946-1947), Proceeding of the Indian History Congress, 2013, Vol. 74(2013), 640. https://www.jstor.org/stable/44158867.
- ঘটক, মৈত্রী। কাকদ্বীপ ১৯৪৬-৫০, নেওয়া হয়েছে মহাশ্বেতা দেবী (সম্পাদিত), 'বর্তিকা' কাকদ্বীপ তেভাগা আন্দোলন সংখ্যা, ১৯৮৬।
- চক্রবর্তী, সুমিত। সম্পাদিত 'তেভাগার সংগ্রাম রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ'। কলকাতা: ১৯৭৩।
- তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা ১৪০৪ বঙ্গাব্দ',বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৪২-৪৬। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০শে মে, ১৯৯৭।
- তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ: জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০।

দৈনিক পত্রপত্রিকা

- Amrita Bazar Patrika, Monday, 10th March, 1947, Vol. 79, Issue, 70.
- Hindusthan Standard, Monday, 6th January, Thursday, 23rd January, 1947.
- Hinhusthan Standard, Sunday, 2nd February, Sunday, 9th February, Sunday, 16th Februrary, 1947.
- Hindusthan Standard, Sunday, 9th March, Wednesday, 19th March, 1947
- Hindusthan Standard, 9th May, 1950; 16th July, 1950.
- The Statesman, Saturday, 18th November 1944.
- The Bengal Weekly, Wednesday, 7th March 1945.

- স্বাধীনতা, শনিবার, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪৬, প্রথম বর্ষ, ৩০৯ সংখ্যা।
- স্বাধীনতা, মঙ্গলবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭, দ্বিতীয় বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।
- স্বাধীনতা, মঙ্গলবার, ২২শে এপ্রিল, ১৯৪৭, দ্বিতীয় বর্ষ, ১১৮ সংখ্যা।
- স্বাধীনতা, 22nd November, 1947; 30th November, 47; 11th December, 47; 16th December, 47; 17th December, 47.